জন্মদাগ

সমরেশ মজুমদার

সাহিত্য সংস্থা
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ
৯ই জুলাই, ১৯৬৪

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু

মুদ্রক
কমল মিত্র
নব মুদ্রন
১বি, রাজা লেন
কলিকাতা-৯

হঠাৎই একটা দিন আসে যেদিন সব কিছু ঠিকঠাক চলে। একটার পর একটা ভাল ঘটনা ঘটে যায়। একটাও খারাপ ঘটনা নয়, কেউ অভিযোগের আঙুল তোলে না, এমন কী জমে থাকা দুঃখগুলোও ফুরফুরে খুশির তলায় চাপা পড়ে যায়। কাবেরী কোনও অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করে না। কিন্তু খবরের কাগজ পড়া শেষ করার আগে 'আপনার রাশিফল' কলমটিতে চোখ রাখে। মজা লাগে পড়তে। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাশিগুলোর পাশে ছড়ানো থাকে। তাঁর রাশি মেষ। কোনও দিন মেলে না, মেলার কথাও নয়। গতকাল একটা নতুন লাইন দেখতে পেয়েছিল সে। আত্মীয় বিয়োগের সম্ভাবনা, ব্যবসায় সমূহ ক্ষতি হতে পারে। বিদেশযাত্রায় যোগ আছে ইত্যাদির শেষে নতুন লাইন দেখতে পেয়েছিল কাবেরী। আগামীকাল আপনার পক্ষে খুব ভাল দিন। পড়ে হেসে ফেলেছিল। এই কাগজের যত মেষ রাশির পাঠক স্বপ্ন দেখবে, আগামীকাল তাদের জন্যে কত ভাল খবর নিয়ে আসছে। যারা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে তাদের উপকার করছে কলমটা।

কাবেরী বিছানা ছাড়েন সকাল ছ'টায়। শীত গ্রীষ্ম বা বর্ষায় এর ব্যতিক্রম হয় না। এখানে অসময়েও বৃষ্টি হয়, বর্ষাকালে মারাত্মক। কিন্তু আজ আকাশ পরিষ্কার। একটু হিম বাতাস বইছে। রোদ ওঠেনি, চারধার বেশ ছায়াছায়া। ঢোলাপাজামা এবং পাঞ্জাবি পরে কাবেরী ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর বাগানে এসে দাঁড়ালেন। প্রথমেই চোখ পড়ল গোলাপ কুঁড়িটার ওপর। ঢাউস কুঁড়িটাকে গতকালও বেশ টাইট দেখাচ্ছিল। আজ মুখ খুলেছে। হয়তো বিকেলের মধ্যেই ফুল হয়ে দোল খাবে। দেখে মন ভাল হয়ে গেল।

বাগানের ওপাশে খাদ। অনেকটা নীচে নেমে সেটা মুখ থুবড়ে পড়েছে চেলসি নদীতে। অবশ্য বর্ষাকাল ছাড়া ওকে নদী বলার সময় বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয়। এখন তিরতিরিয়ে জল বইছে নুড়িগুলোর শরীর নাড়িয়ে। বাকিটা বালি আর বুনো ঝোপ বুকে নিয়ে ঝুম হয়ে আছে। দু'শো গজ এবড়ো খেবড়ো জমির পর পাহাড়ের শুরু। সামনের পাহাড়টা বড় নয়। ওর পেছনে যেটি সেটি

আকাশ ছুঁয়েছে, ছড়িয়ে গিয়েছে দুই দিগন্তে। যখন ওদের গায়ে মেঘেরা হেলান দেয় তখন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে দেখা একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যায়। বিশাল চেহারার মা হাতির গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বালক হাতি। এই দুটো পাহাড় শুধু একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকে!

আজ এই সকালে বড় পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট সাদা মেঘেরা জম্পেশ করে বসে আছে। আকাশ ময়ূরের গলার রং মেখে ঢলঢলে। বাগানের ঠিক মাঝখানে ছোট ঘাসের লনের ওপর রেখে দেওয়া বেতের চেয়ারটা এখন শিশিরে চপচপে। তাঁকে ওখানে দেখে ছুটে এল আবদুল। পুরনো তোয়ালে দিয়ে সব জল মুছে নিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। এই কাজটা তার করার কথা কাবেরীর বাগানে আসার আগে। অন্য দিন হলে রাগ করতেন। কিন্তু আজ কাবেরী হাসলেন, 'যাও, ভাল করে চা বানাও।'

আবদুল এ বাড়ির বাবুর্চি-কাম-হেল্পার। ও ছাড়া আছে মান সিং। সে বাগানের দায়িত্বে, সেই সঙ্গে দারোয়ানের কাজ করে। মান সিং তিনদিনের ছুটি নিয়ে তার গ্রামে গিয়েছে। তার সৎ মায়ের সন্তান হবে বলে বাবা ডেকে পাঠিয়েছে। লোক দুটো খুবই বিশ্বস্ত। মন্তামামা অবশ্য ওদের মিস্টার জাম্বুবান এবং মিস্টার হাম্বুবান বলে ডাকেন। কাজের লোকজনের সঙ্গে রসিকতা করা পছন্দের নয় কাবেরীর। কিন্তু প্রথমবার ডাক শুনে হাসি পেয়েছিল। একলা পেলে মন্তামামাকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'হাম্বুবান মানে কী?'

মন্তামামা হেসেছিলেন, 'মালিটাকে দেখবি সব সময় হাম হাম করে। নিজেকে ছাড়া কিছু ভাবতেই পারে না ব্যাটা। তাই ওর নাম হাম্বুবান।

বেতের চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিতেই হাওয়া বইল! শীত-শীত হাওয়া। এই শীত বেশ আরামদায়ক। জোরে জোরে শ্বাস নিলেন কাবেরী। তারপর পাহাড়ের দিকে তাকালেন। ওপরের পাহাড়টা এখন সাদা মেঘে ঢেকে গিয়েছে। আকাশের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েছে ওর শরীর।

এই সময় টেলিফোন বাজল। বাগানে বসেও কাবেরী আওয়াজটা শুনতে পেলেন। এত সকালে কে ফোন করছে? এটা এমন একটা সময় যখন কথা বলতে ভাল লাগে না। রিং থেমে গিয়েছে। পাশে দাঁড়িয়ে আবদুল ডাকল, 'মেমসাব।'

কাবেরী তাকালেন। আবদুলের হাতে কর্ডলেস রিসিভার। সেটি নিয়ে কানের পাশে এনে পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যালো। কে বলছেন?'

'হাই মাম্। হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।' চিৎকারটা লং আইল্যান্ড থেকে ছুটে এসে কাবেরীর কানের পর্দা কাঁপিয়ে দিল।

'থ্যাঙ্ক ইউ মাই সন। তোমার ফোন পেয়ে খুব ভাল লাগছে।' কাবেরী বললেন।

ছেলে ইংরেজিতে বলল, 'আমি আগেও ফোন করেছিলাম। তোমাদের ইন্ডিয়ান টাইমে রাত সাড়ে নটায়। তুমি ফোন ধরোনি, অ্যানসারিং মেশিনে মেসেজ রেখেছি।'

'আচ্ছা! আমি এখনও ওটা দেখার সময় পাইনি। তা ছাড়া রাত আটটার পর আমি ফোন রিসিভ করি না।' হাসলেন কাবেরী, 'এখন বলো, তুমি কেমন আছ?'

'আমি মাস্টার কমপ্লিট করেছি। ড্যাড চাইছে আমি রিসার্চ করি। কিন্তু আমার আর পড়াশুনা ভাল লাগছে না। তিনটে ভাল কাজের অফার পেয়েছি।'

'তুমি যথেষ্ট বড় হয়েছ। নিজের যাতে ভাল হবে তাই করবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ মাম্। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যাতে তিনি তোমাকে দীর্ঘজীবন দেন। আশা করছি তুমি আজকের দিনটাকে খুব উপভোগ করবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ মাই সন।'

'গুড বাই মাম্।'

'গুড বাই!'

বোতাম টিপে কর্ডলেসটাকে ফোনের ওপর রাখতে গিয়ে আবদুলকে দেখতে পেলেন। বাঁ হাতে টুল ডান হাতে ট্রে নিয়ে আসছে। টুল ঘাসের ওপর রেখে ট্রে নামাল। তার ওপর চায়ের কাপ, টি পট, চিনি এবং দুধ। এক হাতে এত সব ট্রের ওপর চাপিয়ে কী করে যে আনে তা ওই জানে। আবদুলকে রিসিভার দিতে গিয়ে মত বদলালেন। টুলের একপাশে রেখে দিলেন সেটাকে।

আবদুল চলে গেলে চা বানালেন তিনি। এটা নিজেই করেন। টি পট থেকে যখন মাকাইবাড়ির চায়ের নির্যাস কাপে পড়ছিল তখন মনে খুশি এল। কী চমৎকার গন্ধ। আজ দুধ মেশাবেন না চায়ে।

চুমুক দিতেই আরাম হল। পাহাড়ের দিকে তাকালেন। গতবারই ছেলে বলেছিল জন্মদিনটা সে কম্প্যুটারে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই আর ভুল হবে না। বেশ ভাল লাগল ওর সঙ্গে কথা বলে। কত বয়স এখন? চোখ বন্ধ করলেন কাবেরী। ও জন্মেছিল উনিশশো বিরাশিতে। তা হলে বাইশ কি তেইশ। তার নিজের বয়স তখন পঁচিশ। কী দ্রুত চলে যাচ্ছে দিনগুলো। শেষবার ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে ওর যখন পনেরো বছর বয়স। বাবার সঙ্গে এসেছিল কলকাতায়। গ্র্যান্ডে উঠেছিল। তাও তো সাত-আট বছর হয়ে গেল। এখন

নীল যাকে বলে পরিপূর্ণ যুবক। বছরে দু'বার কথা হয় ওঁদের। মায়ের জন্মদিনে ছেলে, ছেলের জন্মদিনে মা। মাস পাঁচেক আগে ওর জন্মদিনে যখন কাবেরী ফোন করেছিলেন তখন ছেলে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মা তোমার শরীর কতটা লম্বা?'

হেসেছিলেন কাবেরী, 'বোধহয় পাঁচ ছয়।'

ছেলে হেসেছিল, 'আমি ঠিক সিক্স।'

'দেন ইউ আর এ বিগ বয়।' কাবেরী খুশি হয়েছিলেন।

চা শেষ করলেন কাবেরী। চোখ তুললেন ওপরে। আকাশ কী নীলে নীল। তাকাতেই বুক ভরে যায়। আজ আমি আটচল্লিশ। দুটো হাত চোখের সামনে তুললেন। একটি শিরাও উঁচু হয়ে নেই। গতকালও আয়নায় দেখেছেন, গলায় ভাঁজ পড়েনি, চোখের নীচে লাইন তৈরি হয়নি। হ্যাঁ, চুলে রুপোলি ছোপ লেগেছে। এটা তিনি বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন। মধ্য তিরিশেই বাবার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। নতুন গার্নিয়ের ব্যবহার করেন কাবেরী। ভারী ভাল, একেবারে স্বাভাবিক রঙের চুল বলেই মনে হয়। কাবেরী অবাক হন মায়ের কথা ভেবে। মা এখন বাহাত্তর। একটি চুলও পাকেনি।

মায়ের মুখ ভাবতে না ভাবতেই রিং শুরু হল। রিসিভারটা অন করলেন কাবেরী. 'হ্যাল!'

'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।' পরিষ্কার গলা, কণ্ঠস্বরে ব্যক্তিত্ব।

'থ্যাঙ্ক ইউ মা।'

'আশা করছি তোমার শরীর ভাল আছে!'

'আমি ভাল আছি।'

'আমি চাই আজকের দিনটা তুমি ভাল ভাবে উপভোগ করবে।'

'শুধু আজকের দিনটা?'

'প্রতিদিন তোমার জন্মদিন নয়। ও হ্যাঁ, তোমার মন্তামামা কি কাছাকাছি আছেন?'

'না।'

'ওকে বোলো আমাকে ফোন করতে। আচ্ছা, বাই।' লাইন কেটে দিলেন মা। যাঁর নাম কণিকা চট্টোপাধ্যায়। বিবাহিত জীবনের পরিচয় ছিল স্যার অমলেশ চট্টোপাধ্যায়ের অতি সুন্দরী স্ত্রী। স্যার অমলেশ ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি। অন্যতম ধনী বাঙালি। খুব অল্প বয়সে বিলেত থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসে পারিবারিক ব্যবসায় পরিবর্তন আনেন। খুব দ্রুত উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে

ওপরে উঠে আসেন তিনি। ব্রিটিশদের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের কারণে এ দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে রানি তাঁকে স্যার উপাধি দিয়ে গর্বিত করেন। তখন তাঁর বয়স তিরিশ। এত অল্প বয়সে ওঁর আগে কেউ স্যার হয়নি। তখনও স্যার অমলেশ অবিবাহিত।

ব্যবসায় সাফল্য পাওয়ার নেশা এত তীব্র ছিল যে স্যার অমলেশ বিয়ের ব্যাপারে মনস্থির করতে পারেননি। তিনি যত ওপরে উঠছিলেন তত সাধারণ বাঙালি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক দূরের হয়ে যাচ্ছিল। উচ্চবিত্ত এবং অতি ধনী পরিবারের সুকন্যারা তাঁকে স্বামী হিসেবে প্রথম দিকে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। কারণ স্যার অমলেশের উচ্চতা ছিল পাঁচ ফুট আড়াই ইঞ্চি, গায়ের রং ঘন কালো, শরীরও শীর্ণ। এই চেহারা বিয়ের পাত্র হিসেবে কোনও আকর্ষণ তৈরি করে না। হিরের আংটি বাঁকা হলেও দাম কমে না, এই প্রবচন মানলে সাধারণ পরিবারের সুন্দরী পাত্রী পাওয়া সহজ ছিল। একে ধনকুবের তার ওপর স্যার উপাধি পাওয়া পাত্রকে পেলে সে সব পরিবারের কর্তারা চাঁদ ধরার আনন্দে বিভোর হতেন। কিন্তু সেইসব পরিবারে সুকন্যাদের শিক্ষা এবং আচার-আচরণ স্যার-এর সহধর্মিণী হওয়ার উপযুক্ত বলে মনে হয়নি। এই সময় স্যার অমলেশ স্থির করেন তিনি আজীবন অবিবাহিত থাকবেন। তাঁকে স্বামী হিসেবে যাঁরা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ তাঁর অর্থের স্বাদ গ্রহণ করতে রাজি হলেন লুকিয়ে চুরিয়ে। আর এতে মজা পেয়ে গেলেন স্যার অমলেশ। বিবাহিত জীবনের জটিলতায় না জড়িয়ে প্রয়োজনে শরীরের আনন্দ যদি এত সহজে পাওয়া যায় তা হলে মন্দ কী?

কণিকা দত্ত যখন এগারো বছরের বালিকা তখনই তাঁকে ষোড়শী বলে মনে হত। তাঁর বাবা বীরভূমের জমিদার ছিলেন। শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার হিসেবে তাদের সুখ্যাতি ছিল। একমাত্র মেয়েকে মানুষ করতে তিনি দার্জিলিং-এর একটি বোর্ডিং স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। স্কুলটি শুধু মেয়েদের জন্যে এবং মেয়েদের কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে বাস করতে হত। ব্যাপারটা একদম পছন্দের ছিল না কণিকার। তার ক্লাসের অন্য মেয়ের তুলনায় সে লম্বা, এই বয়সেই বেশ স্বাস্থ্যবতী। গায়ের রং দেখলে চোখ সরাতে ইচ্ছে করে না। নাক, ঠোঁট, মুখের গড়নে ভেনাসের আদল। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে সে মশগুল থাকত এবং এটা শিক্ষিকাদের পছন্দ ছিল না। বাড়িতে প্রতিবাদ করে কোনও লাভ হয়নি। সবাইকে উপেক্ষা করলেও বাবার সামনে দাঁড়ালে কথা বলার শক্তি

খুঁজে পেত না সে। অথচ ওই স্কুলে সে পড়বে না, হোস্টেলে থাকবে না। শেষ পর্যন্ত সহজ পথটায় কণিকা হাঁটল। পরপর দু'বছর ফেল করলে স্কুল থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়। সে স্থির করল পরপর দু'বার ফেল করবে।

শীতের ছুটির সময় তাকে বাড়িতে আনা হত। এগারো বছর বয়সে কণিকা প্রথম পুরুষ মানুষের স্বাদ পেয়ে গেল। তার অবর্তমানে গোয়ালঘরের কাজ করার জন্যে একটি তরুণ গোয়ালাকে নিয়োগ করা হয়েছিল। বাড়িতে অন্তত বারোটি গোরু ছিল। বাড়ির পেছনে বাগানের ওপাশে গোয়ালঘর দুটোয় প্রয়োজন না পড়লে কেউ যেত না। ছুটিতে বেড়াতে এসে কণিকা সেদিকে পা বাড়াল। ছেলেটি তখন একটি ষাঁড়কে খাবার দিচ্ছিল। কণিকা খুব অবাক হল। তাদের গোয়ালঘরে গোরু আছে বলেই সে শৈশব থেকে জানে। এর আগে যে বৃদ্ধ ওদের দেখাশোনা করত সে গোরুদের মা বলে ডাকত। কিন্তু কখনও কোনও ষাঁড় এখানে ছিল না। কণিকা দেখল ছেলেটা তার কাজ ভুলে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। মুখ চোখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে আকাশ থেকে নেমে আসা কোনও পরিকে দেখছে। ছেলেটির স্বাস্থ্য ভাল, গায়ের রং ময়লা, পরনে হাফ প্যান্ট।

সে বেশ কর্তৃত্বের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে ষাঁড় কেন? ষাঁড় কি দুধ দেয়?'

'আজ্ঞে, কাল আনা করানো হল।'

'কেন? আনা হল কেন?'

'দুটো গাই আছে, ওদের পাল খাওয়াতে হবে যে।'

'পাল খাওয়াতে হবে মানে? সেটা কী খাবার? ষাঁড়টার সঙ্গে কী সম্পর্ক?'

'আজ্ঞে ষাঁড় ছাড়া তো হবে না!'

কণিকা অনুমান করল ব্যাপারটার মধ্যে রহস্য আছে। সে মাথা নেড়ে বলল, 'বুঝেছি। তা ওই খাওয়া কখন হবে?'

'এই কিছুক্ষণ পরে।'

'বেশ। আমি এখন বাগানে থাকব। আমি ওদের খাওয়া দেখতে চাই। যখন খাবে তখন আমাকে খবর দেবে।' গম্ভীর মুখে হুকুম দিয়ে সে বাগানে চলে এল। সেখানে তখন দীনবন্ধু বুড়ো খুরপি দিয়ে মাটি তৈরি করছে। তাকে দেখে বুড়ো হেসে বলল, 'এসো দিদি, পাহাড়ে থেকে তোমার রঙের বাহার আরও খুলেছে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, একেবারে দুর্গা প্রতিমার মতো।'

'ধ্যাৎ আমার কি দশটা হাত আছে। আচ্ছা, পাল খাওয়া মানে কী?'

বুড়োর চোখ বিস্ফারিত হল। তার পরেই চাপা গলায় বলল, 'ছি ছি। এই কথা কখনও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে না। লোকে শুনলে খুব খারাপ ভাববে।'

'কেন? খারাপ ভাববে কেন?'

বুড়ো মুখ নামাল, 'জন্তুজানোয়ারদের ব্যাপার তো, ওসব নিয়ে কথা না বলাই ভাল।'

'কেন ভাল নয়?' জেদি গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল কণিকা।

'বলছি বলছি। ওই ষাঁড়টাকে নিয়ে আসা হয়েছে যাতে গোরুগুলোর বাচ্চা হয়। ষাঁড় ওদের শরীরে ছোট বাচ্চা ঢুকিয়ে দেবে। সেটা একটু একটু করে বড় হয়ে বাছুর হয়ে বেরিয়ে আসবে। তখন গোরু অনেক দুধ দেবে। বুঝলে।' বুড়ো বলল।

'একেই পাল খাওয়ানো বলে?'

'হ্যাঁ।'

'অ। তাই বলো।' মাথা নাড়ল কণিকা, 'বুঝলাম।'

সে কী বুঝেছিল সেই জানে কিন্তু বুড়ো খুব স্বস্তিতে ছিল না তার চলে যাওয়ার পরেও।

কণিকার ঠাকুর্দার বই পড়ার শখ থেকে বাড়িতে, দোতলার শেষ ঘরে, একটি লাইব্রেরি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কোনও বিশেষ শ্রেণীর বই নয়, ভদ্রলোকের যা পাই গোগ্রাসে গিলি স্বভাবের জন্যে লাইব্রেরিটিতে ঠাকুমার ঝুলি থেকে বোরিস পাস্তারনায়েকের ডক্টর জিভাগো গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। ইদানীং কেউ পড়ুয়া না থাকলেও নিয়মিত ধুলো পরিষ্কার করানো হত। কণিকার মা চাইতেন মেয়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশুনা করুক। ঠাকুমার ঝুলি বা গালিভার্স ট্রাভেল অথবা কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো ওই বয়সেই পড়ে ফেলা উচিত। মেয়েকে তিনি দুপুরবেলাটা ওই বইগুলো নিয়ে লাইব্রেরিতে কাটাতে বাধ্য করেছিলেন। ব্যাপারটা কণিকার কাছে তেতো ওষুধ খাওয়ার চেয়েও কষ্টকর বলে মনে হয়েছিল। বিদ্রোহ করেও কাজ হয়নি। লাইব্রেরির ঘরে গিয়ে বসলে সে ভুলেও বাংলা বইয়ের দিকে হাত বাড়াত না। দার্জিলিংয়ের স্কুল তাকে ইংরেজিটা রপ্ত করিয়েছিল। কিন্তু মায়ের দেখানো ইংরেজি বইগুলোর পাতা উলটে সে কোনও রস পাচ্ছিল না। একদিন হঠাৎই আলমারি থেকে আরাবিয়ান নাইটস বইটি বের করে চোখ রাখল মাঝখানের

একটি পাতায়। কয়েক লাইন পড়তেই তার মেরুদণ্ডে অদ্ভুত শিরশিরানি শুরু হল। বাদশা দূর দেশে গিয়েছেন। তাঁর সুন্দরী ষোড়শী বেগম খুব একাকিত্বে ভুগছেন। একদিন জানলায় দাঁড়িয়ে আশপাশে তাকাতেই তিনি দেখতে পেলেন একটি তরুণ সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ছাদে শুয়ে রয়েছে। তার শরীর রোদ্দুরে পুড়ছে কিন্তু তাতে তরুণের কোনও কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হয় না। বেগম দেখলেন তরুণটি লম্বা, শরীর খুব সুগঠিত, ফর্সা। তাঁর খুব কৌতূহল হল কেন তরুণ এইভাবে শুয়ে রয়েছে তা জানার জন্যে। তিনি আদেশ দিলেন তরুণটিকে তাঁর কাছে ধরে নিয়ে আসার জন্যে। সে কেন নগ্ন হয়ে শোওয়ার বেআদবি করছে তা জানতে হবে।

আপাদমস্তক ভদ্র পোশাকে তরুণটি এসে যখন কুর্নিশ করল তখন বিকেলের ছায়া নেমেছে পৃথিবীতে। বেগম তাকে প্রশ্ন করলেন।

তরুণ বলল, 'আপনি যদি অভয় দেন তা হলেই সত্যি কথা বলতে পারি।'

বেগম বললেন, 'বেশ, অভয় দিলাম।'

'আমি একজন বেকার যুবক। আমার স্বাস্থ্য খারাপ নয় কিন্তু বড় বড় কুস্তিগিরদের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা আমার নেই। লড়াই করে তাদের হারালে প্রচুর টাকা পাওয়া যায়। তাই আমি খুব মনোকষ্টে ছিলাম। সাতদিন আগে স্বপ্নে একজন ফকিরের দেখা পাই। তিনি বলেন, বিবস্ত্র হয়ে আমি যদি সকালের সূর্যালোককে শরীরে ধারণ করি তা হলে হাতির চেয়ে বেশি শক্তিশালী হব। তিনি বলেছেন সূর্যের তেজ আমার লিঙ্গদ্বার দিয়ে শরীরে প্রবেশ করবে। আমি সেই উপদেশ মতো কাজ করে চলেছি।' তরুণটি সবিনয়ে বলল।

'তার মানে তোমার শরীরের ভেতর সূর্যের শক্তি জমা হচ্ছে?' বেগম অবাক।

'হ্যাঁ। বেগম সাহেবা।'

'আমি যদি ওই শক্তির কিছুটা চাই তা হলে তুমি দিতে পারবে?'

'আমি বেগমসাহেবার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।' তরুণ বলল।

'শোনো। ফকিরের উপদেশ মতো সূর্যের শক্তি সরাসরি গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই ঘরে রোদ্দুর আসে না। কিন্তু মাঝেমাঝেই নিজেকে দুর্বল লাগে। তাই তুমি যে শক্তি পেয়েছ তা থেকে কিছুটা আমাকে দাও।' বেগম বললেন।

তার পরের লাইনগুলোর বর্ণনা পড়ে চোখমুখ লাল হয়ে গেল কণিকার।

শক্তি দেওয়া নেওয়া হয়ে যাওয়ার পর বেগম বললেন, 'যখনই তোমাকে ডেকে পাঠাব তখনই তুমি এসে এ ভাবে শক্তি দিয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, তার জন্যে যদি আমার পেটে সন্তান আসে তা হলে সবাই জানবে সে বাদশার সন্তান। মুখ খুললেই তিনি তোমাকে শূলে চড়াবেন। আজ তোমার শক্তি কিছুটা কমে গেল। কাল সকালে আবার সূর্যের কাছে চেয়ে নিও। আর এই মোহরগুলো রাখো, কুস্তি করার কোনও দরকার নেই।'

দুটো পা অবশ হয়ে গিয়েছিল কণিকার। ঝট করে সে লাইব্রেরির দরজার দিকে তাকাল। কেউ নেই। এবার বইটার প্রথম পাতা থেকে পড়া শুরু করল। যত পড়ছিল তত মনে হচ্ছিল এক অজানা জগতে অভিযান করছে। সেইসঙ্গে তার ভয় করছিল, মা জানতে পারলে ব্যাপারটা সুখের হবে না, এই পড়াটা খুব গোপনে সারতে হবে।

এবং পড়তে পড়তেই ওর কাছে মানেটা স্পষ্ট হল। ষাঁড়টাকে নিয়ে আসা হয়েছে গোরুদের পেটে বাচ্চা তৈরি করার জন্যে। বেগমসাহেবার পেটে বাচ্চা তৈরি করতে পারে বেকার তরুণ।

মাত্র এগারো বছর বয়সে বাড়ির পেছনের গোয়ালঘরের খড়ের গাদায় কণিকা নিজের শরীরকে প্রথমবার উপভোগের চেষ্টা করল। তারপর স্বপ্নাতীত সুযোগ পাওয়ায় হতবুদ্ধি তরুণকে সে ভয় দেখাল, 'আমি যদি এখন তোর এই কাজের কথা বাবাকে বলে দিই?'

তরুণ আতঙ্কিত হয়ে মাথা নাড়ল, 'না, না। আমি কিছু করতে চাইনি—।'

'বাবা বিশ্বাস করবে না। তোর কী হবে বুঝতে পারছিস?'

এবার তরুণটি কেঁদে ফেলল।

খুব খুশি হল কণিকা, 'ঠিক আছে বলব না। কিন্তু আজ রাত্রেই তোকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। কাল সকালে যেন এ-বাড়িতে তোকে না দেখি।'

পরের দিন তরুণকে খুঁজে পাওয়া গেল না। খবরটা কণিকার বাবার কাছে গেলে তিনি বিরক্ত হলেন। কিছু চুরি করে পালায়নি জেনে আর খোঁজখবর না করে গোরুগুলোর পরিচর্যার জন্যে এক প্রৌঢ়কে নিয়োগ করলেন।

ঘটনাটির জন্যে শরীরে যে অস্বস্তি হয়েছিল তা দ্বিতীয় দিনেই চলে গেলে কণিকা আবার আরব্য রজনী নিয়ে মশগুল হল। হঠাৎই তার খেয়াল হল এইবার তার শরীরে বাচ্চা আসবে। প্রাণীদের বাচ্চার জন্যে বিয়ে করতে হয় না। বেগম বলেছেন তাঁর শরীরের বাচ্চার বাবা বলে বাদশাকেই সবাই জানবে।

তার ক্ষেত্রে কী হবে? বাচ্চা শরীরে এল কি না কী করে বোঝা যাবে? চিন্তায় তার চোখের তলায় ছায়া ঘন হল। সবসময় অন্যমনস্ক থাকত। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ওর মায়ের নজরে পড়ে গেল। কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করে সদুত্তর না পেয়ে তিনি স্থানীয় ডাক্তারকে খবর দিলেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোনও হদিস পেলেন না। কয়েক দিন পরে বাথরুমে স্নান করার সময় চিৎকার করে উঠল কণিকা। ভয়ে দরজা খুলে চেঁচিয়ে যেতে লাগল। ওর মা ছুটে গেলেন। মেয়ের দুই পায়ের দিকে তাকিয়ে দরজা বন্ধ করে বোঝালেন। কণিকা জানল পৃথিবীর সব মেয়ের শরীর থেকেই প্রতি মাসে রক্তপাত হয়। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম। শুধু বিয়ের পর পেটে সন্তান এলে তার জন্ম না হওয়া পর্যন্ত এটা বন্ধ থাকে। সব ভয়, সব যন্ত্রণা গিলে ফেলল কণিকা। মায়ের কথা ঠিক হলে তার শরীরে সন্তান আসেনি। কেন আসেনি? নিশ্চয়ই ওই গোয়ালঘরের তরুণটি অপদার্থ। সূর্যের কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে শেখেনি।

'হাই ইয়ং লেডি! গুড মর্নিং!'

চিৎকারটা পেছন থেকে ভেসে আসতেই কাবেরী মুখ ফেরালেন। সাদা শর্টস, সাদা পুলওভারের ওপর মাফলার, মাথায় টুপি, পায়ে ভারী কেড্‌স পরা যে বৃদ্ধটি এগিয়ে আসছেন তাঁর সঙ্গে পাহাড়ি সান্যালের চেহারার খুব মিল আছে।

'গুড মর্নিং!' কাবেরী হাসলেন।

ওঁকে আসতে দেখে আবদুল আর একটি বেতের চেয়ার এনে কাবেরীর উলটো দিকে রাখল। সেখানে বসে জোরে জোরে শ্বাস নিলেন বৃদ্ধ। তারপর বললেন, 'আজকের দিনটি দারুণ হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'কী করে বুঝলে?'

'মর্নিং শোজ দ্য ডে। আজ চার চারটে কিলোমিটার হেঁটেছি।'

'তোমার বয়সের পক্ষে বেশ বেশি।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন? আমার বয়স হয়েছে? আমার মতো উৎসাহী ব্যাচেলার আর দ্বিতীয়টা দেখেছিস?' তারপর চেঁচালেন, 'আবদুল।'

আবদুল এগিয়ে এল। বৃদ্ধ বললেন, 'আমি ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে দিনের প্রথম কাপ চা খাব।'

কাবেরী হাসলেন, 'মন্তামামা, তোমার জন্যে হুকুম আছে।'

'মানে?' বৃদ্ধ ধমকালেন।

'হার হাইনেস একটু আগে ফোন করেছিলেন। তোমাকে ফোন করতে বলেছেন।'

'এই সাতসকালে তাঁর আমার কথা মনে পড়ল কেন?'

'আমি জানি না।' রিসিভারটা এগিয়ে দিলেন কাবেরী।

দ্রুত নম্বরগুলোয় চাপ দিলেন মন্তামামা। তারপর যন্ত্রটাকে কানে চেপে অপেক্ষা করলেন, 'হ্যালো। হোয়ার ইজ লেডি? আমি, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও। বলে দিও ওঁকে।'

রিসিভারটা অফ করে মাথা নাড়লেন, 'এখন তিনি ম্যাসাজ করাচ্ছেন। এই বয়সেও ওর শরীর এত ফিট বিনা কারণে নয়। বেবি, তোর মায়ের ডুপ্লিকেট বোধহয় ভারতবর্ষে নেই।'

'একমত।'

তখনই রিং শুরু হল। কাবেরী ইশারা করলেন, 'তোমার ফোন।'

'বাজি?'

'বাজি। তোমাকে লাঞ্চের আগে একটা লার্জ ভদকা অ্যালাও করব।'

তা হলে সেটা তোকে করতে হবে। ' বলে রিসিভার তুললেন মন্তামামা, 'হ্যালো, আপনি কে কথা বলছেন?'

'গুড মর্নিং, মন্তাদা!' কণিকার গলা।

'মাই গড। তুমি তো ম্যাসাজ করাচ্ছিলে!'

'করাচ্ছি। তার জন্যে ফোনে কথা বলতে অসুবিধে কোথায়? হ্যাঁ, তুমি ওখানে আর কত দিন থাকতে চাও?'

'আই ডোন্ট নো। যেদিন খারাপ লাগবে সেদিন ভাবব।'

'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। বাগডোগরায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট কলকাতা থেকে পৌঁছায় দশটা চল্লিশে। একটা গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে চলে এসো। পাইলট তোমাকে একটা প্যাকেট দেবেন। ভদ্রলোকের নাম ক্যাপ্টেন শর্মা।'

'প্যাকেটটা কীসের?'

'ওয়েল, ইটস এ গিফট প্যাক।'

'তারপর?'

'ওটা তুমি বিকেলের আগে বেবিকে দেবে। কিন্তু এখন কিছু জানাবে না ওকে।'

'আই সি!' বৃদ্ধ কাবেরীর দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'হঠাৎ?'

'আজ ওর জন্মদিন, নিশ্চয়ই তুমি জানো না।' লাইন কেটে দিলেন কণিকা।

ফোন বন্ধ করে হতভম্ব হয়ে কাবেরীর দিকে তাকালেন বৃদ্ধ, 'মাই গড, কী ভীষণ বোকা আমি!' উঠে চলে এলেন কাবেরীর পাশে, হাত রাখলেন ওঁর মাথায়, 'শুভ জন্মদিন। দেরিতে হলেও এই যুবকের উষ্ণ অভিনন্দন গ্রহণ করুন ম্যাডাম।'

'ধন্যবাদ।' হাসলেন কাবেরী।

'অবশ্য একটু পরে, ন'টা নাগাদ আমি তোকে নিজে থেকেই অভিনন্দন জানাতাম। রোজ সকাল নটায় ডায়েরির পাতা দেখি। আজ তোর মা আগে ভাগেই বকুনিটা দিল।' ঘড়ি দেখলেন মন্তামামা, 'যাই। অনেক কাজ বাকি রয়েছে।'

'প্যাকেটের কথা কী জিজ্ঞাসা করছিলে মাকে?'

'ও এমন কিছু নয়। জাস্ট এ প্যাকেট।' বৃদ্ধ দ্রুত সরে গেলেন সামনে থেকে।

কাবেরী দেখলেন একটা মাঝারি সাদা মেঘ হাওয়ার টানে নেমে এসেছে নীচে। এই মেঘ নিয়ে কত কবিতা, কত আবেগের জন্ম। আবেগ! এই শব্দটি কণিকা চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে নেই। সেইসঙ্গে হেরে গেলে মেনে নিতে রাজি নন কিছুতেই। মায়ের যে চেহারাটা কাবেরী প্রথম মনে করতে পারেন তখন তাঁর নিজের বয়স বারো। তার আগে মাকে খুব ভালভাবে দেখেছেন বলে স্মৃতিতে নেই। মা সম্পর্কিত যাবতীয় কাহিনী শুনেছিলেন দিদিমার কাছে। কিন্তু সেই কাহিনীও তো দিদিমা যেমন জানতেন তেমন।

শীতের ছুটির পর কণিকা দত্তকে দার্জিলিং-এ ফিরে যেতে হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে বেশি দিন রাখেনি। লুকিয়ে ধূমপান করার অভিযোগে তাকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে ফেরত পাঠানো হল। মা প্রচণ্ড শাসন করলেন, বাবা বিব্রত। শেষ পর্যন্ত তিনি ওকে নৈনিতালের একটি বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। ওকে কোনও ছুটিতেই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে না। ছুটির সময় দত্ত পরিবার গিয়ে থাকবেন নৈনিতালে। ওখানে যাওয়ার পর মনে হল কণিকা খুব সিরিয়াস হয়ে গেছে। পরীক্ষায় দারুণ ফল করতে লাগল। তার আচার আচরণ নিয়ে কর্তৃপক্ষের কোনও অভিযোগ নেই। এই রকম ভাল মেয়ে হয়ে সে স্কুল শেষ করল। শ্রীযুক্ত দত্ত মেয়ের এই অভাবনীয় পরিবর্তনে খুব সন্তুষ্ট। ওকে নৈনিতালের কলেজেই ভর্তি করে দিয়ে এলেন।

কলেজ হোস্টেলের সুপার অত্যন্ত রাশভারী স্বভাবের অবিবাহিতা মহিলা। মিস টিমোথির বয়স চল্লিশের আশপাশে। খুব রাগী বলে মনে করে মেয়েরা। প্রথম দিনেই মিস টিমোথি কণিকাকে ডেকে বলে দিলেন, 'রাত আটটার সময় দারোয়ান গেট বন্ধ করবে। তারপর এলে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তা হলে তোমাকে রাত্রে বাইরে থাকতে হবে। কোনও মেয়ে যদি বিনা অনুমতিতে বাইরে রাত্রিবাস করে তা হলে হোস্টেলে তার জায়গা হবে না। কথাটা মনে রেখো।'

মাথা নেড়েছিল কণিকা, 'আমি বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসব।'

দু'দিন পরে সে মিস টিমোথির সঙ্গে দেখা করল, 'মিস, আমি কাল একটা স্বপ্ন দেখেছি। তারপর থেকেই আমার মন আর কিছুতেই—!' গলার স্বর যেন আটকে গেল।

মিস টিমোথি সন্দেহের চোখে তাকালেন, 'স্বপ্ন? পেট গরম হয়েছিল তোমার। আজ শুধু স্যুপ আর টোস্ট খাবে। স্বপ্নের কোনও গুরুত্ব নেই। যাও।'

'কিন্তু মিস, যেশাস যে বললেন!' কণিকা মরিয়া হল।

খুব অবাক হলেন মিস টিমোথি। একটা ষোলো বছরের মেয়েকে যেশাস স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন! তিনি নিজে নিষ্ঠাবতী খ্রিস্টান। প্রতিদিন দু'বার যিশুর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেন, রবিবারের সকালে গির্জায় যান। অথচ তিনি কখনও যিশুকে স্বপ্নে দেখতে পাননি।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'যেশাসকে তুমি স্বপ্নে দেখেছ?'

'হ্যাঁ মিস!'

'কী বললেন তিনি?'

'বললেন, তোমার মনে যদি কোনও বিষয়ে সংশয় এসে থাকে তা হলে সেটা আমাকে নিবেদন করো, আমি তা দূর করব। কিন্তু আমার কাছে যেশাসের কোনও ছবি নেই। চার্চে গেলে অবশ্য হয়।' কণিকা তাকাল, 'আপনার কাছে আছে?'

'নিশ্চয়ই। আমি দু' বেলা ওঁর কাছে প্রার্থনা করি। এসো।'

মিস টিমোথি কণিকাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের এক দেওয়ালের গা ঘেঁষে স্ট্যান্ডের ওপর যেশাসের মূর্তি। তার সামনে মোমদানি। কণিকা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেশাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর হাত জোড় করে বলল, 'ও মাই ডিয়ার যেশাস, তুমি মানুষকে ভালবাসতে বলেছ। কিন্তু যেসব মহিলা আজীবন অবিবাহিতা এবং পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে

থাকেন তাঁদের মনে ভালবাসা জন্মাতে পারে না। তাঁদের হৃদয় মরুভূমির মতো হয়ে যায়। তাঁরা কী করে ভালবাসবে তাই তুমি বলে দাও।'

মিস টিমোথি দূরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা শুনছিলেন, কথাগুলো কানে যাওয়া মাত্র তিনি চমকে উঠলেন। এ তো তারই ব্যাপার। কণিকা কি তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে! কণিকা তখনও প্রার্থনা করে যাচ্ছিল, 'ভালবাসা শুকিয়ে গেলে বয়স্কা মহিলারা নিষ্ঠুর হয়ে যায়। অন্য কেউ ভালবাসলে সহ্য করতে পারে না। ওঁদের বুকে তুমি প্রেম দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় মিস টিমোথি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই, এটা কী করছ?'

কণিকা বলল, 'প্রার্থনা। মিস, আপনি কথা দিন এখন থেকে নরম ব্যবহার করবেন?'

'তোমাকে, তোমাকে, হোস্টেল থেকে বের করে দেব আমি।' হিস হিস করে মিস টিমেথি একথা বলতেই চিৎকার করে উঠল কণিকা। যেন খুব ভয় পেয়েছে এমন গলায় না না বলতে বলতে কোনও রকমে দরজা ঠেলে বাইরে এসে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়ল। ওর এই আকস্মিক পরিবর্তনে মিস টিমোথি হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি কিছু বোঝার আগেই বারান্দায় কণিকাকে ঘিরে ভিড় জমে গেল। হোস্টেলের মেয়েরা তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছে, কেউ জিজ্ঞাসা করছে কী হয়েছে? কাউকে কিছু না বলে কণিকা সোজা চলে গেল নিজের ঘরে, গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

খবরটা পৌঁছে গেল কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডেকে পাঠালেন তাকে। ঘরে ঢোকা মাত্র ভদ্রমহিলা ওর আপাদমস্তক দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন,'মিস টিমোথির ঘরে কী হয়েছিল যে তুমি চিৎকার করে বেরিয়ে এসেছিলে, গত রাতে কোনও খাবার খাওনি! বলো।'

মাথা নাড়ল কণিকা। কেঁদে ফেলল।

'তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি স্বচ্ছন্দে বলো।'

কান্না জড়ানো গলায় কণিকা বলল, 'আমি বলতে পারব না। আপনি ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি আমার চেয়ে কত বড়।'

'মিস টিমোথি বলেছেন তোমার এই আচরণের পক্ষে কোনও কারণ নেই। উনি তোমাকে আজেবাজে কথা বলতে নিষেধ করায় তুমি নাকি অভিনয় করেছ। উনি তোমাকে হোস্টেলে আর রাখতে চাইছেন না। এখন তোমার বক্তব্য বলো।'

'আমি ওঁর বিরুদ্ধে খারাপ কথা বলতে পারব না। বেশ, আমি হোস্টেল থেকে চলে যাব।'

'খারাপ কথা মানে?' প্রিন্সিপালের কপালে ভাঁজ পড়ল।

'আমি আপনার কাছে ওসব কথা বলতে পারব না।' দ্রুত মাথা নাড়ল।

'নো। বলতে তোমাকে হবেই। কী করেছেন মিস টিমোথি?'

'উনি, উনি লেসবি। আমাকে পার্টনার হিসেবে চেয়েছিলেন। আমার শরীরে হাত দিয়েছিলেন। আমি মেনে নিতে পারিনি বলে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।' ঠোঁট কামড়াল কণিকা।

চোখ বন্ধ করলেন প্রিন্সিপাল।

সেই দিনই মিস টিমোথিকে হোস্টেল ছেড়ে চলে যেতে হল। তার জায়গায় যিনি এলেন তিনি খুব নরম প্রকৃতির মানুষ যাকে কব্জা করতে একটুও অসুবিধে হল না কণিকার।

এখন এ সময় বেলা বাড়লেও রোদের তেজ বাড়ে না। সাড়ে সাতটা নাগাদ স্নান সেরে চা খেয়ে সেজেগুজে যখন মন্তামামা বেরিয়ে এলেন তাঁর আউট হাউসের ঘর থেকে তখনও কাবেরী চেয়ার ছাড়েনি।

মন্তামামাকে দেখে কাবেরী বললেন, 'তুমি এক পেগ ভদকা হেরেছ।'

'ওঃ, সিওর। যখনই চাইবে তখনই ঋণমুক্ত হব।' মন্তামামা এগোলেন, 'আমি একটু বেরুচ্ছি। আশা করছি লাঞ্চের আগেই ফিরতে পারব।'

'টেক কেয়ার।' কাবেরী হেসে বললেন।

পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে মিনিট সাতেক হেঁটে বাজারে নেমে এলেন মন্তামামা। প্রতি ভোরে হাঁটাহাঁটি করায় এটুকু দূরত্ব হাঁটা তাঁর কাছে কিছুই নয়। এই পাহাড়ি শহরে বছরে দেড়েক থাকার পর তিনি অনেক ঝরঝরে হয়ে গেছেন।

বাজারের মুখেই ট্যাক্সিস্ট্যান্ড। ম্যাডাম চ্যাটার্জি চেয়েছিলেন এ বাড়িতে একটা গাড়ি রাখতে। কাবেরী চায়নি। তাঁর যুক্তি, যেহেতু তিনি খুব কম বাড়ির বাইরে যান এবং চাইলেই ট্যাক্সি পাওয়া যায় তাই গাড়ির কোনও দরকার নেই। ম্যাডাম আর কোনও কথা বলেননি।

ট্যাক্সিওয়ালারা মন্তামামাকে চেনে, দেখে কাছে চলে এল।

মন্তামামা বললেন, 'কে যাবি ঠিক করে নে, বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যাব।'

গুরুং নামের একটি যুবক ছুটে গেল গাড়ি আনতে। মন্তামামাকে পেছনে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'প্লেন ধরবেন তো?'

'ধরব, কিন্তু যাব না, ফিরে আসব।'

আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে ওমনি ভ্যান দ্রুত ছুটছিল। এক পাশে নদী, অন্য পাশে খাড়া পাহাড়। মন্তামামার বেশ ভাল লাগছিল। সারা জীবন ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে চাকরি করে অবসর নেওয়ার পর দেরাদুনে ছিলেন বেশ কিছু বছর। শেষের দিকে মনে হয়েছিল একা একা না কাটিয়ে আত্মীয়দের খবর নেওয়া যাক। দিল্লির কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, যদি তার সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত কেউ এখনও জীবিত থাকেন তা হলে যোগাযোগ করতে। দ্বিতীয় দিনে টেলিফোন এল, 'মিস্টার আর এস বাসু?'

'স্পিকিং।'

'আপনি কি বাই এনি চান্স দুবরাজপুরে জন্মেছিলেন?'

'আপনি কে কথা বলছেন?'

'আমি চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জি থেকে কথা বলছি।'

'হ্যাঁ, আমি দুবরাজপুরে জন্মেছি।' মন্তামামা বলেছিলেন।

আপনার বাবার নাম এস এন বাসু?'

'ইয়েস। বাট——

'প্লিজ হোল্ড অন!'

তারপরে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। শেষ পর্যন্ত একটি মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল, চোস্ত ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন তাঁর ডাক নাম মন্তা কি না।

নিজের এই নামটা কত বছর পরে শুনলেন তা নিজেরই খেয়াল নেই। সেই দশ বছর বয়স থেকে দিল্লির স্কুলে, কলেজে, এয়ারফোর্সে। সেখানে কেউ তাঁকে মন্তা বলে ডাকার সুযোগ পায়নি। মা মারা গিয়েছিলেন আগেই, বাবা গেলেন যখন তাঁর আটাশ বছর বয়স, ব্যাস। সব চুকে বুকে গেল।

রিসিভারের দিকে মুখ করে বললেন, 'ইয়েস।'

'গুড। মন্তাদা, আমি কণিকা। মনে পড়ছে?' একটু তরল হল গলার স্বর?

'ক-ণি-কা——

'কণি। তোমার মা আমাকে ওই নামে ডাকত। আমার যখন সাত বছর বয়স তখন তোমাদের দুবরাজপুরের বাড়িতে গিয়ে দশ দিন ছিলাম। আমার মা এবং বাবা। ওয়েল, তুমি আমার পিসিমার ছেলে!'

'ওঃ মাই গড। মনে পড়েছে। কণি! দারুণ ফর্সা এবং মিষ্টি দেখতে।'

'থ্যাঙ্কু।'

'তুমি এখন কী করছ, আই মিন কোথায় আছ?'

'কলকাতায়। চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জি কোম্পানির নাম শুনেছ?'

'নিশ্চয়ই। ভারতের প্রথম দশটা বিজনেস হাউসের একটা।'

'আমার স্বামী স্যার অমলেশ চ্যাটার্জি হঠাৎ মারা যাওয়ায় আমাকে দায়িত্ব নিতে হয়েছে। খবর পেলাম তুমি বিয়ে করনি, এয়ারফোর্স থেকে অবসর নিয়ে ভালই আছ। তা হঠাৎ এত দিন পরে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত লোকজনের খোঁজ করছ কেন?'

'জাস্ট কৌতূহল। ওটা না করলে তোর সঙ্গে যোগাযোগ হত না।'

'মন্তাদা, বহু বছর পরে কেউ আমাকে তুই বলল।'

'ওঃ, আই অ্যাম সরি। মানে—

'দ্যাটস অলরাইট। তুমি আমার চেয়ে বড়, আমাকে তুই বলবে।' কণিকা বললেন, 'তুমি আজ লাঞ্চে ফ্রি আছ?'

'লাঞ্চ? হ্যাঁ, কিন্তু তুই—

'আমি তোমার মতোই দিল্লিতে। ঠিক সাড়ে বারোটায় শেরাটনে চলে এসো।'

শেরাটন হোটেলের রিসেপশনেই টের পেলেন তিনি। কণিকা চট্টোপাধ্যায় এই হোটেলের খুব দামি ক্লায়েন্ট। পরিচয় দেওয়ামাত্র একজন অফিসার তাঁকে নিয়ে গেল দামি রেস্তোরাঁতে। রিজার্ভড বোর্ড সরিয়ে চেয়ার টেনে বসাল। বলল, 'ম্যাডাম যে কোনও মুহূর্তেই এসে পড়বেন।'

খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখায় এদের খবর তিনি পাননি। এমন কী স্যার অমলেশ চ্যাটার্জি যে তার মামাতো বোনের স্বামী তাও জানা ছিল না। ভাগ্যিস বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলেন।

এই সময় কণিকাকে দেখতে পেলেন। হ্যাঁ এখনও সুন্দরী। সুন্দরী, লম্বা, কায়দা করে ছাঁটা চুলে একটু রুপোলি ছোঁয়া। হাঁটার ভঙ্গিতে সামান্য জড়তা নেই। উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। কাছে এসে কণিকা হাত বাড়ালেন, 'তুমি এখনও যুবক!'

'আমি! পাগল। বৃদ্ধ হয়ে গেছি। কিন্তু তোর রহস্যটা কী? চুল কালো করলে যে কোনও ছেলে প্রেমে পড়ে যাবে।'

'ওঃ।' কাঁধ ঝাঁকালেন কণিকা, 'ডোন্ট টক রাবিশ।'

ওঁরা বসলেন।

'তারপর, খবর কী?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'ভাল। ব্যবসা বাড়ছে তো বাড়ছেই। আমার হাজব্যান্ড যাঁর ওপর ডিপেন্ড করতেন তিনি এখনও সক্রিয়। কিন্তু তাঁরও বয়স হয়েছে। যে দু'জনকে উনি সহকারী হিসেবে রেখেছিলেন তাদের একজনকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। ব্যাস।'

'তোর কোম্পানির টার্নওভার কত?'

'গত বছর দেড়শো কোটি ছিল। খুব কম প্রফিট করি। টোয়েন্টি পার্সেন্ট।'

'মাই গড। তার মানে তিরিশ কোটি টাকা?'

'এটা কিছুই নয়। এ বছর আমরা তিনটে বিদেশি রাষ্ট্রের মিলিটারি ইউনিফর্মের অর্ডার পেয়েছি। ওটা প্লাস হলে পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যাবে। মন্তাদা, একটাই আফসোস, আমার ছেলে-মেয়েরা কেউ পাশে দাঁড়াতে পারল না। কী নেবে?'

বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছিল। কণিকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিয়ার না জলজিরা?'

'জলজিরা।' ইচ্ছে করেই দ্বিতীয়টি বাছলেন তিনি।

মেনু পছন্দের ব্যাপারে তাঁর এই মামাতো বোনটির যে রুচি আছে তা বুঝলেন তিনি। জলজিরায় চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার চ্যাটার্জির কী হয়েছিল?'

'আচমকা হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

'ও।' একটু চুপ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোর ছেলে-মেয়ে?'

'আমার প্রথম সন্তান একটি ছেলে। লোকে বলত আমার ডুপ্লিকেট। বেঁচে থাকলে ও-ই চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জির হাল ধরত। আমি বিশ্রাম পেতাম।'

'বেঁচে নেই?' অবাক হলেন মন্তামামা।

'নেই। ওর চার বছর বয়সে টয়লেটে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও ডাক্তাররা বাঁচাতে পারেননি। রোগটা ঠিক কী এই নিয়ে ডাক্তারদের মধ্যেই মতভেদ ছিল।'

'খুব স্যাড। তুই বললি প্রথম সন্তান ছেলে!'

'হ্যাঁ, দ্বিতীয়টি মেয়ে। আমার দুর্ভাগ্য ও বাবার গায়ের রং পেয়েছিল। ছেলেবেলায় মুখ চোখ ভাল ছিল না। আমি ওর বাবাকেও যেমন সহ্য করতে পারতাম না তেমনি ওকেও পারিনি। একেবারে বাচ্চা বয়স থেকেই বোর্ডিং স্কুলে রেখেছিলাম। পাশ করার পর আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেখানে পড়াশুনা শেষ করার আগেই প্রেমে পড়ে গেল একজন পাঞ্জাবি ছেলের। আমি আপত্তি করিনি। ভেবেছিলাম ও যদি ওখানেই সেটলড হয় তা হলে আমার

দায়িত্ব কমে গেল। ওদের দুটো বাচ্চাও হল। প্রথমে ছেলে, তারপর মেয়ে। তারপরেই মেয়ে জানাল সে তার স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারছে না। ছেলেটা নাকি সাদা মেয়ে পেলেই পাগল হয়ে যায়। ডিভোর্স হল। ছেলে থেকে গেল তার বাবার কাছে, মেয়েকে নিয়ে ও চলে এল কলকাতায়। এখন কাবেরী আছে দার্জিলিং-এর কাছে একটা পাহাড়ি বাংলোয়। ওটা আমাদেরই। জায়গাটা খুব নির্জন। ওর নাকি ওখানে থাকতে ভাল লাগে।'

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে কণিকা বললেন, 'তুমি একবার কাবেরীর কাছ থেকে ঘুরে এসো। হয়তো জায়গাটাকে তোমার পছন্দ হয়ে যাবে।'

'ওয়েল, আমার আপত্তি নেই। আমি তো এখন বেকার।'

পরের দিনই একটা খাম পেলেন তিনি। তাতে দিল্লি থেকে বাগডোগরা পৌঁছবার প্লেনের টিকিট। সৌজন্যে, কণিকা চ্যাটার্জি। সঙ্গে একটি স্লিপে লেখা, এয়ারপোর্টে ট্যাক্সি অপেক্ষা করবে।

এয়ারপোর্টে নিজের নামটা প্ল্যাকার্ডে পড়লেন মন্তামামা। ইংরেজিতে লেখা মন্তামামা। যে নেপালি ছেলেটি প্ল্যাকার্ড ধরেছিল তার বয়স বেশি নয়, ফিল্ম স্টারের মতো দেখতে। আলাপ করার পর জানলেন বাংলোয় পৌঁছাতে দু' ঘণ্টা দশ মিনিট লাগবে। যাওয়ার পথে নদী, পাহাড় আর কুয়াশা দেখে প্রেমে পড়ে গেলেন তিনি। এয়ারপোর্টে চাকরি করার সময় তিনি ডুয়ার্সের হাসিমারায় গিয়েছিলেন কিন্তু ওখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এরকম নয়। দূরে ভুটানের পাহাড় ছিল বটে কিন্তু হাসিমারা সমতলে।

বাংলোর গেটে গাড়ি পৌঁছালে দুটো লোক এগিয়ে এসেছিল। তখন বিকেল হব হব। এদের দু' জনকেই তিনি জাম্বুবান এবং হাম্বুবান বলে ডাকেন এখন। দুটো স্যুটকেস ওদের হাতে দিয়ে বাড়ির পাশ দিয়ে বাগানে ঢুকতেই শুনতে পেলেন, 'ওয়েলকাম।'

মধ্য চল্লিশের যে মহিলা বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর গায়ের রং বেশ কালো কিন্তু শরীরের গঠন অপূর্ব সুন্দর। কাছাকাছি হতেই মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মন্তামামা?'

'হ্যাঁ, আপনি, তুমি—!'

'কাবেরী, কাবেরী দত্ত।'

'দত্ত?'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই ওটা পালটাইনি। আমি আপনার ভাগ্নী।'

'মাই গড! আমার এত বড় ভাগ্নী আছে তা এতকাল জানতামই না!'

'বসুন। আমারও জানা ছিল না যে লেডি কণিকা চ্যাটার্জির কোনও দাদা আছেন! অ্যাট লিস্ট কাউকে তিনি দাদা বলে ডাকবেন এখন থেকে।'

'একটু অন্য রকম গন্ধ পাচ্ছি!'

'না। এটা একটা সিম্পল স্টেটমেন্ট।'

মন্তামামা চার পাশে তাকালেন। কুয়াশারা চাপ চাপ হয়ে রয়েছে চার পাশে। বললেন, 'বিউটিফুল। আমি যদি কিছু দিন এখানে থাকি তা হলে তোমার কি অসুবিধে হবে?'

'বিন্দুমাত্র না। মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগবে। শুধু সন্ধের পর আমি একা থাকা পছন্দ করি।'

'ওকে!'

'আবদুল!' ডাকা মাত্র লোকটি কাছে এসে দাঁড়াল।

'সাহেবকে ওঁর থাকার জায়গা দেখিয়ে দাও। উনি কখন কী খান তা জেনে নাও। এখন থেকে ওঁর যাতে কোনও অসুবিধে না হয় তা তুমি দেখবে।' কাবেরী আদেশ দিলেন।

ট্যাক্সির পিছনের আসনে বসে মন্তামামা মাথা নাড়লেন। না, তাঁর কোনও অসুবিধে এখন পর্যন্ত হয়নি। জায়গাটা তো বটেই কাবেরীর ব্যবহার এত ভাল লেগে গেল যে একবার ফিরে গিয়ে ওখানকার পাট চুকিয়ে চলে এসেছেন পাকাপাকি ভাবে। কিছু কিছু কৌতূহল অবশ্যই তাঁর ছিল। দিনের বেলায় আড্ডা মারার সময় কাবেরীকে তিনি প্রশ্নও করেছিলেন। খুব সৌজন্যের সঙ্গে যেটুকু না বললে নয় তা বলে পাশ কাটিয়ে গেছে সে। তারপর আর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কথা বলেননি মন্তামামা। যেমন, চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জির এই বিপুল ব্যবসা একা সামলাচ্ছেন কণিকা চ্যাটার্জি। কাবেরী কেন তাঁকে সাহায্য করছেন না? জবাবে কাবেরী হেসে বলেছিল, 'আমার টাইটেল চ্যাটার্জি নয় বলে।' দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, এ রকম নির্জনে কাবেরী একা আছে কেন? ওর মেয়ে কোথায়?

কাবেরী বলেছিলেন, বিয়ের পর স্বামীকে ছেড়ে মায়ের কাছে কেন থাকবে সে?

'বাঃ! বিয়ে হয়ে গেছে? কত বয়স ওর?'

'সাড়ে উনিশ। কুড়িই হয়নি এখনও।'

অবাক হয়েছিলেন। এত অল্প বয়সে এই পরিবারের মেয়ে বিয়ে করবে

কেন? কিন্তু প্রশ্ন করেননি তিনি। কখন থামতে হয় জীবন তাঁকে শিখিয়েছে।

হঠাৎ হইহই করে হিন্দি গান বেজে উঠতেই বিরক্ত হয়ে সামনে তাকালেন মন্তামামা। ছেলেটির মনে পড়েছে যে তার গাড়িতে টেপ লাগানো আছে। এখন ক্যাসেট চালিয়ে মাথা দোলাচ্ছে গাড়ি চালাতে চালাতে। শব্দটাকে কমাতে বললেন তিনি।

বাগডোগরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে জানতে পারলেন কলকাতার প্লেন আধঘণ্টা দেরিতে আসছে। ঘড়ি দেখলেন। তারপর বইয়ের দোকান থেকে হ্যারল্ড রবিন্সের একটা বই কিনে বসে গেলেন চুপচাপ।

কলকাতার প্লেন এল। গল গল করে বেরিয়ে আসছে যাত্রীরা। এগিয়ে যেতেই বাধা পেলেন তিনি। রানওয়েতে যাওয়া চলবে না। যাত্রী হলে টিকিট হাতে নিয়ে সিকিউরিটিতে চেকিং করিয়ে ওপাশ দিয়ে যাওয়া যাবে যখন ডাক আসবে। শেষ পর্যন্ত দুজন ইউনিফর্ম পরা অফিসারকে অফিসের দিকে আসতে দেখলেন তিনি। ওদের একজনের হাতে মাঝারি সাইজের ব্যাগ।

এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের মধ্যে কেউ কি ক্যাপ্টেন শর্মা?'

'ইয়েস!' অফিসার দাঁড়ালেন।

'আমাকে বলা হয়েছে এয়ারপোর্টে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

'আচ্ছা! আপনার নাম——

'আর এন বাসু।'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দেখলেন, 'সরি। আমাকে যাঁর কথা বলা হয়েছে তাঁর নাম আলাদা।'

'কিন্তু আজ ভোরে মিসেস চ্যাটার্জি আমাকে বলেছিলেন...! ওয়েল বাই এনি চান্স, উনি কি আমার ডাকনামটা আপনাকে জানিয়েছেন?'

'কী সেটা?'

'মন্তা, মন্তাদা!'

সঙ্গে সঙ্গে অফিসার হাত বাড়ালেন, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ। এই নিন।'

ব্যাগটা এগিয়ে ধরতেই সেটা নিলেন মন্তামামা। বেশ ভারী ওটা। ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এলেন ট্যাক্সিতে।

বাংলোয় ফিরে এলেন যখন তখন দুপুর যাব যাব করছে। আবদুল জানাল, মেমসাহেব অপেক্ষা করছেন। তিনি এলে একসঙ্গে লাঞ্চ করবেন বলে।

মিনিট পাঁচেক বাদে লাঞ্চের টেবিলে বসে ছোট্ট বাক্সটা এগিয়ে দিলেন

মন্তামামা, 'আবার বলছি, হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ!'

'ওমা! এটা কী?'

'খুলে দ্যাখ! তোর হয়তো পছন্দ হবে না।'

বাক্সটি খুলতেই চোখ বড় হল কাবেরীর, 'ওমা, কী সুইট! দারুণ! কোথায় পেলে তুমি?'

'ফেরার সময় শিলিগুড়িতে গিয়েছিলাম। তাই দেরি হল একটু। অবশ্য প্লেনও দেরিতে এসেছিল।'

'প্লেন?'

'বলছি। আঙুলে হবে তো?'

'সিওর।' আংটিটাকে সযত্নে আঙুলে ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন কাবেরী। তাঁকে খুব আনন্দিত দেখাচ্ছিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ মন্তামামা।'

খাওয়া শেষ হলে মন্তামামা আবদুলকে বললেন ব্যাগটাকে আনতে।

কাবেরী বললেন, 'তুমি চলে যাওয়ার পর দারুণ মজা হয়েছে।'

'কী রকম?'

'একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকে পুঁচকি বাচ্চাদের এদিকে ঘোরাতে এনেছিল। আমার বাড়ির সামনে ওদের গলা পেতে আমি ডেকে পাঠালাম। পনেরোজন বাচ্চা আর দু'জন টিচার। এই বাগানের ফুল দেখে ওরা খুব খুশি। বাচ্চাগুলো আমাকে গান শোনাল, নাচ দেখাল। এত আনন্দ অনেক দিন পাইনি।' কাবেরী হাসলেন।

'ভগবান তোকে জন্মদিনের উপহার দিলেন।'

'হয়তো। আজকের দিনটায় সব কিছু ভাল হচ্ছে।'

আবদুল ব্যাগটা নিয়ে এলে তাকে চেন খুলতে বললেন। চেন খুলে একটা বড় পিজবোর্ডের বাক্স বের করে টেবিলে রেখে সরে দাঁড়াতে, আবদুলকে ইশারায় চলে যেতে বললেন মন্তামামা, তারপর হেসে বললেন, 'এবার এটাকে খোলা যাক।'

'কী আছে?'

'তোমার জন্যে, তোমাকে চমকে দেওয়ার জন্যে উপহার।'

বাক্সটা খুলতেই থার্মোকলের মোড়ক দেখা গেল। তার ভেতর থেকে মন্তামামা টেনে বের করলেন পাঁচ লিটারের ব্লু লেবেল হুইস্কির বোতল। বোতলের গায়ে একটা কার্ড ঝুলছে। তাতে ইংরেজিতে লেখা, 'কেউ ভাবে বিষ, কেউ অমৃত। যার রুচি যেমন।'

কাবেরী বললেন, 'মাই গড!'

মন্তামামা অবাক হয়েছিলেন। জন্মদিনের উপহার হিসেবে ঠিক মানতে পারছিলেন না।

কাবেরী বললেন, 'লেডি চ্যাটার্জি যখন ফোন করবেন তখন তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানিও। জিনিসটা সত্যিই খুব সুস্বাদু।'

'কী করে বুঝলি এটা তোর মা পাঠিয়েছেন।'

হাসলেন কাবেরী, 'পৃথিবীতে ওঁর বিকল্প কেউ নেই, তাই।'

'চমৎকার। সকালে আমাকে হুকুম করেছিল এয়ারপোর্টে গিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে গিফট বাক্সটা নিয়ে আসতে। আমার ভাল নামটাকে মুছে ফেলে ডাকনামটাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে। কাপ্টেন শর্মা আর এন বাসুকে চিনতে পারেনি, মন্তাকে পেরেছে। যাক গে, এটা ক'দিনে শেষ হবে?'

'কোনও দিনও না।'

'মানে?'

'আমি এসব খাই না।'

'তা হলে?'

'ওয়েল। রোজ বিকেলে আবদুল কাছের এক গ্রাম থেকে যেটা নিয়ে আসে তা আমার জন্যে স্পেশ্যালি তৈরি করা হয়।'

'তুই কান্ট্রি লিকার খাস?'

'হ্যাঁ। তবে এখানকার বাজারে ও জিনিস পাওয়া যায় না। তুমি যদি টেস্ট করতে চাও তা হলে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

'দিস তো। কী এমন জিনিস যা ব্লু লেবেল ফেলে খাচ্ছিস!' মন্তামামা উঠে দাঁড়ালেন, 'যাই একটু হাঁটাহাঁটি করি।'

'সেকী। সারাদিনই তো ঘুরলে, আবার কেন?'

মন্তামামা হাসলেন। কাবেরী একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'চলো, আজ আমিও যাব তোমার সঙ্গে, খাওয়ার পর একটু হাঁটা ভাল।'

'ওয়েলকাম।' মন্তামামা বললেন।

কাউকে জব্দ করার সুযোগ পেলে খুব খুশি হত কণিকা। সেটা করার পর অম্লানবদনে মিথ্যে বলতে একটুও গলা কাঁপত না তার। আর এই ব্যাপারে তার চেহারা তাকে বেশ সাহায্য করত। সুন্দরী তো বটেই, তার মুখে এমন একটা

লাবণ্য জড়ানো থাকত যে মানুষ ওর কথাই বিশ্বাস করতে পছন্দ করত। পাশাপাশি পড়াশুনাও চমৎকার এগোচ্ছিল। নৈনিতাল কলেজ থেকে প্রথম বিভাগেই অনার্স গ্রাজুয়েট হওয়ার পর মায়ের ইচ্ছে হল এবার মেয়ের বিয়ে দেবেন। ব্যাপারটা অত্যন্ত অপছন্দের ছিল কণিকার আর তখন বাবার সমর্থন পেলেন। নৈনিতাল থেকে তাকে নিয়ে আসা হল দিল্লিতে। একটি দামি কলেজে পরীক্ষা দিয়ে কণিকা এম বি এ কোর্সে ভর্তি হয়ে গেলেন। ওই কলেজে হোস্টেলের ব্যবস্থা ছিল মেয়েদের জন্যে। কণিকার রুমমেট হল যে মেয়েটি সে এসেছে কেরল থেকে, নাম উষা। রোগা, শ্যামলা, ভারী পাওয়ারের চশমা পরা মেয়েটি ক্লাস লাইব্রেরি আর হোস্টেলের ঘর ছাড়া আর কিছু চিনত না। প্রথমে বিরক্ত হলেও পরে কণিকা ভেবে দেখল, এ রকম রুমমেট থাকলে অনেকটা নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। ক্লাশ না করলেও নোটগুলো পেতে অসুবিধে হবে না।

সহপাঠী ছেলেদের সবাই মেধাবী এবং অনেকেই বিত্তশালী পরিবার থেকে এসেছে। কণিকার রূপের আকর্ষণে তাকে ঘিরে স্তাবক তৈরি হতে দেরি হল না। রেস্টুরেন্টে বসে কণিকা যখন সিগারেট ধরায় তখন ওদের চোখ-মুখের মুগ্ধতা বেড়ে যায়। কিন্তু ক'দিনেই কণিকা বুঝে গেল তার সহপাঠীরা নিতান্তই ছেলেমানুষ। ওদের মানসিকতার স্তর তার থেকে অনেক নীচে। দু' মিনিট কথা বলার পর আর কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে নিজেকে গুটিয়ে নিল সে। হঠাৎই একদিন উষার টেবিলে বইটি দেখতে পেল। এস ডে মিলারের লেখা, হু ইজ গড?

কৌতূহল হল বই-এর নামে। পড়া শুরু করল সে। উষা অবাক হয়ে দেখল টেবিলে ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়ে যাচ্ছে কণিকা। পড়া শেষ হল ভোর চারটেয়। তারপর থেকে কীরকম ঝিম মেরে গেল সে। নিজেকে খুব ক্ষুদ্র বলে মনে হচ্ছিল। দ্বিতীয়বার পড়ল সে বইটা, একদিন পরে। তারপর ঝেড়ে ফেলতে চাইল বই থেকে তৈরি হওয়া যত আধ্যাত্মিক চিন্তা। সে নিজের জন্যে একটা থিওরি তৈরি করল। তুমি কেন বেঁচে আছ? উত্তর হল, উপভোগ করতে। উপভোগ বলতে কী বোঝ? যা তোমাকে আনন্দিত করে। কেন তুমি ব্যবসা করছ? উপার্জন করতে। ওই উপার্জন যদি বাঁকা পথে করতে হয়? পথটাকে সতর্কভাবে পেরিয়ে সাফল্য আসার পরই ভুলে যেতে হবে পথটাকে। আবার পড়াশুনায় মন দিল কণিকা। সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশের সফল শিল্পপতিদের জীবন এবং কাজ নিয়ে যেখানে যত লেখা বেরিয়েছে তা সংগ্রহ করতে লাগল।

তৃতীয় সেমিস্টারের শেষে কণিকার পরীক্ষার ফল যখন প্রথম সারিতে তখন ভিজিটিং লেকচারার হিসেবে স্যার অমলেশ চ্যাটার্জির নাম কলেজে বিজ্ঞাপিত হল। তিনি একদিন এক ঘণ্টার ক্লাস নেবেন। ওদের কলেজে প্রায়ই বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ অথবা শিক্ষিত শিল্পপতিদের এনে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দেওয়ানো হয়। এখন পর্যন্ত তাঁদের কেউই বঙ্গসন্তান ছিলেন না বলে কণিকা আগ্রহী হল। সে জানতে পারল ভদ্রলোকের বয়স এখনও চল্লিশের নীচে। অবিবাহিত এবং চ্যাটার্জি কোম্পানি বিপুল সম্ভাবনার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু ভদ্রলোককে নিয়ে যখন প্রিন্সিপাল ক্লাসে এসে ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তখন খুব হতাশ হল কণিকা। খাটো চেহারার খুব কালো মানুষটি বেশ রোগা। দারুণ দামি স্যুট ওই শরীরে একটুও মানাচ্ছে না। গলার স্বর অবশ্য ভরাট। বক্তব্য রাখলেন বেশ দাপটের সঙ্গে। যে বিষয় নিয়ে কথা বললেন সেই বিষয় নিয়ে তাঁর মনে কোনও অস্বচ্ছতা নেই। লোকটির চেহারা না দেখে চোখ বন্ধ করে কথা শুনতে শুনতে মনে সমীহভাব জন্মাল, কিন্তু চোখ খুললেই সেটা উধাও হয়ে যেত। ভদ্রলোক তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন এই ভাবে, থিওরির সঙ্গে বাস্তব জীবনের মিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় না। তোমরা যারা মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পড়ছ ভবিষ্যতে তাদের অনেকেই বিজনেস করবে না, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনেই ডুবে থাকবে। সেক্ষেত্রে আমার আজকের বক্তব্য বেনাবনে মুক্তো ছড়ানোর মতো হয়ে যাবে।',

এই শেষের সংলাপগুলো তাতিয়ে দিল কণিকাকে। মনে হল লোকটাকে প্রত্যাঘাত করা উচিত। অগাধ জ্ঞান আর প্রচুর টাকাপয়সার জন্যে ওইরকম উদ্ধত কথা বলা আয়ত্তে এনে ফেলেছেন স্যার অমলেশ চ্যাটার্জি। এটা ওঁকে বোঝানো দরকার।

স্যার অমলেশ কোথায় উঠেছেন তা সহজেই জানা গেল। তাদের কলেজের অফিস থেকেই বলল। 'ওঁকে তাজ প্যালেস থেকে আনা হয়েছে, সেখানেই ফিরে গেছেন।'

বিকেল সাড়ে চারটের সময় একটা অটো নিয়ে কণিকা সোজা তাজে চলে গেল। তখনও পর্যন্ত কোনও পাঁচতারা হোটেলে সে ঢোকেনি, বাবার সঙ্গে যাওয়ার সুযোগও হয়নি। রিসেপশনে পৌঁছে সে গম্ভীর গলায় বলল, 'স্যার অমলেশ চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে চাই। উনি কি আছেন?'

সুন্দরী মহিলাটি হেসে বললেন, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?'

'না। একটু আগে উনি আমাদের কলেজে ক্লাস নিয়েছেন। সেই ব্যাপারে কথা বলব।'

'আপনি ওঁর সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলুন প্লিজ।'

ডায়াল করে রিসিভারটা এগিয়ে দিলেন মহিলা।

'হ্যালো। হু ইজ দেয়ার?' একেবারে পাতি বাঙালি উচ্চারণে ইংরেজি বলল লোকটা।

কণিকা সুযোগ ছাড়ল না। দার্জিলিং এবং নৈনিতালের স্কুলে শেখা ইংরেজিতে বলল, 'স্যার অমলেশ আজ আমাদের ক্লাস নিয়েছিলেন। তিনি আমাদের কিছু ভুল তথ্য দিয়েছেন। ওর মতো শিল্পপতি যাতে ভবিষ্যতে ওই ভুল দ্বিতীয়বার না করেন তাই ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ভদ্রলোক যেন হকচকিয়ে গেলেন। 'এক মিনিট' বলে আড়াই মিনিট সময় নিলেন। তারপর বললেন, 'ওয়েল, স্যার চ্যাটার্জি আপনাকে ঠিক সাত মিনিট সময় দেবেন।'

স্যার অমলেশ চ্যাটার্জি রিসিভারটা রেখে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। বক্তৃতা দিয়ে এসে উনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছেন। সাড়ে পাঁচটায় দিল্লি চেম্বার্স অব কমার্সে তাঁর যাওয়ার কথা। এখন তাঁর পরনে পাঞ্জাবি আর পাজামা। বাড়িতে এই পোশাকে থাকতে তিনি পছন্দ করেন। নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে তিনি ঠোঁট ওলটালেন। কত নামকরা ডাক্তার দেখিয়েছেন, চেহারাটার কোনও পরিবর্তন হল না। কিন্তু একটি এম বি এ ছাত্রী তাঁর ভুল ধরাতে দেখা করছে, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। সে তাকে বক্তৃতার সময় দেখেছে এবং তা সত্ত্বেও যে আসছে তাতে বোঝা যাচ্ছে চেহারা নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না। কিন্তু তিনি একটি কথাও ভুল বলেননি। তা হলে ছাত্রীটি কী ভুল ধরাবে। ব্যাপারটা তাঁকে কৌতূহলী করল।

দরজায় শব্দ। স্যার অমলেশ এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে চমকে গেলেন। এত সুন্দরী কোনও মেয়ে আজ তাঁর বক্তৃতা শুনেছে? অবশ্য বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি কাউকে বিশেষ ভাবে দ্যাখেননি। তা হলে চোখ এড়িয়ে গেল কী করে? এইসময় কণিকা বলল, 'স্যার।'

সংবিৎ ফিরে আসতেই অমলেশ বললেন, 'ইয়েস!'

'আমি আপনার সঙ্গে—!'

'ওহো, ইয়েস। কাম ইন প্লিজ।' দরজাটা চওড়া করলেন তিনি।

সোফা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'বি কমফর্টেবল।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আমি বাংলায় কথা বলতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। তুমি যে বাঙালি তা দেখে বোঝা যায় না।'

'আমি জানি না এটাকে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নেওয়া যায় কি না।'

স্যার অমলেশের কপালে ভাঁজ পড়তেই কণিকা বলল, 'আমি কণিকা।'

'ওয়েল, শুনলাম তুমি আমার বক্তব্যে কিছু ভুল পেয়েছ!'

'আমি এক গ্লাস জল পেতে পারি?'

'সিওর!' স্যার অমলেশ নিজে জল এনে দিলেন।

পুরোটা খেয়ে নিল কণিকা। তারপর গ্লাস টেবিলে রেখে সোফায় বসল। এখানে আসার আগে সে ইচ্ছে করেই খাটো স্কার্ট আর বড় গলা জামা পরেছিল। এতে তার বয়স আরও কম দেখায়। আসার সময় শুধু অটোওয়ালাই নয়, অনেকের চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝেছিল তাকে খুব আকর্ষণীয় বলে ওদের মনে হচ্ছে।

সে পায়ের ওপর পা এমন ভাবে রাখল যাতে স্কার্টের প্রান্ত বেশ ওপরে উঠে যায় আর হাঁটুর ওপরের মসৃণ এবং চকচকে পা স্পষ্ট হয়। স্যার অমলেশ উলটোদিকের সোফায় বসেই সেদিকে তাকিয়ে অস্বস্তিতে পড়লেন।

'স্যার, বেনাবন কি আপনি দেখেছেন?'

'দেখিনি, তবে অনুমান করি।'

'কী রকম?'

'আগাছার বন।'

'সেখানে কেউ অযথা মুক্তো ছড়াবে কেন? আই মিন যে টাকা নষ্ট করতে চায় সেও তো ছড়াবে না। একমাত্র উন্মাদ ব্যক্তি সেটা পারে।' বলতে বলতে পা বদল করল কণিকা। উলটোদিকের প্রতিক্রিয়া সে দেখতে পাচ্ছিল।

স্যার অমলেশ হাসার চেষ্টা করলেন। এটা একটা চালু কথা। অপচয় অর্থে বলা। তাই না?'

'আপনার মুখে অন্যের অর্থহীন বহু ব্যবহৃত কথা শুনতে ভাল লাগেনি। দ্বিতীয়ত, থিওরির সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক সব সময় মেলে না ঠিকই কিন্তু বাস্তবের অভিজ্ঞতা থেকে নতুন থিওরির জন্ম নেয়। আপনি কী বলেন?'

'হ্যাঁ। অনেক ক্ষেত্রেই হয়।'

'তৃতীয়ত,; বলেই সোজা হল কণিকা, 'আমি, আমি একটু টয়লেটে যেতে পারি?'

'অবশ্যই।' উঠে দাঁড়ালেন স্যার অমলেশ, 'এদিকে—।'

দ্রুত টয়লেটে ঢুকে পড়ল কণিকা, দারুণ সাজানো ঘর। সে ব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই হেসে ফেলল, স্যারের রক্তচাপ নিশ্চয়ই বেড়ে গেছে।

সে ফ্লাশ টিপে সিগারেট ফেলে দিল কমোডে। তারপর শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে নব ঘোরাতেই ওপর থেকে জলের ধারা ধেয়ে আসতেই নব আগের জায়গায় নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে জলের ধারায় তার জামা এবং স্কার্টের কিছুটা ভিজে গেছে, চুলেও চিকচিকে জলকণা।

দরজা খুলে সে নিচু গলায় ডাকল, 'স্যার!'

অবাক হয়েই এগিয়ে এলেন স্যার অমলেশ। তারপর ব্যস্ত হয়ে বললেন,, 'একী! তুমি যে সম্পূর্ণ ভিজে গেছ?'

'ভুল করে ভুল নবে হাত দিয়ে ফেলেছিলাম। আমি এখন কী করব!'

'তুমি, তুমি, তোয়ালেটা জড়িয়ে নাও।' স্যার অমলেশ ভেবে পাচ্ছিলেন না ওকে কী করতে বলা উচিত। তার কথা শোনামাত্র ভেতরে গিয়ে একটা দুধসাদা তোয়ালেতে নিজেকে ঢেকে কুণ্ঠিত মুখে বাইরে এসে কণিকা বলল, 'সাত মিনিট হয়ে গিয়েছে।'

'সাত মিনিট?' হকচকিয়ে গেলেন স্যার অমলেশ।

'আপনার সেক্রেটারি আমাকে সাত মিনিট সময় দিয়েছিল।' নিচু গলায় বলল কণিকা।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'তা হলে আমি যাই?'

'মানে? তুমি এভাবে যাবে কী করে? আমার ঘর থেকে তোয়ালে জড়িয়ে বের হলে লোকে ভাববে কী? কিন্তু তোমার পরার মতো কোনও পোশাক আমার কাছে নেই।'

'কী করে থাকবে? এখানে তো কোনও মহিলা নেই!'

'দ্যাটস্ রাইট।'

'তা হলে?'

'তা হলে? এক কাজ করো, আমার বেডরুমে যাও। দরজা বন্ধ করে জামাকাপড় পাখার হাওয়ায় শুকিয়ে নাও। বড় জোর আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট লাগবে।'

' কিন্তু আপনার যে দেরি হয়ে যাবে!'

'তার মানে?'

'আপনার তো দিল্লির চেম্বার্স অব কমার্সে যাওয়ার কথা!'

ঘড়ি দেখলেন স্যার অমলেশ। তারপর রিসিভার তুলে সেক্রেটারিকে বললেন জি সি সি-র চেয়ারম্যানকে জানিয়ে দিতে তিনি এখনই যেতে পারছেন না। ডিনারে দেখা করতে পারেন যদি চেয়ারম্যান ব্যস্ত না থাকেন। রিসিভার নামিয়ে তিনি মাথা নেড়ে ইশারা করলেন কণিকাকে বেডরুমে চলে যেতে।

বেডরুমের দরজা ভেজিয়ে দিল কণিকা। দিয়ে খুব হাসল। মতলবটা হঠাৎই মাথায় এসে গেল এবং চমৎকার কাজে লেগে গেল। চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারম্যানের চেয়ে এখন তার গুরুত্ব স্যার অমলেশের কাছে অনেক বেশি। কণিকার মনে হল এই লোকটা আসলে খুব ভিতু। নিজের সম্মান হারাবার ভয়েই তাকে যেতে দেয়নি।

জামা এবং স্কার্ট খুলে চেয়ারের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল সে, এখন তার পরনে শুধু দুটো অন্তর্বাস। এইভাবে আপাদমস্তক শেষ কবে দেখেছে মনে নেই। এখন নতুন করে নিজের প্রেমে পড়ল। আর একটু মজা করা যাক। সে বন্ধ দরজায় শব্দ করে নিচু গলায় ডাকল, 'স্যার, স্যার!'

'ইয়েস! এনি প্রবলেম?'

'না, আমি কি আপনার বিছানায় একটু রেস্ট নিতে পারি?'

'ওঃ, সিওর।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল কণিকা। কী আরাম, তারপর চিৎ হল। চোখ বন্ধ করে ভেড়া গুনতে শুরু করল। এক দুই তিন চার। আচ্ছা সে যদি ঘুমিয়ে পড়ে তা হলে স্যার অমলেশ কি ভদ্রতা করে বাইরেই বসে থাকবেন?

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে দরজার বাইরে শব্দ হল। স্যার অমলেশ নক্ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করল কণিকা।

'ওগুলো কি শুকিয়েছে?' বন্ধ দরজার ওপার থেকে স্যার অমলেশের গলা ভেসে এল। কোনও সাড়া না পেয়ে ভদ্রলোক আবার নক্ করলেন। এবারও কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। অস্বস্তিতে পড়লেন তিনি। মেয়েটা কি ঘুমিয়ে পড়ল? তা হলে তো খুব মুশকিল হয়ে যাবে। অন্যমনস্ক হয়ে দরজায় চাপ দিতেই সেটা সামান্য খুলে গেল। একটু অবাক হলেন, মেয়েটা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করেনি। একটু ইতস্তত করে তিনি ডাকলেন, 'কণিকা?' কোনও সাড়া এল না।

আর একটু চাপ দিতেই দরজার অনেকটাই খুলে গেল। এক পা বাড়াতেই

স্যার অমলেশের বুকের বাতাস ঘূর্ণি হল। এ কী দেখছেন তিনি? সেই ঘুমন্ত রাজকুমারী? সেই সোনার কাঠি রুপোর কাঠি? অবিকল সেইরকম! দীর্ঘাঙ্গী, সুডৌল শরীর অপূর্ণ জ্যোতিতে মাখামাখি। এই বয়সেই মেয়েটির দেহে পূর্ণতা এসে গিয়েছে।

বিছানার পাশে চলে এলেন স্যার অমলেশ। ডাকতে গিয়ে বুঝলেন তাঁর স্বর রুদ্ধ হয়ে আসছে। তবু ডাকলেন, 'কণিকা!'

'উঁ।' চোখ বন্ধ, ঠোঁট ফাঁক হল সামান্য।

'তোমার দেরি হয়ে যাবে।'

'উম্।'

'কণিকা!'

'প্লি-জ!' চোখ খোলার চেষ্টা করেও সফল হল না যেন সে।

স্যার অমলেশ আর পারলেন না। প্রায় নিঃশব্দে বিছানার একপাশে বসলেন। বসামাত্র কণিকার ঘুমন্ত বাঁ হাত তাঁর হাঁটুর ওপর নেতিয়ে পড়ল। রক্ত চলাচল বেড়ে গেল তাঁর, আঙুল দিয়ে মেয়েটার চুল স্পর্শ করলেন তিনি। করে বললেন, 'তোমার চুল এখনও ভিজে, ভাল করে মোছোনি?'

'মুছিয়ে দেয়নি—।' জড়ানো গলা।

এক হাতে পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে সযত্নে চুলে বুলিয়ে দেখলেন রুমাল তেমন ভিজল না।

এবার চোখ খুলল কণিকা, 'আমার না মাথা ধরেছিল!'

'সে কী! ওষুধ খাবে?' উঠতে চেয়ে উঠতে পারলেন না স্যার অমলেশ।

'নাঃ। আমি নেচার কিওরে বিশ্বাসী, আর একটু ঘুমালে ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঘুমাতে চাও?'

'নাঃ। হোস্টেলে ফিরে ঘুমাব।' কণিকা ওঠার চেষ্টা করতেই স্যার অমলেশের শরীরের সঙ্গে সংঘাত হল। কণিকা বলল, 'উঃ।'

'লেগে গেল?'

'হুঁ।'

'কোথায়?'

'রিব্‌সে।'

'আই অ্যাম সরি।'

'দেখুন লালচে হয়ে গিয়েছে।'

স্যার অমলেশ দেখার জন্যে মাথা নিচু করলেন।

রাত সাতটা পঁচিশে টয়লেট থেকে নিজের শুকনো পোশাক পরে বেরিয়ে এল কণিকা। স্যার অমলেশের মুগ্ধতা তখনও অটুট। 'আমি, আমি কী করে বোঝাব—!'

'বুঝেছি!'

'কী বুঝেছ?'

'আজকের সন্ধেটা অন্যরকম!'

'মহামূল্যবান। কিন্তু তুমি, তুমি কি—?' তাকালেন তিনি।

'আমি ফুলফিল্ড।' হাসল কণিকা।

স্যার অমলেশ ওকে লিফটের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। ইতস্তত করে বলেছিলেন, 'এখন আমার খুব খারাপ লাগছে।'

'কেন?'

'তোমাকে মিস করতে হবে।'

হাসল কণিকা।

'তার ওপর কাল সকালের ফ্লাইটে বাঙ্গালোর যেতে হবে। কিন্তু আসব, খুব তাড়াতাড়ি দিল্লিতে আসব। তুমি আমার কার্ডটা রাখো, যখন ইচ্ছে হবে, ইফ এনি প্রবলেম, প্লিজ কল মি!'

কার্ডটা নিয়ে কণিকা বলেছিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

যে কোনও পুরুষ মানুষ, সে গোয়াল ঘরের কর্মী এক গ্রাম্য অশিক্ষিত হোক অথবা বিশাল শিল্পপতি স্যার অমলেশই হোক, নারী শরীর খুঁড়ে আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারে একাকার। এখানে তার কোনও আলাদা চরিত্র নেই। স্যার অমলেশ অবিবাহিত কিন্তু সেদিন তাঁর আচরণে কণিকা বুঝতে পারছিল ও ব্যাপারে বেশ দক্ষতা আছে। আর দক্ষতা তো অনুশীলন ছাড়া অর্জিত হয় না। ও রকম কুৎসিত চেহারার রোগা লোকটা সিংহের মতো হরিণশিশু চিবিয়ে খাওয়ার আনন্দ পেতে চেয়েছিল। এই লোকটাকে ছাড়া যায় না। দু'মাস কোনও যোগাযোগ করেনি সে। এর মধ্যে স্যার অমলেশ দু'-দু'বার দিল্লিতে এসেছিলেন, সেক্রেটারিকে দিয়ে কণিকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু কণিকা এড়িয়ে গিয়েছে। দু'মাস পরে সে একটি সাধারণ প্যাথলজিতে গিয়ে নিজের ইউরিন পরীক্ষা করতে দিল। একটা আধবুড়ো লোক বসে ছিল। ও রকম সুন্দরী যুবতী প্রেগন্যান্সি টেস্ট করাতে এসেছে বলে লোকটা খুব পুলকিত হয়েছিল। টিউবটা নিয়ে যখন ভেতরে চলে গেল

লোকটা তখন কণিকা দ্রুত খুঁজল কোনও ব্ল্যাঙ্ক রিপোর্ট ফর্ম পাওয়া যায় কি না। সে হতাশ হল। লোকটার টেবিলে তেমন কিছু নেই।

সেদিনই বিকেলে না গিয়ে পর দিন দুপুরে রিপোর্ট আনতে গেল কণিকা, ওই সময়টায় ভিড় থাকার কথা নয়, ছিলও না। তাকে দেখে লোকটা একগাল হেসে বলল, 'মিছিমিছি ভয় পেয়েছিলে। রিপোর্টে নেগেটিভ।' খাম থেকে রিপোর্ট বের করে রাখল টেবিলে।

যেন বিশাল বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে সে এমন ভঙ্গি করল কণিকা। সে জানত রিপোর্ট নেগেটিভ হবেই। স্যার অমলেশের সঙ্গে ওই ঘটনাটা ঘটাবার পরের দিনই তার পিরিয়ড হয়েছিল। দ্বিতীয় মাসেও সেটা নিয়ম মেনে হয়। কিন্তু সে বুকে হাত দিয়ে বলল, 'এত ভয় পেয়েছিলাম। উফ্!'

'ভয়ের তো কথাই। ভগবান বাঁচিয়ে দিলেন!' লোকটি হাসল।

'এক গ্লাস জল পেতে পারি?'

লোকটি উঠে জল আনতে গেল। ব্যাগ খুলে টাকা বের করছিল কণিকা। লোকটি জলের গ্লাস টেবিলে রাখতেই কণিকা টাকা দিতে গিয়ে গ্লাসে ধাক্কা দিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসের জল উলটে পড়ল রিপোর্টের কাগজে। হায় হায় শব্দ করে লোকটা গ্লাস তুলে ধরল। অপরাধীর মতো মুখ করে কণিকা বলল, 'সরি! আমি দেখতেই পাইনি। ছি ছি কী লজ্জার কথা!'

লোকটি ততক্ষণে একটা ছেঁড়া কাপড়ে জল মুছে ফেলেছে। বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু রিপোর্টটা তো ভিজে গেল। কী হবে!'

রিপোর্টের কাগজটা তুলল কণিকা। নাম এবং ঠিকানা সে ভুল দিয়েছিল, সবকিছু ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। সে বলল, 'এতেই হয়ে যাবে। আচ্ছা একটা ব্ল্যাঙ্ক ফর্ম পাওয়া যাবে? মানে, নাম ঠিকানা আর নেগেটিভ কথাটা লিখে রাখতাম।'

লোকটি ইতস্তত করতে কণিকা মিষ্টি করে হাসল। লোকটি কিন্তু কিন্তু করেও ভেতর থেকে একটা ব্ল্যাঙ্ক ফর্ম এনে দিল। টাকা মিটিয়ে পথে নামল কণিকা। তারপর সোজা চলে এল হোস্টেলের অফিস ঘরে। ছুটি হয়ে যাওয়ায় ক্লার্ক চলে গিয়েছিল বাড়িতে। তাঁর টাইপরাইটারের সাহায্যে ফর্মটা ভর্তি করে নিতে একটুও অসুবিধে হল না। এবার পেশেন্টের নাম এবং ঠিকানা ঠিকঠাক লিখল সে। আর রিপোর্টটিতে পজিটিভ শব্দ উজ্জ্বল হল।

কণিকা অপেক্ষা করতে লাগল। সে নিশ্চিত ছিল স্যার অমলেশ এত সহজে হাল ছাড়বেন না। তাঁর সেক্রেটারির টেলিফোন আসবেই। তৃতীয় মাসের

মাঝামাঝি সেই ফোনটা এল। সুপারের অফিসে গিয়ে ফোন ধরতে হয়। ভদ্রমহিলা তাঁর টেবিলে কাজ করছেন। সে রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই শুনতে পেল, 'আমি স্যার অমলেশ চ্যাটার্জির সেক্রেটারি বলছি। উনি এম বি এ ছাত্রছাত্রীদের জন্যে একটা পরিকল্পনা নিতে চলেছেন। ওই ব্যাপারে একবার আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। স্যার চ্যাটার্জি আপনাকে আলোচনার জন্যে আজ তাজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

'কিন্তু আমি এখনই কোনও প্রোজেক্টে অংশগ্রহণ করতে পারব না। সামনেই পরীক্ষা।'

'ও। এর আগেও দু'বার আপনাকে ফোন করা হয়েছিল, পাওয়া যায়নি।'

'ঠিক আছে। কখন?'

'চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে।'

কণিকা রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে দেখল সুপার হাসছেন। বললেন, 'পরীক্ষার পরেই ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ হবে। স্যার অমলেশের কোম্পানি নতুন এম বি এ নেবে। দেখা করতে রাজি হয়ে ভাল করেছ তুমি।'

কণিকা হাসল, কিছু বলল না।

হোটেলের রিসেপশনে নিজের নাম বলতেই প্রায় ভি আই পি খাতির পেল কণিকা। স্যার অমলেশ একই স্যুটে আছেন।

দরজায় নক্ করতেই স্যার অমলেশ আত্মপ্রকাশ করলেন, মুখে কৃতার্থ হাসি, 'যাক, শেষ পর্যন্ত তোমার দেখা পেলাম। এসো।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে সোফায় বসল কণিকা। দরজা বন্ধ করে তার পাশে বসলেন স্যার, 'এর আগে দু'-দু'বার দিল্লিতে এসেও তোমার দেখা পাইনি। তুমি কি কোনও কারণে আমার ওপর বিরক্ত?'

মুখ ঘোরাল কণিকা অন্যদিকে, 'আমি একটা সামান্য মেয়ে, বিরক্ত হওয়ার ক্ষমতা কোথায়? আপনার কত নাম, কত প্রচার!'

'ওঃ। এভাবে বোলো না। তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে আমি কখনও দেখিনি,' কণিকার হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন স্যার অমলেশ। আড়চোখে চেয়ে কণিকার মনে হল কয়লার ওপর পালিশ করা সোনা রাখলে ওরকম দেখায়। সে চোখ সরিয়ে নিল। স্যার অমলেশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ তুমি এত স্টিফ কেন?'

হঠাৎই কেঁদে উঠল কণিকা। কান্নার শব্দ নিয়ন্ত্রণ হারাল। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে কান্না থামাবার চেষ্টা করল।

হকচকিয়ে গেলেন স্যার অমলেশ, 'কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?'

'আমাকে, আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।' কান্না জড়ানো গলা কণিকার।

'তার মানে?'

'আপনার সন্তান আমার শরীরে।' চিবুক নুইয়ে পড়ল হাঁটুতে।

'মাই গড!' নিজের অজান্তেই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন স্যার অমলেশ। আজ পর্যন্ত তাঁর এমন অভিজ্ঞতা হয়নি।

কয়েক সেকেন্ড পরে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে? এটা জানার জন্যে তো টেস্ট করানো দরকার।'

ব্যাগ খুলে রিপোর্টের পাতাটা এগিয়ে ধরল কণিকা, চোখ বুলিয়ে ঠোঁট কামড়ালেন স্যার অমলেশ। কাগজটাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওয়েল, যদি দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে তা হলে তা থেকে বেরিয়ে আসার পথও আছে। তুমি কোনও চিন্তা কোরো না। অ্যাবর্ট করতে সামান্য সময় লাগে, কেউ জানতেও পারবে না।'

'তার মানে?' সোজা হল কণিকা।

'দ্যাখো, তুমি এখনও স্টুডেন্ট। আনম্যারেড। তুমি নিশ্চয়ই বেবি ক্যারি করতে পার না। হোস্টেলে সেটা সম্ভব নয়। তা ছাড়া তোমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। তাই গেট রিড অব ইট।' মাথায় হাত রেখে সস্নেহে বললেন স্যার অমলেশ।

চোখের জল রুমালে মুছল কণিকা। তারপর বলল, 'সেটা এখন সম্ভব নয়।'

'কেন নয়?'

'সময়টা হিসেব করে দেখুন।'

চোখ বন্ধ করলেন স্যার অমলেশ, 'না। এখনও বারো সপ্তাহ হয়নি।'

মাথা নাড়ল কণিকা, 'আমি একজন গাইনির কাছে গিয়েছিলাম। গতকাল। তিনি পরীক্ষা করে বললেন এখন ওসব করলে আমার জীবন বিপন্ন হতে পারে। একমাত্র রাস্তা অপারেশন করা। সেটা করলে লোক জানাজানি হবেই। আমার বাবা মায়ের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। ওঁরা খুব ভাল মানুষ, আমার জন্যে ওঁরা কারও কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।' মাথা নাড়ল সে, 'না। এ জীবন রেখে লাভ নেই। আমি যদি এখন আত্মহত্যা করি তা হলে কেউ জানবে না কেন করলাম! না বিষ খাব না। তাতে জানাজানি হবে কারণ নিশ্চয়ই পোস্টমর্টেম করবে। আমাকে এমন ভাবে মরতে হবে যাতে এই শরীরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আচ্ছা, চলি।' উঠে দাঁড়াল কণিকা।

'দাঁড়াও। তুমি আত্মহত্যা করতে পারো না!' গম্ভীর গলায় বললেন স্যার অমলেশ।

'এছাড়া আমার অন্য কোনও উপায় নেই।'

'আমি খুব দুঃখিত আমার কারণে—!'

'না। আমিও দোষী।'

'বসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'বলুন, আমি শুনছি।'

'দ্যাখো, আমি তোমার থেকে বয়সে অনেক বড়। অন্তত ষোলো বছর তো বটেই। আমি ঠিক করেছিলাম বাকি জীবনটা অবিবাহিত হয়েই কাটিয়ে দেব। কিন্তু—' একটু ভাবলেন স্যার অমলেশ, 'তোমার আপত্তি আছে?'

'কী ব্যাপারে?'

কাঁধ নাচালেন স্যার অমলেশ, 'ওয়েল তোমার বাবার নাম ঠিকানা এই কাগজে লিখে দাও।' একটা ছোট প্যাড আর কলম এগিয়ে দিলেন তিনি।

সঠিক নাম ঠিকানা লিখে কণিকা বলল, 'যাচ্ছি!'

'এখনই যাবে কেন? অন্তত কফি খেয়ে যাও।'

'আমি কফি খাই না।'

'বেশ। তা হলে কথা দিচ্ছ অন্তত পনেরো দিনের মধ্যে তুমি কিছু করবে না!'

মাথা নাড়ল সম্মতিতে, তারপর ইউরিন রিপোর্টটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল কণিকা।

এত আনন্দ কখনও পায়নি কণিকা। নিজের বিছানায় ফিরে এসে ও শব্দ করে হাসল। খবরটা শোনার পর লোকটার মুখ কী বোকা বোকা দেখাচ্ছিল। স্যার উপাধিটা তখন উধাও। তবে লোকটা একটু বোকা। নইলে স্বচ্ছন্দে বলতে পারত ঘটনাটির জন্য কোনও দায় তার নেই। অন্য কোথাও কিছু করে এসে তাকে বিপদে ফেলতে চাইছে কণিকা। পুলিশকেও খবর দিতে পারত। তারপরেই মনে হল সেটা করত না। ডি এন এ টেস্টেই তো ধরা পড়ে যায় সব। সেই ভয়টাও পেত।

লোকটা তাকে বিয়ে করতে চায়? ভাগ, ওইরকম চেহারার মানুষটাকে স্বামী হিসেবে সে কল্পনাই করতে পারে না। কী স্পর্ধা? অঢেল টাকা, বিরাট ব্যবসা

আর একটা স্যার টাইটেলের জন্যে লোকটা যদি ভাবে যা ইচ্ছে তাই করবে তা হলে এবার ওর আশা ভঙ্গ হবে। নিশ্চয়ই বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। বাবার কী প্রতিক্রিয়া হবে? বিশাল ধনী, স্যার, এ রকম পাত্রের সঙ্গে বাবা কি এখনই তার বিয়ে দিতে রাজি হবে। মা হলেও হতে পারে। পাত্রের বয়স এবং চেহারার জন্যে বাবা অবশ্যই পিছিয়ে যাবে। মা যদি না যায়?

দিন সাতেক বাদে মা এবং বাবা দিল্লিতে চলে এলেন। ওঁরা ওঠেন হোটেল জনপথ। এসেই ফোন করেছিলেন। ফোন পেয়ে কণিকা দৌড়াল।

ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা এখন এখানে? কী ব্যাপার?'

মা বললেন, 'এখানে আয়। বস।'

বাবা বললেন, 'তোমার পরীক্ষার আর কত দেরি?'

'তিন মাস।'

'তুমি তো এম বি এ পড়ছ। চ্যাটার্জি কোম্পানি নামের ফার্মের কথা শুনেছ। খুব বড় ফার্ম।'

'শুনেছি।'

'সেই ফার্মের মালিক হলেন স্যার অমলেশ চ্যাটার্জি। একার চেষ্টায় ভারতব্যাপী বিশাল ব্যবসা, রানির কাছ থেকে স্যার উপাধি পেয়েছেন।'

'তো?'

এবার মা বললেন, 'ভদ্রলোক তোকে দিল্লিতে দেখেছেন। দেখে খুব পছন্দ হয়েছে। বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে সেক্রেটারিকে পাঠিয়েছিলেন।'

'সেক্রেটারিকে?'

'হ্যাঁ। ওর তো কোনও নিকট আত্মীয় নেই। কখনও বিয়ে করবেন না বলে ঠিক করেছিলেন। অত্যন্ত আদর্শবান মানুষ।'

'আদর্শবান?'

'হ্যাঁ।' মা মাথা নাড়লেন।

বাবা বললেন, 'তুমি এখন বড় হয়েছ। তোমার মতও জানতে এসেছি।'

'অসম্ভব।' মাথা নাড়ল কণিকা।

'অসম্ভব কেন?' মা তাকালেন।

'লোকটার চেহারা দেখেছ? আবলুশ কাঠের মতো কালো, রোগা, বেঁটে, তা ছাড়া আমার চেয়ে অনেক বড়।'

'তুই দেখেছিস?'

'একবার আমাদের কলেজে ভিজিটিং লেকচারার হয়ে এসেছিল।'

বাবা বললেন, 'এরপর আর কোনও কথা নেই।'

মা মাথা নাড়লেন, 'না আছে। স্যার অমলেশের চেহারাটা দেখছিস, গুণ কিছু চোখে পড়ছে না তোর? এত বড় ব্যবসা, স্যার উপাধি, এমনি হল?"

বাবা মন্তব্য করলেন, 'প্রথমে তো মানুষ দ্যাখে, তারপরে গুণের কথা আসে।'

'কী দেখবে?' মা রেগে গেলেন, 'শরীর? আটাশ বছরে যে সুন্দর আটত্রিশে সে তো সৌন্দর্য হারাতেই পারে! চেহারার আয়ু আর কতটুকু! কিন্তু গুণ? সারাজীবন থাকে।'

মাথা নিচু করল কণিকা।

বাবা বললেন, 'ওর ওপর কিছু চাপিয়ে দিও না। ভাবুক। ভেবে ঠিক করুক।'

হোস্টেলে ফিরে এসে নিজের ওপরই খেপে গেল কণিকা। স্রেফ মজা করতে গিয়ে কী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল সে। স্যার উপাধিধারী একটি মানুষ, প্রিন্সিপ্যাল যাঁকে খাতির করেছেন, বক্তৃতার শেষে উলটোপালটা বলে পার পেয়ে যাবে এটা সে যেমন নিতে পারেনি। পারেনি বলেই সে মজা করতে গিয়েছিল ওখানে। প্রচুর বয়সে বড় লোকটাকে সুড়সুড়ি দিলে কী প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখতে চেয়েছিল। তার এ যাবৎকালের জীবনে একবারই যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেই গোয়াল ঘরের গ্রাম্য তরুণের সঙ্গে। ব্যাপারটা কী তা তখন সে ভাল করে বুঝতেই পারেনি। স্যার অমলেশ যখন অগ্রসর হলেন তখন মনে হয়েছিল, যাক, একজন স্যারকেও সে মাথা নোয়াতে বাধ্য করতে পারল। এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু বিয়ে? কখনও মাথায় অমন ভাবনা আসেনি।

কিন্তু লোকটা বোধহয় ভাল। কলকাতায় ফিরে গিয়ে বীরভূমে লোক পাঠিয়ে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। নাও করলে পারত। রিপোর্ট দেখে অস্বীকার করেনি লোকটা। সন্দেহ করে খোঁজ নেয়নি প্যাথলজিতে।

চ্যাটার্জি কোম্পানির বিশাল ব্যবসা সাম্রাজ্য নিয়ে কখনও সে চিন্তিত ছিল না। আজ মনে হল, একসঙ্গে ব্যবসা এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাবার যে সুযোগ আসছে তা হাতছাড়া না করে স্যার অমলেশের বক্তব্যকে ভুল প্রমাণ করে দেওয়া দরকার। পরের দিন হোটেলে গিয়ে সে মাকে তার সম্মতি জানিয়ে দিল।

পাহাড়ি পথে মাইল খানেক হেঁটে কাবেরীর মনে হল, অনেক হয়েছে, এবার ফেরা যাক। তাঁকে দাঁড়াতে দেখে মন্তামামা দাঁড়ালেন। এত পরিশ্রমের পরেও বৃদ্ধকে একটুও কাহিল দেখাচ্ছিল না। পেছনে পাহাড়, সামনের বাঁ থেকে ডাইনে খোলা আকাশ, অনেক নীচে জঙ্গলের আড়ালে নদী। এতক্ষণে কুয়াশারা নড়াচড়া শুরু করেছে। কাবেরী বললেন, 'সুন্দর।'

মন্তামামা বললেন, 'ওয়েল ম্যাডাম, আজ তোমার জন্মদিন। আজকের সন্ধে একটু অন্যরকম কাটালে কী রকম হয়?'

কাবেরী তাকালেন।

'একটা ট্যাক্সি নিয়ে কালিম্পং-এ চলে যাই। নতুন একটা চিনে রেস্তোরাঁ খুলেছে, সেখানে ডিনার করি। কী বলো?' মন্তমামা হাসলেন।

'থ্যাঙ্ক ইউ! তুমি যে প্রস্তাবটা দিলে সেটাই আমার কাছে অনেক।'

'অর্থাৎ প্রস্তাব গৃহীত হল না?'

'লাঞ্চে যাওয়া যেতেই পারে।'

'আজ আর লাঞ্চের সুযোগ কোথায়!'

'তুমি তো জানো আমি সন্ধে ছ'টার পর একা থাকা পছন্দ করি।'

'জানি। কিন্তু জানি না, কেন?'

'কাজের লোকদুটো এমন কী তোমার বোনও জানেন আমি ওই সময়ে মদ খাই। খেতে খেতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ি।'

'কিন্তু কেন? ওই সময়ে রোজ দরজা বন্ধ করে মদ খেতে হবে কেন?' মন্তামামা প্রশ্নটা করতেই খুব জোরে হেসে উঠলেন কাবেরী। সেই শব্দে একঝাঁক টিয়া ঘাবড়ে গিয়ে ডানা মেলল আকাশে। হাসি থামিয়ে সেই ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে কাবেরী বললেন, 'সুন্দর।'

'মাঝে মাঝে তোকে বুঝতে পারি না।' মন্তামামা বললেন।

'আমিই কি পারি!'

ওঁরা ধীরে ধীরে নেমে আসছিলেন।

বাড়ির সামনে এসে কাবেরী দেখলেন একটি লোক মোটরবাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবদুল তাঁকে দেখে ছুটে এল, 'চিঠি।'

মাথা নাড়লেন কাবেরী। লোকটি একটি খাতা এগিয়ে দিলে নিজের নামের পাশে সই করলেন। লোকটি মুখবন্ধ খামটি ওঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাইক চালিয়ে ফিরে গেল। খামটি দেখলেন কাবেরী, হাতে লেখা ঠিকানা, লেখার ধরন অচেনা।

চিঠিটা বের করলেন। কাগজটি নিতান্তই খোলা। 'আমি জানি আমার কাছ থেকে তুমি কোনও কিছুই আশা করো না, এই চিঠিও করবে না। তবু পাঠালাম। হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।' নীচে নাম অথবা ঠিকানার কোনওটাই লেখেনি তৃণা।

মন্তামামা লক্ষ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, 'কোনও খারাপ খবর?'

'কাগজে ফোরকাস্ট ছিল আজ যাদের জন্মদিন তাদের দিনটা চমৎকার কাটবে। এটাকেও আমি ভাল খবর বলতে পারি, পারি না?' চিঠিটা এগিয়ে ধরলেন কাবেরী।

দ্রুত ওঁর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে চোখ বোলালেন বৃদ্ধ, 'হু ইজ হি?'

'হি নয় শি। আমার পেটে জন্মেছিল। তৃণা। এখন উনিশ বছর বয়স।'

'আশ্চর্য! নাম লেখেনি কেন?'

'চিঠিটাও নিজের হাতে লেখেনি।'

'মাই গড! কেন?'

'জানি না। কেউ হয়তো ওর হয়ে লিখেছে। যেই লিখুক, জন্মদিনে হ্যাপি বার্থ ডে শুনলে আমার তো খুশি হওয়াই উচিত।'

বাগানে ঢুকে বেতের চেয়ারে বসলেন কাবেরী। তাঁকে দেখে মন্তামামাও বসলেন।

একটু অপেক্ষা করে মন্তামামা বললেন, 'তুমি বুঝতেই পারছ অনেক কিছু না জানায় আমি এক ধরনের অস্বস্তিতে আছি। তোমার মা তো সবসময় সামনে একটা বুলেট প্রুফ কাচ রেখে চলেন। ওয়েল, আজ তোমার জন্মদিন। হয়তো ব্যাপারগুলো বলতে তোমার খারাপ লাগবে। তাই আজই কোনও প্রশ্ন করব না।'

কাবেরী সোজা হয়ে বসে ডাকলেন, 'আবদুল!'

আবদুল এগিয়ে এল।

'কফি!'

আবদুল ফিরে গেল।

'আমি এখন পর্যন্ত আমার কোনও কাজের জন্যে অনুশোচনা করিনি। কারণ আমি মনে করি আমার জীবন নিয়ে যা যা ঘটেছে তাতে আমার কোনও ভূমিকা ছিল না। এই যে আমার গায়ের রং, এটা তো আমি তৈরি করিনি। লেডি কণিকা চ্যাটার্জির মেয়ের গায়ের রং এত কালো কেন হবে তা নিয়ে গবেষণা হয়নি, লোকে ধরেই নিয়েছিল মেয়ে বাবার রং পেয়েছে। এই রঙের কারণেই লেডি চ্যাটার্জি আমাকে যেমন সহ্য করতে পারেননি তেমনই তাঁর সম্পর্কে

আমার মনে বিরাগ তৈরি করতে সাহায্য করেছেন। আমার এতে করণীয় কিছু নেই। বান্ধবীদের বলতে শুনতাম, 'তোর খুব সুবিধে। ছেলেরা তোকে টিজ করে না।' অর্থাৎ আমার গায়ের রং নাকি বাজে ছেলেদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করছে। ভাবলাম চলে যাই এ দেশ থেকে। আফ্রিকায় গেলে বেশি ভাল লাগত। কিন্তু সেখানে যাব কোন অছিলায়?

দেখলাম আমেরিকায় কালো মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, অতএব পরীক্ষা দিয়ে ওখানকার কলেজে ভর্তির সুযোগ তৈরি করে নিলাম। কিন্তু যেতে প্রচুর টাকা লাগে। তোমার বোনকে ফোন করে ব্যাপারটা বলতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন।'

'ফোন করে কেন? কোথায় ছিলে তুমি তখন? প্রশ্ন করলেন মন্তামামা।

'কলকাতায়। একই বাড়িতে। লর্ড চ্যাটার্জির বাড়িকে সাধারণ লোক প্রাসাদ বলে। এক প্রান্তে থাকলে অন্য প্রান্তের কথা শোনা যায় না।' হাসলেন কাবেরী, 'লেডি চ্যাটার্জির সেক্রেটারিদের একজন, মিস্টার কাপুর, সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। যেদিন আমার ফ্লাইট সেদিন খবর এল লেডি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। উনি বসেছিলেন ওঁর অফিস ঘরে। লম্বা কাচের টেবিলের ওপাশে শ্বেত পাথরের স্ট্যাচুর মতো। বাইরে থেকে নক্ করতেই শুনলাম, 'কাম ইন।'

ঢুকলাম। আমাকে দেখেই চোখ ছোট হয়ে গেল ওঁর।

বললাম, 'ডেকেছেন?'

'মাই গড! কত লম্বা হয়ে গেছ তুমি?' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে আমাকে দেখলেন, 'ওয়েল ব্ল্যাক লেডি, তুমি আমেরিকায় যাচ্ছ?'

আমি কথা বললাম না। ব্ল্যাক লেডি শুনতে একটুও ভাল লাগেনি।

'কাপুর বলল তুমি বিজ্ঞান পড়বে না। কেন?'

'আমার পছন্দ নয়।'

'হুম্। কিন্তু গ্রাজুয়েশনের পর তোমাকে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পড়তে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে মন বিদ্রোহ করল। আমি কী পড়ব সেটা উনি ঠিক করে দেবেন কেন? প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেলাম। যদি উনি মত পালটে ফেলেন, যদি আমাকে যেতে না দেন।

'আমি চাই তুমি ফিরে এসে এই ব্যবসার দায়িত্ব নেবে। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

'আমার যদি ভাল না লাগে?'

হতভম্বের মতো তাকালেন তিনি। তারপর ধীর গলায় বললেন, 'ভাল

লাগাতে হবে।'

আমি আর কথা বললাম না। শেষ কবে ওঁকে দেখেছি মনে করতে চেষ্টা করছিলাম।

লেডি চ্যাটার্জি বললেন, 'কাপুর তোমার সঙ্গে যাচ্ছে। বোস্টনের কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে ফিরবে। তোমাকে একটা ফোন কার্ড দেওয়া হবে। প্রত্যেক রবিবার সকালে তুমি কাপুরকে রিপোর্ট দেবে।'

'মিস্টার কাপুরকে?'

'হ্যাঁ।'

'কী রিপোর্ট?'

'তোমার প্রগ্রেস রিপোর্ট, তোমার কোনও সমস্যা হলে জানাবে। গুড লাক।'

হাসলেন কাবেরী। হ্যাঁ ভাগ্য ভালই ছিল। বোস্টনে গিয়ে ভর্তি হতে কোনও সমস্যাই হল না। একটি স্প্যানিশ মেয়ের সঙ্গে রুম শেয়ার করে থাকার ব্যবস্থা করে কাপুর ফিরে গেলেন ভারতে। যাওয়ার আগে হরপ্রীতের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।'

'হরপ্রীত?'

'কাপুরের পরিচিত একজনের ছেলে। ওর বয়স তখন বছর তেইশ। ব্যবসা করে। প্রত্যেক শনিবারে হরপ্রীত আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আমাকে নিয়ে বাইরে বেরুত, লাঞ্চ করত। ইন ফ্যাক্ট, আমার জীবনে প্রথম পুরুষ হরপ্রীত যে আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশেছিল। আমার গায়ের রং নিয়ে মাথা ঘামায়নি, কাপুর আমাকে যে ডলার পাঠাত তাতে খরচ মিটিয়েও অনেকটাই হাতে থাকত। ফলে আমি কখনও হরপ্রীতকে খরচ করতে দিতাম না। প্রথম দিকের সাপ্তাহিক ফোনে আমি কাপুরকে হরপ্রীতের কথা বলতাম। তৃতীয় বারে কাপুর বলেছিল, 'তুমি কেন রোজ খরচ করবে? ওকেও খরচ করতে দাও।' শোনার পর আর বলিনি। আমার কাছে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমি খরচ করব।'

মন্তামামা হাসলেন, 'বাই এনি চান্স এই হরপ্রীত কি—?'

'হ্যাঁ। আমরা প্রেমে পড়েছিলাম। গ্রাজুয়েশনের পর আর পড়াশুনা না করে চাকরি নিয়েছিলাম। সেটা জেনে খেপে গিয়েছিলেন লেডি চ্যাটার্জি। আমি কেয়ার করিনি।'

'কেন? বলতে গেলে তুমিই তো ওঁর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। বিশাল

সাম্রাজ্য তোমার জন্য তৈরি করছেন তোমার মা।' মন্তামামা বললেন।

'আমি কখনও ব্যাপারটাকে আমল দিইনি। নিজেকে নেগলেকটেড ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত নিস্পৃহতা এসে গিয়েছিল মনে। তরুণ বয়সে আবেগের চেয়ে দামি আর কিছু হয় না। ইংলন্ডের যুবরাজ যদি সেই আবেগের জন্যে সিংহাসনের অধিকার সহজে ত্যাগ করতে পারেন তা হলে আমি পারব না কেন?' হাসলেন কাবেরী।

'তারপর তোমরা বিয়ে করলে!'

'হ্যাঁ। বছর দুয়েকের মাথায় ছেলে হল। ফুটফুটে সুন্দর। চাকরি ছাড়লাম। হরপ্রীতের তখন ভাল রোজগার। কিন্তু ছেলের বছর খানেক বয়স হতেই বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগল না। নতুন জায়গায় চাকরি নিলাম। ছেলে থাকত ক্রেশে। ছেলের খবর কাপুরকে জানিয়েছিলাম। কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি। লেডি চ্যাটার্জি একদম নীরব। এরপরে মেয়েটা হল। আমার চাকরি ছাড়লাম। ছেলে স্কুলে যাচ্ছে। মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত আমি। এইসময় ফোন গেল কলকাতা থেকে।'

'খবর পেলাম তোমার ছেলে নাকি আমার মতো দেখতে হয়েছে।'

'লোকে বলে ও বাবার চেহারা পেয়েছে।' জবাব দিলাম। এত দিনের যোগাযোগ না করার প্রসঙ্গই তুললেন না তিনি।

'ওয়েল, ছেলেকে মানুষ করা দরকার। আমার এবং তোমার বাবার রক্ত ওর শরীরে আছে। সামনের সপ্তাহে কাপুর যাবে, ওর সঙ্গে ছেলেকে পাঠিয়ে দেবে।'

'মানে?'

'সহজ কথা। আমি ওকে ভারতের বেস্ট এডুকেশন দেব। আমার পরে ও এই বিজনেস দেখবে। তোমার দ্বিতীয় সন্তান হওয়ায় আমি এটা বলতে পারছি।'

'অসম্ভব। ওকে দেওয়া যাবে না।'

'কেন?'

'ও আমার একার সন্তান নয়, ওর বাবারও। হরপ্রীত দেবে না।'

লাইন কেটে দিলেন লেডি চ্যাটার্জি। হরপ্রীত বাড়িতে ফিরতেই মায়ের প্রস্তাব ওকে জানালাম। অবাক হয়ে শুনলাম হরপ্রীত বলছে, 'যাক না। যদি ভাল থাকে, যদি ভবিষ্যতে অত কোটি টাকার মালিক হয় তা হলে আপত্তি করছ কেন?'

'কী বলছ তুমি? নিজের ছেলেকে টাকার জন্যে হাতছাড়া করবে?'

'টাকা? আমি টাকা পাচ্ছি কী করে?'

'এখন পাবে না। লেডি চ্যাটার্জি মারা গেলে পাবে। সেই আশায়?'

হরপ্রীত হাসল, 'আমি কোনও কথা দিইনি। তবে উনি লোনলি লেডি। ওঁর কথাও তো চিন্তা করতে হবে?'

আমি যেন অন্ধকার দেখলাম। বুঝলাম হরপ্রীতের সঙ্গে মায়ের টেলিফোনে কথা হয়েছে। অথচ খবরটা আমাকেও জানায়নি। আমি বিদ্রোহ করলাম। বললাম, ছেলেকে আমরাই মানুষ করব। তারপর যদি উনি ব্যবসার কাজে ওকে ডাকেন তা হলে ওর ইচ্ছে হলে ও ভারতে যাবে। আমি তখন আপত্তি করব না।

"অদ্ভুত ব্যাপার। আমার সঙ্গে প্রেম এবং বিয়ে করার সময়েই হরপ্রীত জানত আমাদের ব্যবসার কথা, মায়ের কথা। ভারতে যে কোটি কোটি টাকার ওপরে বসে মা রাজত্ব করছেন তা জেনেও সে কখনও ও-ব্যাপারে মুখ খোলেনি। কখনও বলেনি মায়ের কাছে টাকা চাইতে। ওর এই মানসিকতা আমাকে গর্বিত করত। প্রথম সন্তান হওয়ার পরেও ওর পরিবর্তন হয়নি। মেয়ে হওয়ার পর একটু চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত মায়ের ফোন পেয়ে ও যেন রক্তের ঘ্রাণ পাওয়া বাঘ হয়ে গেল। রোজ রোজ অশান্তি, ঝগড়া হলেই বলত, মেয়ে তোমার, ছেলে আমার।"

শেষ পর্যন্ত খেপে গিয়ে মাকে ফোন করলাম, 'তুমি আমার সংসারে আগুন ধরালে কেন?'

'বাজে কথা বলছ কেন? এত সাহস কী করে হয় তোমার?' লেডি চ্যাটার্জির গলা।

'তুমি হরপ্রীতকে খেপিয়ে দিয়েছ ছেলেকে ভারতে পাঠাতে। দাওনি?'

'দুর্বল মস্তিষ্কের মানুষকেই খ্যাপানো যায়। আমার একজন উত্তরাধিকারী দরকার। তোমার ছেলের শরীরে আমার রক্ত আছে। তাই তাকে চেয়েছি। তোমার আপত্তি থাকলে ওকে আমার প্রয়োজন নেই।' লাইন কেটে দিলেন লেডি চ্যাটার্জি।

স্বস্তি পেয়েছিলাম কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। অর্থের লোভ হরপ্রীতকে নিশ্চয়ই সহজে ছেড়ে যাবে না। আমাদের বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

একদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরছি। টিউবে আসা যাওয়া করতাম।

তাতে সময় কম লাগত। আমার পাশে একজন সাদা আমেরিকান মহিলা বসেছিলেন। বছর চল্লিশেক বয়স এবং তার পোশাক থেকে অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ বের হচ্ছিল। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল পারফিউমটার নাম জানতে। হঠাৎ ভদ্রমহিলা বললেন। 'গন্ধটা ভাল লেগেছে?'

খুব অবাক হলাম, মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ।'

'এটা দোকানে কিনতে পাবেন না। বিশেষ ভাবে তৈরি। কিন্তু আপনি এত চিন্তিত কেন? এতে প্রেসার বেড়ে যাবে, সুগারও। তাই না?'

আমি আরও অবাক হলাম। ভদ্রমহিলা আর কথা বলছেন না। আমার মনে হচ্ছিল উনি আমার সব কিছু জানেন। এই যে আমি ভাবছি তাও যেন জেনে যাচ্ছেন। আমার স্টেশন আসবার আগে উনি বললেন, 'আমি সাধারণত কাউকে দিই না। কিন্তু আপনি কার্ডটা রাখুন। যদি পারফিউমটার জন্যে আগ্রহ পরেও থাকে তা হলে ফোনে কথা বলবেন।' ব্যাগ খুলে একটা কার্ড দিলেন। আমি ধন্যবাদ দিয়ে নেমে এলাম।

বারংবার মনে হচ্ছিল মহিলার মধ্যে একটা কিছু আছে যা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে, গন্ধটা বা চিন্তার ব্যাপারটা ঢিল ছুড়ে বলা যায়। কিন্তু বলার ভঙ্গিতে এবং কথা বলার পর থেমে থাকার সময়ে যে ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছিল সেটা সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় না।

বাড়িতে এসে ড্রয়ারে কার্ডটা রাখতে গিয়ে ভাল করে দেখলাম। ভদ্রমহিলার নাম ন্যান্সি মন্টগোমেরি। থাকেন আমাদের বাড়ি থেকে পনেরো মিনিট দূরত্বে। কার্ডের বাঁ দিকের কোণে একটা লাল রঙের ত্রিশূল ছাপা কিন্তু ত্রিশূল তো এদেশের কোনও প্রতীক নয়।

পরের দিন ছিল শনিবার। ছুটির দিন। হরপ্রীত বাড়িতে নেই। লাঞ্চের আগে কৌতূহলী হয়েই ফোন করলাম। ওপাশে একটি খসখসে গলা বলল, 'ইয়েস?'

'ন্যান্সি?'

'ইয়েস!'

'দিস ইজ কাবেরী। আই মেট ইউ।'

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ন্যান্সি চেঁচিয়ে বলল, 'ওঃ তুমি? আমি জানতাম তোমার ফোন পাব। মানুষ চিনতে আমি ভুল করি না। বলো, কেমন আছ? এখনও চিন্তাগুলো তোমাকে ছাড়েনি?'

আমি হেসে বললাম, 'তুমি এমন ভাবে কথা বলছ যে মনে হচ্ছে আমাকে অনেক দিন ধরে চেনো!'

'হয়। কোনও কোনও মানুষকে দেখলেই মনে হয় বহু দিনের চেনা। মুহূর্তে ভাব হয়ে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা হয় না। পঞ্চাশ হাজারে হয়তো একজন। খুব ভাল লাগছে তোমার ফোন পেয়ে।' ন্যান্সি বলল।

'ওই পারফিউমটার ব্যাপারে কথা বলছিলাম।' বললাম।

'ওঃ তাই!'

'তুমি অবশ্য বলেছ দোকানে পাওয়া যায় না। বিশেষ ভাবে তৈরি। যারা তৈরি করে তারা কি বিক্রি করে না?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'না। এই পারফিউম বিক্রির জন্যে নয়।'

'ও।'

'আসলে আমাদের সমিতির সদস্যরাই এই পারফিউম ব্যবহার করতে পারে।'

'ও। তা হলে তো, তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে খারাপ লাগছে।'

'আমি কিন্তু একটুও বিরক্ত হইনি। বরং তোমার ফোন পেলে ভাল লাগবে।'

সেদিন কথা বলার পর ভেবেছিলাম টিউবে আবার ন্যান্সির সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু হল না। ও যে নিয়মিত চাকরি করে না সেটা অনুমান করলাম। পরের শনিবারে আবার ইচ্ছে করল ওর সঙ্গে কথা বলতে।

'হ্যালো ন্যান্সি।'

'যাক, তুমি ফোন করলে।'

'কেন?'

'অমি তোমার ফোন আশা করছিলাম, তাই।'

খুশি হলাম। বললাম, 'ভেবেছিলাম টিউবে তোমার দেখা পাব।'

'টিউবে? ওঃ না। সেদিন আমি হঠাৎই টিউবে উঠেছিলাম।'

'দ্যাখো আমরা কিন্তু কেউ কাউকে ভাল জানি না।'

'তাই। আমি ন্যান্সি মন্টগোমেরি। সিঙ্গল। কয়েকটা কোম্পানি থেকে যা ডিভিডেন্ড পাই তাতে দিব্যি চলে যায়। ব্যাস!'

'আমি কাবেরী। বিবাহিত। দুটো বাচ্চার মা। আমি বাঙালি, আমার স্বামী পাঞ্জাবি। চাকরি করি, স্বামীও ব্যবসা করে। অতএব সংসার ভাল চলছে।'

'স্ট্রেঞ্জ। তোমার দুটো বাচ্চা আছে তা দেখে বোঝা যায় না।'

কথাটা আমার খুব ভাল লাগল। আমি কালো, আমার ফিগার যত ভাল হোক এরকম প্রশংসা কখনও কেউ করেনি।

ন্যান্সি বলল, 'ছুটির দিনে তুমি কি খুব ব্যস্ত থাকো?'

‘খুব নয়। কেন?’

‘কাল কি আমরা ল্যাঞ্চে দেখা করতে পারি?’

‘নিশ্চয়ই। কোথায় যেতে চাও?’

‘কোথাও না। আমার বাড়িতে। ঠিকানাটা তো তোমার কাছে আছে।’

‘আছে। কাল যাওয়ার আগে ডিরেকশনটা জেনে নেব।’

‘সো নাইস অব ইউ!’ ন্যান্সি ফোন রেখে দিল।

আমার দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে ছোটটা ছিল খুব শান্ত। একটুও জ্বালাত না। বড়টা সব সময় সমস্যা তৈরি করত। ছুটির দিনে বাড়িতে ওকে নিয়ে নাজেহাল হতাম। তখন মনে পড়ত, ওই বয়সে মা আমার ধারে কাছেও আসত না।

রবিবার হরপ্রীতকে বললাম, ‘আজ দুপুরে আমি বেরুব। ফিরতে বিকেল হবে।’

‘কিন্তু আমারও তো কাজ আছে।’ হরপ্রীত বলল।

‘কোনও ছুটির দিনে আমি বাচ্চাদের ছেড়ে যাই না, কিন্তু আজ যেতে হবে।’ বললাম।

‘কোথায় যাবে?’

‘এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।’ বলা মাত্র হরপ্রীত মুখ ঘুরিয়ে নিল। বোধহয় মেনে নিতে পারছিল না। ব্যাপারটা আমাকে আনন্দ দিল।

ন্যান্সিকে ফোন করে রাস্তাটা বুঝে নিলাম। ন্যান্সি থাকে পাঁচতলার ফ্ল্যাটে। একতলার দরজায় ঢুকে ইন্টারকমে কথা বললে নিজের ঘরে বসে রিমোটে লিফটের দরজা খুলে দিল ন্যান্সি। যে কেউ হুটহাট ঢুকতে পারবে না এই বাড়িতে।”

একনাগাড়ে কথা বলতে বলতে সময় ভুলে গিয়েছিলেন কাবেরী। এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন, ‘মাই গড। ছ’টা বাজতে চলল যে!’

মন্তামামা মাথা নাড়লেন।

কাবেরী উঠে দাঁড়ালেন, ‘আজ এটুকুই। বাকিটা যদি কখনও মুড আসে তো বলব।’

কাবেরী চলে গেলেন।

‘গুড নাইট।’ নিচু গলায় বললেন মন্তামামা। পশ্চিমের আকাশে তখন শেষ আলোর খেলা যা গিলে ফেলল রাক্ষুসে মেঘেরা। অদ্ভুত বিষণ্ণ ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীতে। ঝুপ করে নামবে অন্ধকার। ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে এলেন মন্তামামা।

আয়নার সামনে দাঁড়ালেন আলো জ্বেলে। সারাটা জীবন প্রবাসে কেটেছে, কোনও শেকড় নেই। লেডি কণিকা চ্যাটার্জি যে তাঁরই সম্পর্কিত বোন তাও জানতেন না। এই মহিলা একাই তাঁর ব্যবসা সাম্রাজ্য চালাচ্ছেন দক্ষ হাতে। রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত কেউ তাঁর সঙ্গে নেই, পেছনেও না। একমাত্র নাতি রয়ে গেছে আমেরিকায়। মেয়ে এখানে এখন স্বেচ্ছা নির্বাসনে। আর এক নাতনি—? তার কথা জানা হয়নি। যদিও তিনি মধ্য সত্তরে কিন্তু যে কোনও প্রৌঢ়ের চেয়ে কম সক্ষম নন। লেডি কণিকা চ্যাটার্জি কিন্তু একবারও তাঁকে প্রস্তাব দেননি ওঁকে সাহায্য করতে। কী করবেন ভদ্রমহিলা এত টাকা? আজ মন্তামামার মনে হল, বোন প্রস্তাব না দিক, দাদা হিসেবে তিনি তো ওঁকে বলতে পারেন সাহায্য করতে চাই।

একটু ইতস্তত করলেন মন্তামামা। তারপর টেলিফোনের বোতাম টিপলেন। রিং হচ্ছে। তারপর একটি নারী কণ্ঠ কানে এল, 'হ্যালো। কাকে চান?'

'কণিকাকে দাও। আমি মন্তামামা।'

'স্যার। উনি এখন অফিসে।'

অফিসের নাম্বারে ফোন করলেন। এটা সরাসরি লেডির টেবিলে। লেডি কণিকা চ্যাটার্জি বললেন, 'এনি প্রব্লেম মন্তাদা?'

'না, আমি—।'

'মন্তাদা, আমি চাই না কোনও ব্যক্তিগত কথা বলার জন্যে কেউ এই নাম্বারে আমাকে ফোন করুক। তুমি আমাকে রাত দশটার পর বাড়িতে ফোন করতে পারো।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন মন্তামামা। দীর্ঘ দিন সেনাবাহিনীতে কাজ করা মানুষটি মাথা নাড়লেন। এত শক্ত মানুষ তিনি খুব কম দেখেছেন। আজ মনে হল লেডি কণিকা চ্যাটার্জির সঙ্গে মিসেস ইন্দিরা গাঁধীর অনেকটাই মিল আছে।

দোতলার এই ঘরটির সঙ্গে লাগোয়া টয়লেট ছাড়া আর কোনও জায়গা নেই যেখানে রান্না করা যেতে পারে। বাড়ির বাইরের পাড়াটায় বাঙালি পরিবারের সংখ্যা হাতে গোনা। সেখানে হিন্দি শব্দের আধিক্য, ঝগড়া থেকে গান, সবই হিন্দিতে। মধ্য কলকাতার এই এলাকাটিকে বিত্তহীন এলাকা বলাই বোধহয় সঙ্গত। পুলিশের খাতায় কলকাতায় যে কয়েকটি এলাকাকে অপরাধপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এটি তাদের মধ্যে রয়েছে।

ঘরে কোনও আসবাব নেই। শতরঞ্চির ওপর গোটা চারেক বালিশ। দেওয়ালের পেরেকে জামাপ্যান্ট ঝুলছে। এক কোণে দুটো ব্যাগ। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে তৃণা সিগারেটের তামাক বের করছিল টুথপিক দিয়ে। একমনে। তার পরনে একটা গেঞ্জি শার্ট আর বারমুডা। দুই পায়ের মসৃণ সোনালি চামড়ার মাঝে মাঝে লালচে দাগ মশারা রেখে গেছে। ওর চুলে একেবারে ছেলেদের ছাঁট।

দরজা ঠেলে যে ছেলেটি ঘরে ঢুকল তার বয়স বড় জোর বাইশ। বারমুডা আর রঙিন গেঞ্জিতে ছেলেটিকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। হাতের প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ তৃণার সামনে রেখে ছেলেটি বসতে বসতে বলল, 'আটাশ টাকা—।'

তামাকগুলো হাতের চেটোয় নিয়ে তৃণা জিজ্ঞাসা করল, 'মানে?'

'এখন আমাদের সম্বল মাত্র আটাশ টাকা।'

'ফ্যান্টাস্টিক। সিগারেট এনেছিস?'

'ছটা। রেশন করে খেতে হবে। আজকের লাঞ্চের মেনু কী জানিস?'

তৃণা তামাকের সঙ্গে আর একটা পাতা মেশাচ্ছিল। মেশাতে মেশাতে তাকাল।

'রুটি, আলুর দম, বোঁদে। ফুটের একটা দোকানে দারুণ সস্তায় রুটি আলুর দম পেয়ে গেলাম। আয় খেয়ে নিই।'

'তোর খিদে পেলে খা। আমি পরে খাব।' সিগারেটে আবার মিশেল তামাক পুরছিল তৃণা। তারপর দেশলাই জ্বেলে ওটাকে ধরাল। বড় বড় দুটো টান দিয়ে সে সিগারেটটা এগিয়ে দিল, 'নে।'

সিগারেট নিয়ে মৃদু টান দিল ছেলেটি। তারপর বলল, 'কোনও দরকার ছিল না, এই সেদিন সত্তর টাকা ফালতু খরচ করলি।'

'ওটা তুই বুঝবি না দীপ।'

'তুই যদি মাকে ভালবাসতিস, ভদ্রমহিলার যদি তোর ওপর টান থাকত তা হলে জন্মদিনে উইশ করার মানে বোঝা যেত। মাঝখান থেকে সত্তরটাকা গলে গেল। কী লাভ হল তোর?' দীপ সিগারেট ফিরিয়ে দিতেই ওটা নিভিয়ে ফেলল তৃণা। যত্ন করে প্যাকেটে রেখে দিল আধপোড়া সিগারেট।

'তুই ভীষণ হতাশায় ভুগিস। ক্যুরিয়ারকে না দিলে টাকাটা তো দু'দিন বাদেই শেষ হত, তাই না। কিন্তু আমাকে অন্য কথা ভাবতে হচ্ছে।'

'কী কথা?'

'ভেবে নিই তারপর বলব। আয় খাই।'

দুটো শক্ত রুটি আর ঝাল দেওয়া আলুর দমের পর বোঁদে খেতে মন্দ লাগল না। টয়লেটের বেসিনের কল খুলে গ্লাসে জল ভরে পর পর খেয়ে নিল ওরা। তৃণা বলল, 'আয়, ঘুম পাচ্ছে।'

'তুই বড্ড বেশি টানছিস!'

'জ্ঞান দিস না। সারাজীবন শুধু জ্ঞান শুনে এসেছি, তুইও যদি সেটা করিস তা হলে তোর সঙ্গে থাকব কেন?' শতরঞ্চির ওপর বসে পড়ে গেঞ্জি খুলে ফেলল তৃণা, 'আয়, কুইক।'

ঘুম ভেঙে গেল দীপের। পাশ ফিরে দেখল তৃণা ঘুমে কাদা হয়ে আছে। এখনও ও গেঞ্জি পরেনি। ওর পিঠ, ঘাড় দেখতে পাচ্ছে সে। এই ঘুম গাঁজা খাওয়ার জন্যে। নেশাটা দীপই ধরিয়েছিল; তখনও ওরা বিয়ে করেনি।

তৃণার মেজাজটা আজকাল অল্পেই রুক্ষ হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে শরীরের আনন্দ পাওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে খেপে যায়। ইদানীং ভয় করে দীপের। সে যেন এ ব্যাপারে তৃণার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। মাঝেমাঝেই তৃণা বিরক্ত হয়ে বলে, 'তুই ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খা। হঠাৎ কী হল তোর?'

দীপ অপরাধীর ভঙ্গিতে বলে, 'অত গাঁজা খেলে এরকম হয়।'

'খাবি না। কই, আমার তো হয় না।'

'তুই মেয়ে, তাই।'

'তা হলে আমিই খাব। তুই খাবি না।'

বাড়ির কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে। তার বাবার অবস্থা খারাপ নয়। স্কুলে থাকতেই বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বাড়ির সঙ্গে যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল তা বুঝতে দেয়নি সে। কলেজে ওঠার পর সেটা প্রকাশ পেল। তখন তৃণার সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। হুটহাট দিঘায় চলে যাওয়া, পার্ক সার্কাস গোরস্থানে গাঁজা খেয়ে মাঝরাত পর্যন্ত পড়ে থেকে বাড়ি ফেরা বাবা মেনে নেয়নি, তারপর যখন বিয়ের কথা বলল তখন ভদ্রলোক মুখের ওপর বলে দিলেন নিজের ব্যবস্থা করে নিতে। চ্যালেঞ্জটা নিয়েছে সে।

যেখান থেকে যা পেয়েছে জোগাড় করে এই ঘর ভাড়া নিয়েছে। স্যার অমলেশ চ্যাটার্জির নাতনি বলে ওকে একটা হাতখরচ দেওয়া হয়। মাসে দু'হাজার টাকা। সেটা তো পনেরো দিনেই শেষ হয়ে যায়।

দীপ জানে তার তুলনায় তৃণা অনেক বেশি ছেড়ে এসেছে। কলেজে পড়ার সময় সে ওর সঙ্গে চ্যাটার্জি হাউসে গিয়েছে কয়েকবার। কী বাড়ি। বিশাল

বাগান। লেডি চ্যাটার্জিকে সে কখনওই দেখতে পায়নি। কিন্তু প্রায়ই ভদ্রমহিলার ছবি ছাপা হয় কাগজে। মালয়েশিয়ায় ওদের নতুন কারখানা নাকি প্রোডাকশনে রেকর্ড করেছে। কত কোটি টাকা মহিলার আছে তা কে জানে! যেহেতু লেডি চ্যাটার্জির কোনও ছেলে নেই এবং একমাত্র মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নয় তাই দুই নাতি নাতনিই তাঁর সব সম্পত্তির মালিক হবে। অর্থাৎ তৃণা পাবে অর্ধেক।

কবে পাবে? আদৌ পাবে কি? আজ আট মাস হয়ে গেল তৃণা ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে কিন্তু ভদ্রমহিলা একবারও খোঁজ নেননি। তৃণা যদি এভাবে গাঁজা খেতে খেতে মরে যায় তা হলেও বোধহয় ভদ্রমহিলার কিছু যায় আসবে না। দীপ ভাবল, এখন থেকে তৃণাকে গাঁজার নেশা ছাড়াবার চেষ্টা করতে হবে।

তৃণার ঘুম ভাঙল বিকেলে। উঠে বসেই চট করে হাত বাড়িয়ে গেঞ্জিটা নিয়ে পরে ফেলল। তারপর দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাথা ভার হয়ে আছে।'

'আজকে আর সিগারেট খাস না।'

'ফোট্। একটা ধরিয়ে দে, মাথা ক্লিয়ার হয়ে যাবে।'

'না। তার চেয়ে চল, চা খেয়ে আসি।'

'চা? বেশ চল।'

'তুই এভাবে যাবি নাকি?'

'কী হয়েছে গেলে?'

'পাবলিক ভিড় করে তোর পা দেখবে।'

'দেখুক।'

'ইম্পসিব্‌ল। প্যান্ট পর।'

দরজায় তালা দিয়ে ওরা নীচে নামল, ফুটপাথের একপাশে চায়ের দোকানে শ্রমিকদের ভিড়। দোকানদার খুব ব্যস্ত। তৃণা ভিড়ের ফাঁক গলে তাকে বলল চা দিতে।

'এক মিনিট দিদি।' লোকটা যেন আগে ভাগে ওদের দিয়ে ধন্য হল।

চায়ে চুমুক দিয়ে দীপ বলল, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।'

'কিন্তু আটাশ টাকা থেকে তিনটাকা কমে গেল।' তৃণা চা খাচ্ছিল।

'কাল দুপুর অবধি হয়ে যাবে। তারপর কী করবি?'

'তুই তো অনেক কিছু ভাবছিলি!' তৃণা তাকাল।

'দূর। আমাকে কেউ চাকরি দেবে না। একটা ফ্রিল্যান্সিং কাজ পেয়েছি, মানে চাইলেই পেতে পারি। করব কি না ভাবছি।'

'টাকা পেলে করবি না কেন?'

'একটু গন্ধ আছে।'

'কী রকম?'

'মাসে দু'বার হয় সিঙ্গাপুর নয় ব্যাংককে যেতে হবে।'

'সে কী রে। দারুণ ব্যাপার। আমিও যাব।' উৎফুল্ল হল তৃণা।

'হ্যাঁ, তুইও কাজটা পেতে পারিস।' চায়ের ভাঁড়টা ড্রামে ফেলল দীপ।

'ওখানে গিয়ে কী করতে হবে জানিস?'

'জিনিসপত্র আনতে হবে।'

'কী জিনিস?'

'অত জানি না!'

'বেআইনি কিছু?'

'হয়তো। কিন্তু কোনও রিস্ক নেই। ওখানকার এয়ারপোর্টে ওরাই পোঁছে দেবে। আবার দমদমে নামলে এখানকার লোক নিয়ে যাবে। সব নাকি ম্যানেজ করা থাকে।' দীপ বলল, 'একটাই সমস্যা আমার পাশপোর্ট নেই।'

'আমার পাশপোর্টটা মায়ের কাছে রয়েছে।'

'দূর! সেটা তো আমেরিকান সিটিজেনের পাশপোর্ট। তাই না?'

'হ্যাঁ। ভুলে গিয়েছিলাম। জন্মসূত্রে আমি আমেরিকান।' হঠাৎ উজ্জ্বল হল তৃণা, 'কালই হাইকমিশনে গিয়ে বলব আমার পাশপোর্ট চুরি হয়ে গিয়েছে ড্যুপ্লিকেট ইস্যু করো।'

'তুই যে আমেরিকান পাশপোর্ট হোল্ডার তার প্রমাণ চাইবে ওরা।'

চোখ বন্ধ করল তৃণা, 'পেয়ে যাব। চল, একটা ফোন করি।'

'কাকে করবি?'

'দরকার আছে।'

'দু'টাকার বেশি কথা বলিস না।'

একটা এসটিডি বুথে ঢুকে মনে করে নাম্বার টিপল তৃণা। রিং হচ্ছে। তারপরই একটি পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেল, 'হ্যালো।'

'মিস্টার কাপুর?'

'স্পিকিং।'

'আমি তৃণা।'

কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তৃণা জিজ্ঞসা করল, ‘শুনতে পাচ্ছেন?’

‘হ্যাঁ। বলো, আমি কী করতে পারি?’

‘আমি আপনার সাহায্য চাই।’

‘ইয়েস!’

‘আপনি জানেন আমি আমেরিকান সিটিজেন। ওখানে জন্মেছি।’

‘হ্যাঁ। ঠিক।’

‘আমার পাশপোর্ট কোথায়?’

‘সম্ভবত তোমার মায়ের কাছে আছে।’

‘ওটা আনিয়ে দিন। ইমিডিয়েটলি।’

‘আমি চেষ্টা করব তৃণা।’

‘না, চেষ্টা কথাটায় খুব ভাঁওতা থাকে। আমি আমার পাশপোর্ট ফেরত চাই।’

‘বেশ। আমি লেডি চ্যাটার্জিকে বলছি।’ কাপুর ইতস্তত করলেন।

‘সেটা তো আমিও বলতে পারতাম।’

‘তুমি কি পাঁচ মিনিট পরে, ওঃ, নো। সরি। ছ’টা বেজে গেছে। তুমি কাল সকালে ফোন করলে আমি জানাতে পারব ওটা কীভাবে পাওয়া যাবে।’

‘ছ’টার সঙ্গে কী সম্পর্ক?’

‘তুমি নিশ্চয়ই জানো তোমার মা সন্ধে ছ’টার পর কারও সঙ্গে কথা বলেন না, ফোন রিসিভ করেন না।’

‘হুম্।’

‘তা হলে—।’

‘আর একটা কথা। আমার অ্যাকাউন্টে মাসে দু’হাজার টাকা আপনারা ডিপোজিট করেন, এটা কত দিন চলবে?’

‘তোমার পঁচিশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত। ওই সময়ের মধ্যে তুমি যদি ভদ্র জীবনযাপন করো তা হলে লেডি দুইকে বাড়িয়ে পাঁচ হাজার করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি তাই হবে।’ কাপুর বললেন।

‘আমি কী জীবনযাপন করছি তা আপনারা জানবেন কী করে?’

‘সবাই বলে লেডির মাথার পেছনেও চোখ আছে।’

‘মিস্টার কাপুর, আমার পেটে সম্ভবত আলসার হয়েছে। চিকিৎসা করাবার টাকা নেই। যদি মরে যাই ওই পাঁচ হাজার টাকা আপনাদের বেঁচে যাবে।’ খট করে রিসিভার রেখে দিল তৃণা।

পরদিন সকাল সাতটায় ওরা যখন ঘুমাচ্ছে তখন দরজায় শব্দ হল।

ঘুম চোখে দরজা খুলে দীপ দেখল স্যুট-টাই পরা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

'লেডি চ্যাটার্জির নির্দেশে এসেছি। নীচে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তৃণা দেবীকে বলুন ব্লু স্কাই নার্সিংহোমে ওঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। উনি যেন রেডি হয়ে নেন।'

'ঠিক আছে, নীচে অপেক্ষা করুন।'

কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল তৃণাও। উঠে বসে মাথায় হাত রাখল, ফিরে এসে দীপ বলল, 'তুই বোধহয় নিজের দিদিমাকে চিনতে পারিসনি।'

'কী ডেঞ্জারাস। আমি ভাবতেই পারিনি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোক পাঠাবে। বলে দে, আমি কোথাও যাব না।'

'ভেবে দ্যাখ।'

'ভেবে দেখব মানে? আমার যে আলসার হয়নি তা বুঝতে ডাক্তারদের কত সময় লাগবে? আমি অসুখের কথা বলে ব্ল্যাকমেল করতে গিয়ে নিজেই বিপদে পড়লাম!'

দীপ চুপচাপ ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর মাথা নাড়ল, 'তৃণা তুই নার্সিংহোমে যা।'

'কী বলছিস?'

'না গেলে ওরা বুঝবেন তুই মিথ্যে বলেছিলি। ভবিষ্যতের পথটা বন্ধ হবে। নার্সিংহোমে যাওয়া মাত্রই তো ওরা জানতে পারবে না যে তোর কিছুই হয়নি। তার মধ্যে একটা প্ল্যান করতে হবে যাতে সাপ মরবে লাঠি ভাঙবে না।' দীপ বলল।

'ওখানে কদিন থাকব?'

'অবস্থা বুঝে ঠিক করব।'

'তুই আমার সঙ্গে থাকবি?'

'থাকতে দেবে কি না জানি না, দিলে নিশ্চয়ই থাকব।'

ভদ্রলোক ড্রাইভারের পাশে বসেছিলেন। ওরা পেছনে। ব্লু স্কাই নার্সিংহোম ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে। অল্প সময়েই নাম করেছে। ব্যবস্থা স্টার হোটেলের মতো। যাওয়া মাত্র তৃণাকে ভর্তি করে নেওয়া হল।

কেবিনটি সুন্দর। নার্সিংহোমের পোশাক পরানো হয়ে গেলে ডাক্তার এলেন, 'কী অসুবিধে হয় ভাই?'

'পেটে যন্ত্রণা হয়। এখানে।' হাত দিয়ে একটা জায়গা দেখাল তৃণা।

'কত দিন?'

'মাস খানেক।'

'ডাক্তারকে দেখিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। পাড়ার ডাক্তার। উনি সন্দেহ করেছেন আলসার।'

'এখনও হচ্ছে?'

'এখন একটু কম।'

'সকালে, এখানে আসার আগে কিছু খেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। ব্রেকফাস্ট করেছি।'

ডাক্তার নার্সের দিকে তাকালেন, 'আজ অবজারভেশনে থাক। আর্লি ডিনার দেবেন। স্যুপ আর পাউরুটি। কাল সকালে সবরকম টেস্ট হবে। লিখে দিচ্ছি।'

একটা কাগজে অনেকটা লিখে ডাক্তার মুখ তুললেন, 'রেস্ট নিন। দরকার হলে অ্যান্টাসিড খাবেন আজ।' ভদ্রলোক উঠলেন।

'ডাক্তারবাবু, আমার হাজব্যান্ড কি এখানে থাকতে পারে?'

'আপনারা ফ্রন্ট ডেস্কে কথা বলুন।' ডাক্তার চলে গেলেন।

হাত বাড়িয়ে ডাক্তারের লেখা কাগজটা তুলল তৃণা। পেশেন্টের নাম তৃণা দত্ত, বয়স কুড়ি। হেসে ফেলল সে। নিশ্চয়ই কাপুর ওঁদের এই নাম বলেছেন।

'আপনি রেস্ট নিন। কোনও অসুবিধে হলেই ওই বেলটা বাজাবেন।' হেসে বলল নার্স। তৃণা ঘাড় নাড়তেই বেরিয়ে গেল।

তৃণা দীপের দিকে তাকাল, 'এখন কী হবে?'

'একটা দিন তো পাওয়া গেল। ভাবতে হবে।' দীপ বলল।

'আর কী ভাববি! সিগারেট ধরা।'

'এই যা। নার্সিংহোমে অর্ডিনারি সিগারেট খাওয়াই নিষেধ।'

'তা হলে আমি এখানে থাকব না।'

'আরাম করে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়।'

'খাওয়া? শুনলি তো স্যুপ দেবে। দু'চক্ষে দেখতে পারি না। কেন যে পেটে আলসারের কথা বললাম! একটা কিছু কর দীপ। প্লিজ!'

মিনিট দশেক পরে নীচে নামল দীপ। রিসেপশনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার স্ত্রী একটু আগে ভর্তি হয়েছেন। আমি কি ওঁর সঙ্গে থাকতে পারি?'

'সরি স্যার। সকালে একঘণ্টা আর বিকেলে দু'ঘণ্টা ভিজিটিং আওয়ার্স। তখন আপনি আসতে পারেন। ওঁর দেখাশোনা আমরাই করব। কী নাম?'

'তৃণা।'

কম্প্যুটারের মাউস ঘুরিয়ে মহিলা বললেন, 'তৃণা দত্ত? চ্যাটার্জি হাউস? ও হ্যাঁ। উনি তো আমাদের বিশেষ কেয়ারে থাকবেন।'

'কেন?'

'লেডি চ্যাটার্জি এই নার্সিংহোমের মেজর শেয়ার হোল্ডার।'

'একটা ভুল হয়ে গেছে।'

'বলুন।'

'ও তৃণা দত্ত ছিল। বিয়ের পর তৃণা রয়। ঠিকানা চ্যাটার্জি হাউস নয়। তিন নম্বর সেলিম আলি লেন।' দীপ বলল।

মহিলা খুব অবাক হয়ে গেলেন। তারপর একটা কাগজে লিখে রেখে বললেন, 'আমি এমডির কাছে আপনার ইনফরমেশন পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'কী রকম টাকা পয়সা দিতে হবে?'

মিষ্টি হাসি হাসলেন মহিলা, 'এভরিথিং অন দ্য হাউস।'

সারাটা দিন খুব খারাপ কাটল দীপের। ওই ঘরে একা থাকতে একদম ভাল লাগছিল না। বিকেলে নার্সিংহোমে যেতেই তৃণা বলল, 'তোকে দেখা করতে বলেছে রিসেপশনে। কী ব্যাপার রে?'

'জানি না। এখনই ঘুরে আসছি।'

রিসেপশনে এখন অন্য মহিলা। পরিচয় দিতে তিনি একটা কাগজ বের করলেন, 'মিস্টার রয়, একটা সমস্যা হয়েছে।'

'বলুন।'

'আপনি সকালে বলে গিয়েছিলেন আপনার পেশেন্টের নাম তৃণা দত্ত নয়, ঠিকানাটাও আলাদা। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমাদের কাছে সেই ইনফরমেশন নেই। আমরা চ্যাটার্জি হাউসে যোগাযোগ করেছিলাম। ওঁরা বলছেন তৃণা দত্তের চিকিৎসার সব দায়িত্ব নার্সিংহোম নেবে, তৃণা রয়ের নয়। আপনি যদি ওঁকে তৃণা রয় হিসেবে ট্রিট করতে চান তা হলে নার্সিংহোমের সমস্ত খরচ আপনাকে দিতে হবে।'

গম্ভীর হয়ে গেল দীপ, 'এটা কে বলেছেন?'

'আমি জানি না। অর্ডারটা এসেছে ওপর থেকে।'

'আমি পাঁচ মিনিট পরে বলছি। পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'নিশ্চয়ই।'

সমস্যা শুনে তৃণা লাফিয়ে উঠল, 'ভগবান আছেন রে!'

'এর মধ্যে কোথায় তাঁকে দেখলি?'

'এই কেবিনের পার ডে চার্জ বারোশো টাকা। ওষুধ ডাক্তার নিয়ে বেশ কয়েক হাজার। মান্থলি দু'হাজার টাকা অনুদানে সেটা দেওয়া যায় না। অথচ আমি এখন বিবাহিত। আমি কেন দত্ত থাকব? এটা আত্মসম্মানের ব্যাপার। আমি নিজে আসিনি, গাড়ি পাঠিয়ে ওরাই এনেছিল। আমাদের পক্ষে এত টাকা খরচ করা সম্ভব নয় বলেই চলে যাচ্ছি।'

শার্ট প্যান্ট পরে নার্সিংহোমের পোশাক ছুড়ে ফেলে তৃণা বেরিয়ে এল দীপের সঙ্গে। নার্স বসেছিল। ওর এই পরিবর্তন দেখে বিস্ফারিত চোখে তাকাল।

নীচে নেমে রিসেপশনে গিয়ে তৃণা মার্কিন ইংরেজিতে জানিয়ে দিল, বিয়ের পরে সে আর দত্ত থাকতে পারে না। আর দত্ত না থাকলে যদি চিকিৎসার খরচ তাকেই দিতে হয় তা হলে কলকাতায় অনেক নার্সিংহোম আছে যেখানে তার পক্ষে চিকিৎসা করানো সহজ হবে। কথাগুলো বলে এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এল তৃণা দীপের হাত ধরে।

বাইরে এসে তৃণা বলল, 'বেঁচে গেলাম। এক ঢিলে দুই পাখি।'

'কী রকম?'

'লেডি চ্যাটার্জিকে টাইট দেওয়া হল আর আমিও ধরা পড়লাম না।' তৃণা হাসল 'দে। সিগারেট ধরা।'

'না এখন নয়।'

'তুই শালা হেভি কনজারভেটিভ।' মুখ বাঁকাল তৃণা।

হেসে ফেলল দীপ।

'হাসলি কেন?'

'তোর কথা শুনলে কে বলবে আমেরিকায় ছেলেবেলা কেটেছে। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন মাথায় এসেছে। লেডি চ্যাটার্জি তোর দিদিমা। তোর মায়ের নাম বিয়ের আগে ছিল কাবেরী চ্যাটার্জি। বিয়ের পর স্বামীর টাইটেল পাওয়া উচিত। তা হলে তোর বাবার পদবি তো নামের পাশে থাকা দরকার।'

'বিয়ের আগে দিদিমার টাইটেল ছিল দত্ত। পরে হল চ্যাটার্জি। স্বাভাবিকভাবে বিয়ের আগে মা ছিল চ্যাটার্জি। আমার বাবার নাম হরপ্রীত। হরপ্রীত ডাট। মা লিখত দত্ত। ডিভোর্সের পরেও মা ওটা পালটায়নি। বলত, মায়ের অরিজিন্যাল টাইটেলে ফিরে গেছি। অতএব আমি ছিলাম তৃণা দত্ত। দাদা ডাট। বুঝলি?'

'জটিল ব্যাপার।'

'দুপুরে খেয়েছিস?'

'হ্যাঁ। এখন পকেটে দশ টাকা আছে।'

'চল, কাপুরকে ফোন করি।'

'আবার দু' টাকা কমে যাবে।'

'যাক।'

এসটিডি বুথে ঢুকে নাম্বার টিপল তৃণা। কাপুরের গলা পেতে সে রাগী গলায় প্রশ্ন করল, 'আমাকে এভাবে অপমান করা হল কেন?'

কাপুর হাসলেন, 'কিন্তু লেডি চ্যাটার্জি তোমার ব্যবহারে খুশি হয়েছেন, বলেছেন আত্মসম্মানজ্ঞান না থাকলে মানুষের কিছুই থাকে না। তোমার আছে।'

হকচকিয়ে গেল তৃণা, 'উনি খুশি হলে আমার কী?'

'তোমার ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ট্রিটমেন্টের জন্যে তুমি পাঁচ হাজার টাকা আলাদা ভাবে তুলতে পারো।'

'হাউ অ্যাবাউট মাই পাশপোর্ট?'

'কাল বিকেলে পেয়ে যাবে।'

তৃণা রিসিভার রেখে জড়িয়ে ধরল দীপকে, 'চল, আজ রাত্রে পার্ক স্ট্রিটে ডিনার করব। তার আগে এখনই ব্যাঙ্কে চল।'

'ব্যাঙ্ক? এখন কটা বাজে জানিস?' দীপ বলল।

'সন্ধের পরেও খোলা থাকে। দেরিতে শুরু হয় ওদের কাজ।'

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তৃণাকে চেনেন। কাপুর ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। প্রত্যেক মাসে দু'হাজার টাকা তোলার সময় ইচ্ছে করেই তৃণা ওঁর সঙ্গে দেখা করে না। আজ দীপকে বাইরে রেখে সে ওঁর চেম্বারে ঢুকল।

ভদ্রলোক প্রৌঢ়। একটু খেঁকুড়ে ধরনের। কিন্তু তৃণাকে দেখেই তাঁর মুখচোখ বদলে গেল! 'কী আশ্চর্য। আসুন, আসুন, বসুন।'

'তুমি অদ্ভুত।' তৃণা হাসল।

'কেন? কেন?' ভদ্রলোক চেয়ারে বসেই এগিয়ে এলেন।

'আমাকে আপনি বলছ! কত দিন ধরে আমাদের পরিচয় বলো তো?'

'হেঁ হেঁ। তা ঠিক তা ঠিক।'

'যাক গে। দিদা আমার অ্যাকাউন্টে পাঁচ হাজার এক্সট্রা পাঠিয়েছে?'

'এক মিনিট।' ভদ্রলোক কম্প্যুটারের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী

যেন অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা?'

তৃণা বলল। ম্যানেজার মাথা নাড়লেন, 'কারেক্ট।'

'ওই টাকায় কিছু হয়, বলুন!'

'কেন? খুব সমস্যা?'

'হ্যাঁ। আমার মায়ের জন্মদিন। মেয়ে হয়ে নিশ্চয়ই কিছু গিফট দেওয়া উচিত মাকে, কী বলো?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার মা লেডি চ্যাটার্জির মেয়ে। পাঁচ হাজার টাকার গিফট ওঁকে দেওয়া যায়? অ্যাট লিস্ট পনেরো হাজার। তাই না?'

'ওঁর স্ট্যাটাসের কথা ভাবলে—!'

'অথচ আমি পঁচিশ হওয়ার আগে মাসে দুইয়ের বেশি পাব না। দিদাটার না মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, তুমি বলো, আমি দেখতে খারাপ? বলো না?'

'না না।'

'আমি যদি শরীর দেখিয়ে রোজগার করতে চাই টাকায় ডুবে যাব। কিন্তু তাতে দিদার সম্মান বাড়বে?'

'না। একদম না।'

'অথচ আমি চাইছি মাকে একটা ভদ্র গিফট দিতে। কিন্তু পারছি না। তুমি একটা উপকার করবে, প্লি-জ।'

'কী উপকার?'

'আমার অ্যাকাউন্টে তো মাসে দু'হাজার করে জমা পড়বে। তুমি ওই পাঁচ হাজারের সঙ্গে দশ হাজার অ্যাডভান্স দিয়ে দাও। ওই টাকাটা তুমি পাঁচ মাসে পেয়ে যাবে। প্লিজ—'

'অ্যাডভান্স তো হয় না, তবে—।

'প্লিজ!' শরীর দোলাল তৃণা।

'আমি চেষ্টা করব। খুব চেষ্টা। তুমি এখন পাঁচ হাজার নিয়ে যাও। একবার ওপরতলার সঙ্গে কথা বলতে হবে, ব্যাস, কাল এসে বাকি দশ হাজার নিয়ে যেও।' ম্যানেজার বিগলিত হলেন।

'ধ্যুৎ! তোমার কোনও পাওয়ার নেই?'

ম্যানেজার সোজা হলেন, 'ওকে! যাও কাউন্টারে যাও। তুমি খুশি তো?'

তৃণা থ্যাঙ্কু বলে বেরিয়ে গেলে ম্যানেজার টাই ঠিক করলেন। এই মেয়ে

নাকি বিপ্লবী মেয়ে! একে একটু সুবিধে দিলে ক্ষতি কী! ম্যানেজার রিসিভার তুলে নাম্বার টিপলেন।

পনেরো হাজার টাকার চেক কাউন্টারে জমা দিল তৃণা। মেয়েটি কম্প্যুটারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সরি। আপনি আজ পাঁচ হাজার তুলতে পারেন। পনেরো নয়!'

'ম্যানেজারকে ফোন করুন। উনি আপনাকে নির্দেশটা দেবেন।' গম্ভীর গলায় বলল তৃণা।

মেয়েটি একটু ইতস্তত করে রিসিভার তুলল, 'স্যার, তৃণা রয় পনেরো হাজার টাকা উইথড্র করতে চাইছেন কিন্তু কম্প্যুটার ওঁকে পাঁচ হাজারের বেশি দিতে পারমিট করছে না। হ্যাঁ স্যার, আপনার সঙ্গে ম্যানেজার কথা বলবেন,' রিসিভার এগিয়ে দিল মেয়েটি।

'হ্যালো।' তৃণা বলল।

'তৃণা আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, পারলাম না।'

'কেন?'

'তুমি প্রত্যেক মাসে দু'হাজার করে নিশ্চয়ই তুলতে পারো কিন্তু কখনওই অ্যাডভান্স নয়, এটা চ্যাটার্জি হাউসের অর্ডার।'

'তা হলে আপনি কেন আমাকে তুলতে বলেছিলেন?'

'অর্ডার ছিল কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ওরা তোমার সম্পর্কে নরম হবে।' ম্যানেজার বললেন, 'আই অ্যাম সরি তৃণা।' লাইন কেটে গেল।

কলকাতার চ্যাটার্জি হাউস তখনও তৈরি হয়নি। স্যার অমলেশ চ্যাটার্জি থাকেন বর্ধমান রোডের ছোট বাড়িতে। চাকর বাবুর্চি দারোয়ান ড্রাইভার তাঁকে সেবা করে। বিয়ের পর কণিকা এলেন সেই বাড়িতে যার ঘরের সংখ্যা পাঁচ। বিয়ে হয়েছিল কলকাতায়। বীরভূমে নয়। তারপর পার্টি। অমন রাজকীয় পার্টি কলকাতার মানুষ খুব কম দেখেছে। স্যার অমলেশের মতো ধনী ব্যক্তির স্ত্রী যে ডানাকাটা সুন্দরী হবেন এটা সবাই মেনে নিয়েও অস্বস্তিতে ছিল। কানাঘুষোয় জানা গেছে মেয়ের বাবার অবস্থা খারাপ নয়। তা হলে শুধু আরও বিত্তবান জামাইয়ের জন্যে অত সুন্দরী মেয়েকে কুদর্শন পাত্রের সঙ্গে ভদ্রলোক বিয়ে দিলেন!

ফুলশয্যার রাত্রে সমস্যায় পড়লেন কণিকা। প্রকৃতি তাঁকে একটু তাড়াতাড়ি বিপদে ফেলল, এবং এই বিপদের কথা স্যার অমলেশকে কখনওই বলা যায়

না। সেই রাত্রে স্যার অমলেশ তাঁর কাছে এলেন। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার জন্যে আমি অত্যন্ত গর্বিত। কিন্তু আমি জানি তুমি আমাকে মেনে নিতে রাজি হয়েছ!'

'কী করে মনে হল?'

'আমি তো অন্ধ নই।' স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলেন স্যার অমলেশ।

'পাগল। অন্ধ হলে কেউ তোমাকে বাঙালির গৌরব বলত না।'

'সে কী। পৃথিবীর বিখ্যাত সুরসাধক অন্ধ ছিলেন!'

'তিনি ব্যবসা করতেন না।'

'তুমি কথা ঘোরাচ্ছ। শোনো, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আমি চাই তুমি সুখী হও। এই বাড়ি, এই আমি, আমার সব কিছুই তুমি তোমার নিজের বলে মনে করবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আজ আমার সেক্রেটারি তোমাকে একটা ফর্মে সই করিয়েছে?'

'হ্যাঁ।' নিচু গলায় বললেন কণিকা।

'তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। ওখানে পাঁচ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। এই টাকা তুমি তোমার ইচ্ছেমতো খরচ করবে।' হাসলেন স্যার অমলেশ, 'আমাকে কোনও কৈফিয়ত দিতে হবে না।'

'আমার দরকার হবে না।'

'হবে।' স্যার অমলেশ স্ত্রীকে চুম্বন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা গুলিয়ে উঠল কণিকার। দ্রুত মুখে হাত দিয়ে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলেন।

'কী হল?'

'কিছু না।'

'কিছু তো হয়েছে!' স্যার অমলেশ চিন্তা করলেন, 'শরীর খারাপ লাগছে?'

'একটু!' বলেই খেয়াল হল। যেভাবে এগোচ্ছেন স্যার অমলেশ তাঁকে নিবৃত্ত করার এই সুযোগ। নইলে আজ রাত্রেই সব ধরা পড়ে যাবে। তিনি বললেন, 'এই সময়ে একটু বেশি ধকল সহ্য করতে হয়েছে।'

'আই সি। তা তো বটেই। কিন্তু তুমি কি ডাক্তারের সঙ্গে কনটাক্ট করেছ?'

'হুঁ।'

'এভরিথিং ওকে!'

'এখন পর্যন্ত। শুধু উনি বলেছেন কোনও ফিজিক্যাল পরিশ্রম না করতে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। টেক রেস্ট।' সরে গেলেন ভদ্রলোক, 'তুমি এক

কাজ করো। ডক্টর শ্যামা মুখার্জির সঙ্গে দেখা করো। ভারতবিখ্যাত গাইনি। আমি ফিরে আসি, তারপর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেব।'

'ফিরে আসি মানে?'

'পুণের ফ্যাক্টরি বাড়ানো হবে। দিন সাতেকের জন্যে যাচ্ছি।'

'ও।' বুক থেকে বিশাল ভার নেমে গেল যেন।

'বাই দিস টাইম তুমি তোমার ডাক্তারকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারো।'

কণিকা তাকালেন।

দুষ্টু হাসি হাসলেন স্যার অমলেশ, 'স্বামীর সঙ্গে মোলায়েম সেক্স ফিজিক্যাল পরিশ্রমের মধ্যে পড়ে কিনা!' বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কণিকা। এখন নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে গেছেন। স্যার অমলেশ যদি জানতে পারেন তা হলে কী করবেন? কণিকাকে কি তাড়িয়ে দেবেন? না। এত উঁচু তলার মানুষ এমন কাজ ইচ্ছে থাকলেও করতে পারেন না। হয়তো ডিভোর্সের জন্যে চাপ দেবেন। এবং ওঁর ক্ষমতার সঙ্গে কণিকা পাল্লা দিতে পারবেন না। আর পাল্লা দিতে তিনি যাবেনই বা কেন? যে লোকটার স্পর্শে শরীর কুঁকড়িয়ে যায় তার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়াই তো কাম্য। কিন্তু ধরা পড়ে অসম্মানিত হয়ে মুক্ত হতে তিনি চান না।

দ্বিতীয় দিনে স্যার অমলেশ ফোন করলেন পুণে থেকে। 'তুমি কেমন আছ? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'একা থাকতে ভাল লাগছে না।' আদুরে গলায় বললেন কণিকা।

' সরি ডার্লিং। আমি বাধ্য হয়ে—।'

'আমি জানি। আচ্ছা, এই ক'দিন বাবা মায়ের কাছে গিয়ে থাকব?'

'ও সিওর। আজই চলে যাও। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

ব্যবস্থা হতে দেরি হল না। স্যার অমলেশের কর্মচারী সযত্নে তাঁকে বীরভূমে পৌঁছে দিয়ে গেল। তাকে দেখে বাবা মা অবাক। আসার কারণ শুনে ওঁরা খুশি, মা বললেন, 'কী বলেছিলাম? চেহারা যেমন হোক জামাইয়ের মতো মানুষ হয় না।'

দ্বিতীয় দিনে টয়লেটে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন কণিকা। মা ছুটে এসে দাঁড়ালেন বন্ধ দরজার ওপাশে, 'কী হয়েছে? হ্যাঁরে?'

কোনওক্রমে দরজা খুললেন কণিকা, 'যন্ত্রণা হচ্ছে। ব্লিডিং হচ্ছে খুব। ওঃ।'

মা ওঁকে ধরাধরি করে শোওয়ার ঘরের খাটে শুইয়ে দিলেন। তাঁর মুখ

থেকে শুনে বাবা পারিবারিক ডাক্তারকে খবর দিলেন। ডাক্তার এলেন। মুখ ঢেকে শুয়ে ছিলেন কণিকা। বৃদ্ধ ডাক্তার তাকে ছেলেবেলা থেকে চেনেন। জানেন মেয়েটি ডানপিটে কিন্তু পড়াশুনায় ভাল। পাশে চেয়ার টেনে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে মা?'

'পড়ে গিয়েছিলাম পা পিছলে। তলপেটে লেগেছে খুব।'

'হুম।'

'তারপরে অনেকটা রক্ত বের হল।'

'পিরিয়ড চলছিল?'

'হুঁ।'

'পিরিয়ড নর্মাল হয়?'

'না। খুব পেইন হয়।'

'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

অম্লান বদনে মিথ্যে বললেন কণিকা, 'হ্যাঁ। ওষুধ খেয়েছি। কমেনি।'

'এখন কি খুব বেশি ব্লিডিং হচ্ছে?'

'না। নর্মাল।'

বৃদ্ধ ডাক্তার পেনকিলার ট্যাবলেট বের করে বিছানায় রাখলেন, 'এখন তো কিছুই বোঝা যাবে না। ব্যথা বাড়লে এটা খাবে। আর পিরিয়ড শেষ হলে ভাল গাইনির কাছে যাবে। বুঝলে?'

পরের দিনও তিনি টয়লেট যাওয়া ছাড়া বিছানা থেকে নামলেন না। এমন কী বিকেলে যখন স্যার অমলেশের ফোন এল তখনও না। মাকে দিয়ে বলে পাঠালেন, বাথরুমে পা পিছলে পড়ে যাওয়ায় অসুস্থ হয়েছে। হাঁটতে পারছে না। মাকে বলে দিলেন, 'এর বেশি একটা কথাও বলবে না। শুধু বলতে পারো ভয়ের কিছু নেই।'

পরের দিন আবার টেলিফোন।

হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে এমন ভান করে টেলিফোন ধরতে গেলেন কণিকা। ওঁকে কথা বলার সুযোগ দিতে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'হ্যালো!' কাঁপা গলায় বললেন কণিকা।

'কী হয়েছে ডার্লিং, তুমি কেমন আছ?' স্যার অমলেশের গলায় উদ্বেগ।

সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়লেন কণিকা। কিছুতেই যেন তাঁর কান্না থামতে চায় না। শক্ত হতে বলে চলেছেন স্যার অমলেশ। শেষ পর্যন্ত কথা ফুটল একটু একটু করে, 'নেই। সব শেষ।'

'মাই গড।'

'আমি কী করব!' গলায় কান্না।

'ওয়েল, তোমার তো কোনও দোষ নেই। এটাকে একটা অ্যাকসিডেন্ট হিসেবে নাও। তোমার কোনও ক্ষতি হয়নি তো? তুমি ঠিক আছ?'

'হুঁ।'

'ডাক্তার কী বলছেন?'

'ক'দিন রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে।' শ্বাস ফেললেন কণিকা।

'ইউ আর লাকি! তুমি কলকাতায় কবে আসতে পারবে?'

'দেখি!'

'তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই। আমি ফেরার পরেই না হয় এসো। রাখছি।'

রিসিভার রেখে দুটো হাত পাখির ডানার মতো ছড়িয়ে এক পাক নেচে নিলেন কণিকা। সব কিছু ঠিকঠাক বেশ চলছে। তুমি যত ধুরন্ধর ব্যবসায়ী হও স্যার অমলেশ, আমিও কমতি নই। হঠাৎ মায়ের গলা কানে এল, 'একী রে! তুই নাচছিস নাকি?'

'কোথায় আবার নাচলাম?' হাত নামালেন কণিকা।

'কী ব্যাপার বল তো?'

'কীসের কী ব্যাপার?'

'তুই সত্যি টয়লেটে পড়ে গিয়েছিলি তো?'

'তার মানে তুমি বলছ আমি মিথ্যে বলেছি? তাতে আমার লাভ কী?'

'জামাইকে চিন্তায় ফেলতে চাইছিস হয় তো!'

'মা।' চিৎকার করলেন কণিকা।

'গতকাল আমি ওই টয়লেটে গিয়ে দেখলাম মেঝে একদম শুকনো। চেষ্টা করেও পা হড়কাল না। কী জানি বাবা!'

কণিকা ঠিক করলেন মায়ের মুখ বন্ধ রাখার জন্যে স্যার অমলেশ ফিরে আসার আগেই কলকাতায় চলে যাবেন। কে জানে, কলকাতায় এসে অপেক্ষা না করে স্যার অমলেশ যদি এখানে চলে আসেন আর মায়ের মুখে সন্দেহের কথাটা শোনেন! না, ঝুঁকি নেওয়া বোকামি হবে।

ক্রমশ মানুষটির জন্যে মায়া জমছিল মনে। তিনি যা বোঝাচ্ছেন তাই স্যার অমলেশ বুঝছেন। এত বড় দুর্ঘটনা থেকে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া স্ত্রীকে

বিশ্রাম দিতে আলাদা ঘরে শুচ্ছেন তিনি, শেষ পর্যন্ত কণিকাই ব্যবধান দূর করলেন। আর তার ফলশ্রুতিতে ন'মাসের মাথায় ওঁদের প্রথম সন্তান জন্মাল। স্যার অমলেশ খুব খুশি। শরীরে সন্তান আসার খবর পাওয়ার পর তিনি এবার কণিকাকে প্রায় তুলোয় শুইয়ে রেখেছিলেন। দু'জন নার্স চব্বিশ ঘণ্টা ওর সেবা করত। সে টয়লেটে যাওয়ার আগে ওরা ভাল করে মেঝে পরীক্ষা করে আসত।

খুশি কণিকাও হয়েছিলেন। ছেলে হয়েছে একেবারে তাঁর মতো। গায়ের রং, মুখের গড়ন হুবহু এক। বাবার কোনও চিহ্ন ওর শরীরে নেই। কী তৃপ্তি, কী তৃপ্তি!

ছেলের তিনমাস বয়স হতেই কণিকা স্যার অমলেশের কাছে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করে তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলেন। একটু ইতস্তত করেছিলেন স্যার অমলেশ। শিশু মায়ের কাছে থাকলে যেভাবে বড় হবে গভর্নেসের কাছে তা সম্ভব নয়। কিন্তু কণিকার আগ্রহ দেখে না বলতে পারলেন না।

স্যার অমলেশের ব্যবসার চারটি ভাগ যে চারজনের ওপর তাঁদের তিনি খুব সতর্ক হয়ে বেছে ছিলেন। রাধাকৃষ্ণন দেখেন প্রোডাকশন, সিং দ্যাখেন সেলস, গুপ্তর ওপর এক্সপোর্টের দায়িত্ব, কাপুর, সবচেয়ে যে তরুণ, তাঁর ওপর ইমপোর্টের ভার। গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে এঁদের কাজ করতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক সোমবারে বেলা দুটোয় এঁদের রিপোর্ট করতে হয় স্যার অমলেশকে। আজও ওঁরা এসেছিলেন। ওঁদের সঙ্গে বসেছেন স্যার অমলেশের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি এবং চ্যাটার্জি কোম্পানির সেক্রেটারি।

মিস্টার রাধাকৃষ্ণনের ফাইলটায় নজর বুলিয়ে স্যার অমলেশ বললেন, 'তা হলে আপনি পশ্চিম বাংলায় কোনও কাজ করতে চাইছেন না?'

'আমার মনে হয় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে না করাই ঠিক হবে।' খুব আস্তে কথা বলেন মিস্টার রাধাকৃষ্ণন।

স্যার অমলেশ কোম্পানি সেক্রেটারি স্বপন দাশগুপ্তের দিকে তাকালেন, 'আপনি কি ওঁর মতকে সমর্থন করছেন?

'ওঁর কথায় যুক্তি আছে স্যার। এখন বিধানবাবু মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেসের শাসন। এঁদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যাবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ক্রমশ কংগ্রেসের ওপর অসন্তুষ্ট হচ্ছে। সিনেমা হলে নিউজ দেখানোর সময় গাঁধীজির

ছবি দেখালেই তারা চিৎকার করে, ব্যঙ্গ করে। এর প্রতিফলন নির্বাচনে পড়বেই।' মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন।

স্যার অমলেশ হাসলেন, 'আপনি এবং মিস্টার রাধাকৃষ্ণন বলতে চাইছেন যে বিধানবাবুকে সরিয়ে কম্যুনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করবেই?'

মিস্টার গুপ্ত বললেন, 'একটু অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে স্যার।'

মিস্টার রাধাকৃষ্ণন বললেন, 'দশ বছরের মধ্যে ঘটতে যাচ্ছে। আর কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় এলে সর্বহারাদের উপকার করার নামে যা করবে তাতে এখানে প্রোডাকশন করা অসম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।'

মিস্টার গুপ্ত মাথা নাড়লেন, 'ঘটনাটা ঘটলে আমি মিস্টার রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে একমত। অবশ্য মাদ্রাজে এই সমস্যা নেই। তা ছাড়া পোর্টের ফেসিলিটিস কলকাতা থেকে অনেক ভাল।'

এই সময় ফোন বাজল। রিসিভার তুলে কথা শুনে স্যার অমলেশ বললেন, 'ওঁকে এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলুন।' তারপর সামনে তাকিয়ে আগের প্রসঙ্গ শেষ করলেন, 'আমি বাঙালি। আমার সেন্টিমেন্ট চাইবে এত বড় প্রজেক্ট পশ্চিমবঙ্গেই হোক। কিন্তু ব্যবসার স্বার্থে আমি মিস্টার রাধাকৃষ্ণনের প্রস্তাব অ্যাকসেপ্ট করলাম। ওয়েল জেন্টলমেন, আপনারা এক মিনিট অপেক্ষা করুন।' স্যার অমলেশ চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

রিসেপশনে বসে ছিলেন কণিকা। তাঁকে দেখে মোহিত হয়ে গেলেন স্যার অমলেশ। অপূর্ব দেখাচ্ছে ওঁকে। সুন্দরী তো বটেই সেই সঙ্গে ব্যক্তিত্বময়ী, আপাদমস্তক সাদা পরেছেন কণিকা। সাদা শাড়িতে তাঁকে মানিয়েছে চমৎকার। স্যার অমলেশ এগিয়ে গেলেন। 'এসো, অসুবিধে হয়নি তো?'

'বিন্দুমাত্র না।' উঠে দাঁড়ালেন কণিকা।

'প্লিজ—।' হাত নেড়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে স্যার অমলেশ।

কণিকাকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই ওঁরা উঠে দাঁড়ালেন। স্যার অমলেশের সেক্রেটারি দ্রুত একটি চেয়ার এনে ওপাশে রাখলেন। সেদিকে তাকিয়ে স্যার অমলেশ বললেন, 'বসো।'

কণিকা বসলে তিনি হেসে বললেন, 'ওয়েল জেন্টলমেন। এখন আমি আপনাদের সঙ্গে লেডি কণিকা চ্যাটার্জির আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। আপনারা বোধহয় জানেন না লেডি চ্যাটার্জি এম বি এ করেছিলেন দিল্লি থেকে। আমার মনে হয় আপনারা নিজেরাই নিজেদের ইনট্রোডিউস করুন।'

সবাই একে একে নিজের নাম বললেন।

কণিকা মাথা নাড়লেন, 'আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

স্যার অমলেশ বললেন, 'এখন আধঘণ্টার জন্যে একটা ব্রেক চাইছি। মিস্টার দাশগুপ্ত, আপনি থাকুন।' ওঁর নিজস্ব সেক্রেটারি আর মিস্টার দাশগুপ্ত ছাড়া সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে তিনি বললেন, 'আজ খুব আনন্দের দিন। লেডি চ্যাটার্জি আজ চ্যাটার্জি কোম্পানিতে জয়েন করছেন। মিস্টার দাশগুপ্ত আশা করি আপনি ওঁকে সাহায্য করবেন।'

'অবশ্যই স্যার।'

'প্রথম দিকে, আমি চাইছি, লেডি চ্যাটার্জি সব কিছু খতিয়ে দেখুন। আমাদের কাজ এবং তার পদ্ধতির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হোন। এ ব্যাপারে আমাদের সমস্ত ইউনিট যেন তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করে। মিস্টার দাশগুপ্ত, আপনি ওঁকে আমাদের ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত ইনফর্মেশন কালকের মধ্যেই দিয়ে দেবেন। ওঁর জন্যে ওপরের ফ্লোরে আজই ঘর অ্যালট করে দিন।' শেষ আদেশটি নিজের সেক্রেটারিকে দিলেন স্যার অমলেশ।

ওঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে স্যার অমলেশ চেয়ার থেকে উঠে কণিকাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি জানি তুমি সফল হবে।'

'থ্যাঙ্কস। কিন্তু এটা অফিস, তাই না?' হাসলেন কণিকা।

ন্যান্সি মন্টেগোমেরি তিন কামরার ফ্ল্যাটে একাই থাকেন। ঘরে ঢুকে কাবেরী অবাক হয়েছিলেন। এখানে সব বাড়িতেই মেঝের ওপর কার্পেট থাকে, ন্যান্সির বাড়িতেও আছে কিন্তু ঘরে চারটে চেয়ার এবং একটি টেবিল ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। দেওয়ালে কোনও ছবি বা সুভেনির টাঙানো হয়নি।

ন্যান্সি তাঁর হাত ধরে বললেন, 'খুব খুশি হয়েছি। এসো, বসো।'

ওই কাঠের চেয়ারেই বসতে হল। ন্যান্সি জিজ্ঞাসা করল, 'কী খাবে বল? ড্রিঙ্কস? বিয়ার খাবে?'

'না। ধন্যবাদ। তোমার পরিবারে আর কে কে আছেন?'

'আমার মেয়ে। সে থাকে ক্যালিফোর্নিয়ায়। ওখানে পড়ে। এখানে আমি একাই থাকি। একদম একা। এবং এটা আমি খুব পছন্দ করি।' ন্যান্সি বললেন।

কাবেরী বুঝলেন ন্যান্সির সঙ্গে ওঁর স্বামীর ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতূহল দেখানো ঠিক নয়।

গল্প হল। তারপর দ্বিতীয় ঘরে নিয়ে গেল ন্যান্সি। এখানে খাওয়ার টেবিল, একটা সোফা কাম বেড, ওপাশে কিচেন, এপাশে টয়লেট।

ন্যান্সি বললেন, 'আমি খুব ভাল রান্না করতে পারি না। তবে হোটেলের খাবার খেতে কখনও কখনও ইচ্ছে করে না, এই যেমন আজ, বসে পড়ো।'

তিন কোর্সের খাবার। কিন্তু রান্না বেশ ভাল। প্রশংসা করতেই লজ্জিত হলেন ন্যান্সি। খাওয়ার পর আবার বাইরের ঘরের কাঠের চেয়ারে চলে এলেন কাবেরীকে নিয়ে। কাবেরী লক্ষ করল, তৃতীয় ঘরটিতে ন্যান্সি তাঁকে নিয়ে গেলেন না। ওই ঘরের দরজা বন্ধ। নিশ্চয়ই ওটা ওঁর বেডরুম। বেডরুমে বাইরের লোককে নিয়ে যেতে অনেকের আপত্তি থাকে। সেটা স্বাভাবিক।

ঘণ্টা দুয়েকের গল্পে ন্যান্সি কাবেরীর নাড়ীনক্ষত্র জেনে ফেললেন, এমন কী হরপ্রীতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাও যে সহজ নেই তাও তাঁর জানা হয়ে গেল।

ন্যান্সি বললেন, 'তুমি নিজেকে কষ্ট দিয়েছ, বিশাল ঐশ্বর্য আবেগে ছেড়ে এসেছ কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি তুমি নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করনি।'

'কী ভাবে সেটা করব?'

'সাধারণ মানুষের থেকে নিজেকে আলাদা করতে হবে। তারা যা পারবে না তা তুমি যদি অবলীলায় করতে পার তা হলে দেখবে তোমার ব্যক্তিত্ব বাড়বে, মনের জোরও। তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলো।' ন্যান্সি বললেন।

'নিশ্চয়ই।' ক্যাবেরী হাসলেন।

'কিন্তু একটা কথা। সন্ধে ছ'টার পর ফোন কোরো না। তখন ফোনের লাইন অফ করে রাখি।'

ন্যান্সির প্রতি ক্রমশ এক অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করলেন কাবেরী। প্রায়ই ফোন করেন কিন্তু সন্ধে ছ'টার পরে নয়। সংসার ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল। হরপ্রীতের সঙ্গে এক বাড়িতে থেকেও কোনও যোগাযোগ নেই। দুজনের পৃথিবীটাই আলাদা হয়ে গেছে যেন। বাড়িতে হরপ্রীত যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ছেলের সঙ্গে গল্প করে, হাসির আওয়াজ পাওয়া যায়। রাত্রে ছেলে বাবার সঙ্গে ঘুমায়, কাবেরী লক্ষ করেছেন, মেয়ের প্রতি হরপ্রীত একেবারে নিরাসক্ত। ওইটুকুনি মেয়ে বাবার কাছে গেলে হরপ্রীত ছেলেকে হুকুম করে ওকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে।

এক সন্ধ্যায় যখন হরপ্রীত বাড়িতে নেই তখন ফোনটা এল, 'হরপ্রীত প্লিজ?'

গলাটা কোনও মহিলার। কাবেরী বললেন, 'ও বাড়িতে নেই।'

'কখন পাওয়া যাবে?'

'বলতে পারছি না।'

'ওকে বলবেন জুলিয়া ফোন করেছিল।'

ব্যাপারটাকে আমলই দেয়নি কাবেরী। ব্যবসার সূত্রে হরপ্রীতের সঙ্গে প্রচুর মানুষের আলাপ হয়। এই মেয়েটিও হয়তো সেভাবেই পরিচিত।

পরের দিন বাড়ি ফিরে হরপ্রীত ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মতো ছুটে এল ওঁর সামনে, 'এই, জুলিয়া ফোন করেছিল বলিসনি কেন? অ্যাঁ? বল্, বলিসনি কেন?'

হতভম্ব হয়ে গেলেন কাবেরী। হরপ্রীতের এই চেহারা সে কখনও দ্যাখেনি।

'তুমি এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছ কেন?'

'বেশ করব। তোর সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলা উচিত তাই বলছি। বল, কেন বলিসনি জুলিয়ার ফোনের কথা?' চেঁচাল হরপ্রীত।

মেয়েটা পাশে বসে খেলছিল। আচমকা খেলনা ছুড়ে মারতে চাইল বাবাকে।

'ও—ও। বাচ্চাটাকেও শিখিয়ে দিয়েছিস। জেলাসি? তোর কী আছে যে তুই আমাকে জুলিয়ার কাছ থেকে সরাবি? একটা কয়লার স্তূপ। শরীরটা না থাকলে কুকুরও পেচ্ছাপ করত না।' সামনে থেকে সরে গেল হরপ্রীত।

কাঁদেননি কাবেরী।

পরদিন দুপুরে ফোন করেছিলেন ন্যান্সিকে। বলেছিলেন, 'আমি খুব খারাপ আছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ন্যান্সি বললেন, 'তুমি আজ বিকেল পাঁচটায় আমার কাছে আসতে পারবে?'

'পারব।' কাবেরী বললেন।

'তা হলে একটু সময় নিয়ে এসো।'

হরপ্রীতকে ফোন করলেন কাবেরী। 'আমি বিকেলে বেরুব। বাচ্চা দুটো বাড়িতে থাকবে। একটু তাড়াতাড়ি আসা সম্ভব হবে?'

'না।' ফোন রেখে দিলে হরপ্রীত।

এক মুহূর্ত দ্বিধায় না কাটিয়ে অ্যাসোসিয়েশনে ফোন করলেন কাবেরী, ওঁরা বেবি সিটার পাঠান। জানা গেল যিনি আসবেন তাঁকে পুরো চার্জ দিতে হবে, রাজি হলেন কাবেরী। ঠিক তিনটের সময় যে মহিলা এলেন তাঁকে দেখে ভাল লাগল না কাবেরীর। স্প্যানিশ মেয়ে, গায়ে পড়া স্বভাবের। বয়সও কম। শরীর

সর্বস্ব মেয়েদের মতোই নির্বোধ। কিছু করার নেই। বাচ্চাদুটোর দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে কাবেরী হরপ্রীতের জন্যে একটা নোট রেখে বেরিয়ে পড়লেন।

ঠিক পাঁচটায় ন্যান্সির ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেলেন তিনি। দরজা খুলে ন্যান্সি অবাক, 'এ কী চেহারা হয়েছে তোমার? এসো, ভেতরে এসো।'

ন্যান্সি কফি করলেন। কফি খেতে খেতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হরপ্রীত বিয়ের আগে কি জানত যে তোমাদের বিপুল পারিবারিক ব্যবসা আছে?'

মাথা নেড়েছিলেন কাবেরী, হ্যাঁ।

'ওকে বিয়ে করলে তুমি সেই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারো তা কি জানতেন?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মনে হয়েছিল উনি তোমাকে টাকার জন্যে বিয়ে করেননি। ভালবেসে করেছেন।'

'হ্যাঁ।'

'তারপর এতগুলো বছরে, দুটো বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত তিনি ওই ব্যাপারে কথা বলেননি?'

'না।'

'তোমার মায়ের ফোন পাওয়ার পর তাঁর ব্যবহার বদলে গেল। তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'অর্থাৎ যখন তাঁর ভালবাসার আবেগ শেষ হয়ে গিয়েছিল তখনই তোমার মায়ের প্রস্তাব সে পেয়েছিল। ওঁর জীবনে কি অন্য মেয়ে এসেছে?'

'জানি না! জুলিয়া নামের একজন ফোন করে ওকে চেয়েছিল। ও বাড়িতে ছিল না তখন। পরে ওকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। জুলিয়ার কাছে সেটা জানতে পেরে ও আমার সঙ্গে কদর্য ব্যবহার করেছে। আমার চেহারা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে।'

'তোমার চেহারা নিয়ে? এত সুন্দর ফিগার তোমার—।'

'আমার গায়ের রং নিয়ে।'

'অদ্ভুত! তা হলে আফ্রিকা আমেরিকার কালো মেয়েদের সম্পর্কে ওঁর কী ধারণা?'

'জানি না। আমি আর পারছি না।'

কিছুক্ষণ কাবেরীর দিকে তাকিয়ে থেকে ন্যান্সি বললেন, 'দ্যাখো কাবেরী,

আমি তোমার জন্যে চেষ্টা করব কিন্তু তোমাকে মনোসংযোগ করতে হবে। পারবে?'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'এই পৃথিবীতে কেউ একা কোনও কিছুই করতে পারে না। একজন লেখক, একজন গায়ককেও প্রকাশক বা রেকর্ড কোম্পানির সাহায্য নিতে হয়। কাবেরী, আমাদের একটি সংস্থা আছে। এই সংস্থার সদস্য এখন একশো সাতজন। এঁরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন: আমরা মনে করি মানুষের শরীরে যে আত্মা আছে তার হদিস মানুষ জানে না। শরীরের পতন হলে আত্মা শেষ হয়ে যায় না। কারণ আত্মা অবিনশ্বর। এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সে থেকে যায়। আমরা শরীরের আত্মার সঙ্গে দেহহীন আত্মার সংযোগ করাতে চাই। এই ব্যাপারে আমাদের খুব কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হয়। তুমি যদি চাও, তা হলে তোমাকে সদস্য করার জন্যে আমি সংস্থার কাছে আবেদন করতে পারি।' ন্যান্সি ধীরে ধীরে বললেন।

'কিন্তু তাতে আমার সমস্যার সমাধান হবে?'

'নিশ্চয়ই। তুমি আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। অনুশীলনের পরে তোমার নিজের ওপর আস্থা বেড়ে যাবে। অন্য সমস্ত সদস্য তোমাকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে।'

'তাদের সঙ্গে দেখা হবে আমার?'

'মুখোমুখি হয়তো নয়। প্রত্যেক বছর নির্বাচিত সদস্যরাই একত্রিত হয়, কিন্তু প্রতিদিন তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। সাধারণ সুখ দুঃখকে তখন তোমার অসাড় বলে মনে হবে। ধীরে ধীরে তুমি কিছু ক্ষমতার অধিকারী হবে। তখন দেখবে কেউ তোমার সঙ্গে শত্রুতা করার সাহস পাবে না।'

'এটা কি ব্ল্যাক ম্যাজিক?'

'নো। নট অ্যাট অল। দিনের পর দিন অনুশীলনের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত আমরা পরস্পরের সঙ্গে মনোসংযোগ করতে পেরেছি। মানুষের শরীরে যে দুটো চোখ রয়েছে তা দেখার কাজে লাগে। কিন্তু দ্রষ্টব্য বস্তুর মাধ্যমে কোনও আড়াল থাকলে চোখ তাকে দেখতে পায় না। তা ছাড়া আমাদের চোখের ক্ষমতাও খুব সীমিত। বিশেষ একটা দূরত্বের পর চোখ কিন্তু দেখতে পায় না। তুমি নিশ্চয়ই অন্তর্দৃষ্টি কথাটা শুনেছ। ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের পুত্ররা নাকি ওই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। ওই দৃষ্টিতে দেখার জন্যে শারীরিক চোখের প্রয়োজন হয় না। আমরা ওই অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করি না। কিন্তু

মনোসংযোগের মাধ্যমে আমরা যা চাই তা দেখে নিতে পারি।' হাসলেন ন্যান্সি।

'কত দিনে এই সাফল্য পাওয়া সম্ভব?'

'একটা তারের ওপর দিয়ে তুমি কত দিনে হেঁটে যেতে পারবে?'

'আমি? এই শরীর নিয়ে? অসম্ভব।'

'শরীরকে যদি নিয়মিত অনুশীলন এবং খাদ্যাভ্যাস বদলে উপযোগী করে নাও?'

'তাও সম্ভব হবে না। কারণ তারের ওপর দিয়ে কীভাবে হাঁটতে হয় সেই শিক্ষা আমার নেই। শুনেছি সার্কাসের শিল্পীরা শৈশব থেকে অনুশীলন করে শিখে নেয়।' কাবেরী বললেন।

'কিন্তু যদি তোমার আগ্রহ থাকে, যদি তোমার শরীর উপযুক্ত হয়, আর প্রশিক্ষক যদি নিয়মিত প্রচুর সময় নিয়ে শিক্ষা দেন তা হলে নিশ্চয়ই অন্তত একবার তারের ওপর দিয়ে একা হেঁটে যেতে পারবে। কী, পারবে না?'

কাঁধ নাচালেন কাবেরী, 'কী জানি! হয়তো পারব।'

হাসলেন ন্যান্সি, 'একাগ্র অনুশীলনের পর যেটুকু পারবে তার একাংশও এখন তুমি পারবে না। শরীরটাকে তারের ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে যদি নাও পারো তবু তার কাছাকাছি যেতে পারলে দেখবে তৃপ্তি পাবে। ঠিক তেমনি যোগসাধনার মাধ্যমে নিজেকে উন্নত করতে পারলে তুমি অসাধারণ না হলেও সাধারণের দলে মিশে থাকবে না।'

'বেশ। আমি রাজি।' কাবেরী বললেন।

ঘড়ি দেখলেন ন্যান্সি। ছ'টা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। তিনি বন্ধ দরজা ঠেলে পাশের ঘরে চলে গেলেন। ওই ঘরটিকে শোওয়ার ঘর বলে মনে হচ্ছিল কাবেরীর। কিন্তু যাওয়ার সময় ওঁকে ডাকলেন না ন্যান্সি।

মিনিট তিনেকের মধ্যে ন্যান্সি বেরিয়ে এলেন। এর মধ্যেই পোশাক বদলে নিয়েছেন তিনি। কাঁধ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত কালো ঢিলে পোশাকে তাঁকে অন্য রকম দেখাচ্ছিল। ন্যান্সির হাতেও একটি কালো পোশাক। সেটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'চটপট পরে ফেলো। কোনও প্রশ্ন এখন কোরো না।'

পোশাক বদলে পাশের ঘরে তাঁকে নিয়ে এলেন ন্যান্সি। বেশ বড় ঘর কিন্তু ওই ঘরে লাল আলো জ্বলায় সব কিছু অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। চেনা বস্তুগুলোর ওপর অচেনা ছাপ পড়েছে।

ঘরের মাঝখানে একটা গোলাকার শ্বেতপাথরের টেবিল। টেবিলটি মেঝে

থেকে এক ফুট উঁচুতে। টেবিলের মাঝখানে একটা বড় গোলক, স্ফটিকের।

ন্যান্সি বললেন, 'আমার পাশে বসো।'

কাবেরী দেখলেন ন্যান্সি টেবিলের গা ঘেষে মেঝের ওপর বসে দুটো পা টেনে পদ্মাসন করে নিলেন। সেই চেষ্টা করতে কাবেরীর পা বিদ্রোহ করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত সক্ষম হলেন তিনি। ঠিক তখনই ঘড়িতে ছ'টা বাজল।

লেডি কণিকা চ্যাটার্জির দিন শুরু হয় ভোর পাঁচটায়। মিনিট দশেকের মধ্যে জগিং স্যুট পরে চলে যান বাড়ির ছাদে। এই বাড়িটা তৈরি হয়েছিল বিয়ের কিছু দিন পরে। তৈরি হতে সময় লেগেছিল প্রায় দু' বছর। চ্যাটার্জি হাউসকে কলকাতার মানুষ প্রাসাদ বলে মনে করে। ছাদের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেঁটে গেলে বোঝা যায় বাড়িটার দৈর্ঘ্য অর্ধেক ফুটবল মাঠের চেয়ে কম নয়। লেডি কণিকা চ্যাটার্জি এই দূরত্ব অন্তত আটবার অতিক্রম করেন। তারপর পাঁচ মিনিট জিরিয়ে নেওয়ার পর পরিচারিকার পেতে দেওয়া বিশাল শীতলপাটির ওপর আসন করেন আধ ঘণ্টা। সত্তর পেরিয়েছেন অনেক দিন কিন্তু তাঁর শরীর মেদমুক্ত এবং যে কোনও যুবতী নারীর কাছে ঈর্ষণীয়। আসনের পর পাঁচ মিনিট শবাসনে থেকে চোখ বন্ধ করে চিন্তামুক্ত হয়ে থাকার চেষ্টা করেন তিনি। এখন মনটাকে ফাঁকা করে ফেলতে বেশি সময় লাগে না তাঁর। একবার এটা করতে পারলে সারা দিনের জন্যে রক্তচাপ নিয়ে বিব্রত হতে হয় না।

রোদ ওঠার মুখেই নীচে চলে আসেন লেডি চ্যাটার্জি। ততক্ষণে আর একজন পরিচারিকা বাথটবে ঈষৎ উষ্ণ জল তৈরি করে রেখেছে। তিনি ঢুকলেই সে একপাশে সরে দাঁড়ায়। বিরাট বাথরুমের এক পাশে লম্বা শক্ত গদিওয়ালা খাট পাতা। জগিং স্যুট খুলে ফেলে শুধু অন্তর্বাস পরে তার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন তিনি। পরিচারিকা এগিয়ে আসে। বিজ্ঞানসম্মত ম্যাসাজ করার শিক্ষা নিয়ে এসেছে সে লেডি চ্যাটার্জির নির্দেশে। সে তার কাজ শুরু করে দেয়। এডি ভিটামিন তেল ব্যবহার করে লেডি চ্যাটার্জির সমস্ত শরীরে যেন পিয়ানো বাজিয়ে দেয় দক্ষ আঙুলে। তারপর গলা মুখ এবং হাতের চামড়ায় হাঁসের পায়ের ছাপের মতো বয়সের দাগগুলোকে হালকা করার চেষ্টা করে সযত্নে। ওই ম্যাসাজটি বড় উপকারে আসে।

কাজ শেষ করে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যায় পরিচারিকা। খুব প্রয়োজন না হলে এই আধ ঘণ্টা সময়ে একটিও বাক্য খরচ করেন না লেডি চ্যাটার্জি। তারপর বাথটবে নামেন। জল তখনও ঠান্ডা হয়নি কিন্তু গরমও নেই।

আপাদমস্তক তৈরি হতে অন্তত এক ঘণ্টা সময় লাগে লেডি চ্যাটার্জির। খুব

যত্ন করে প্রসাধন নেন তিনি। স্যার অমলেশ চলে যাওয়ার পর থেকেই সিল্কের গরদ ছাড়া অন্য পোশাক পরেন না। চোখে হালকা রঙিন চশমা যা রোদ্দুরে গাঢ় হয় আবার রাতেও পরিষ্কার দেখা যায়।

তৈরি হওয়ার পর এক কাপ দার্জিলিং-এর চায়ের লিকার পান করেন তিনি। দিনের প্রথম খাবার। নীচে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে তৈরি। মার্সিডিজ তাঁর জন্যে, পেছনে একটা মারুতি ওমনিতে দু'জন দেহরক্ষী। ওমনির দরজা খুব দ্রুত পাশাপাশি খোলা যায় বলে প্রয়োজন হলে ওই দুই সশস্ত্র দেহরক্ষী সুবিধে পাবে। এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে বছর চারেক। কলকাতার পুলিশ কমিশনার তাঁকে নিরাপত্তার ব্যাপারে সজাগ করেছিলেন। তাঁর মতো বিত্তবতী মহিলাকে রাস্তায় পেলে উগ্রপন্থী তো বটেই মাফিয়ারাও টার্গেট করতে চাইবে।

ঠিক ন'টায় লেডি চ্যাটার্জি তাঁর অফিস ঘরের বিশেষ চেয়ারে বসে কম্প্যুটারের বোতাম টেপেন। তাঁর ব্যবসা সাম্রাজ্যের কোথায় কী হচ্ছে সেই বিস্তৃত বিবরণে চোখ রাখেন পনেরো মিনিট। ইন্টারকমের বোতাম টিপে গম্ভীর গলায় বললেন, 'কাপুর!'

চার মিনিটের মধ্যে দরজায় শব্দ হল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন কাপুর, 'গুড মর্নিং ম্যাডাম।'

'মর্নিং!' সরাসরি তাকালেন লেডি চ্যাটার্জি। বয়স হয়েছে কাপুরের, চুল সাদা, একটু ভারী শরীর, পেট বেঢপ। কিন্তু চটপটে ভাবটা এখনও আছে।

কাপুর চেয়ার টেনে বসলেন।

'কাপুর! তোমাকে আজ খুব বয়স্ক দেখাচ্ছে!' লেডি চ্যাটার্জি নিচু গলায় বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন কাপুর। তার মেরুদণ্ডে চিনচিনে অনুভূতি। এই মহিলার কথা বলার কায়দা তার জানা। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সাক্সেনা ব্যক্তিগত কারণে আধঘণ্টা দেরিতে অফিসে এসেছিলেন। বিকেলের মিটিং-এ দেখা হতেই ম্যাডাম বলেছিলেন, 'মিস্টার সাক্সেনা, নতুন জুতো কেনার পর বাড়িতে কয়েক দিন প্র্যাক্টিস করে নিয়ে বাইরে বের হওয়া উচিত। তা হলে হাঁটতে কষ্ট হয় না।'

সাক্সেনা অবাক হয়ে বলেছিল, 'আমি তো গত ছয় মাসে নতুন জুতো কিনিনি।'

'সরি। আমি ভেবেছিলাম নতুন জুতো ব্যবহার করায় আজ আপনার দেরি হয়েছিল। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম।' অন্যদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন মহিলা।

তারপর থেকে সান্ত্বনা কখনও দশ সেকেন্ড দেরিতে আসেনি।

কাপুর তাকালেন, 'ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবব ম্যাডাম।' কাপুর বললেন।

'তৃণা সম্পর্কে খবর নিয়েছ?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম। যে ডাক্তার ওকে নার্সিংহোমে সাধারণ চেক-আপ করেছিলেন তিনি একটু কনফিউজড। ওর শরীরে কোনও রোগ আছে কি না বুঝতে পারেননি। ব্লাড এবং অন্যান্য রিপোর্টের ওপর সিদ্ধান্ত নেবেন বলেছিলেন কিন্তু তার আগেই সে নার্সিংহোম থেকে চলে গিয়েছিল।'

'তারপর?'

'মনে হয় ওর টাকার দরকার তাই চিকিৎসার জন্যে বরাদ্দ পাঁচ হাজারে সন্তুষ্ট না হয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে অ্যাডভান্স চেয়েছিল।'

'এ সব কথা তো তুমি জানিয়েছ। অসুখের পরে ওর লাইফস্টাইল কি বদলেছে?' লেডি চ্যাটার্জি তাকালেন।

'না ম্যাডাম। পাঁচ হাজার টাকা হাতে পেতেই ওরা নৌকো ভাড়া করে গঙ্গার মাঝখানে গিয়ে মদ আর গাঁজা ভরা সিগারেট খেয়েছে।' কাপুর মাথা নামালেন।

'গঙ্গার মাঝখানে?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম। ছেলেটা আপত্তি করেছিল দুটো নেশা একসঙ্গে করতে কিন্তু তৃণার জেদের কাছে পেরে ওঠেনি। অন্তত নৌকোর মাঝি তাই বলছে।'

'তারপর?' লেডি চোখ বন্ধ করলেন।

কথাটা কী ভাবে বলবেন ভাবলেন কাপুর। যে সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তৃণার ওপর নজর রাখতে তাদের রিপোর্ট উচ্চারণ করতে সঙ্কোচবোধ করছিলেন তিনি। লেডি তখনও চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করছেন দেখে শেষ পর্যন্ত কাপুরকে বলতেই হল, 'অ্যাকর্ডিং টু মাঝি, তৃণা সেক্স-এর জন্য ইনসিস্ট করতে থাকে। শি ওয়ান্টেড টু ডু দ্যাট খোলা আকাশের নীচে। ছেলেটার ইচ্ছে ছিল না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয় কিন্তু ফেল করে। রেগে গিয়ে তৃণা ওকে লাথি মারে। ছেলেটাও চড় মারে ওকে। তারপর দু'জনেই চুপ করে যায়। নৌকোর ভাড়া মিটিয়ে একটা ট্যাক্সি করে ফিরে যায় ডেরায়। সেই ট্যাক্সিওয়ালাও এজেন্সিকে বলেছে ওরা ট্যাক্সিতে একটাও কথা বলেনি।'

'চমৎকার।' লেডি চ্যাটার্জি বললেন, 'কাপুর, তোমাকে একবার দায়িত্ব দিয়েছিলাম আমার মেয়ের ব্যাপারে। তুমি একদম ফেল করেছিলে। তোমার আত্মীয় একটি বাজে ছেলেকে বিয়ে করে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল

সে। কিন্তু এবার, নাতনির বেলায় আমি চাই তুমি আমার ইচ্ছে পূর্ণ করবে।'

'অবশ্যই। আমি———।'

লেডি চ্যাটার্জি বললেন, 'ওর কিছুই হয়নি। যে মেয়ে পেটের যন্ত্রণায় নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিল সে পরের দিন ওসব নেশা করে সেক্সের জন্যে ব্যস্ত হতে পারে না। সে পুরো ব্লাফ দিয়েছে আমাকে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে বলে দাও পরের মাস থেকে ওকে যেন হাতখরচের টাকাটা না দেওয়া হয়। আর চেষ্টা করো, ওকে না জানিয়ে, ওর বাচ্চা স্বামীটাকে ওর বিরুদ্ধে খেপিয়ে দিতে। বুঝেছ?'

'ইয়েস ম্যাডাম।'

'যেতে পারো।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে কাপুর যেন বেঁচে গেলেন।

নিজের ঘরে ফিরে চেয়ারে হেলান দিয়ে কাপুর কয়েক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে বসে থাকলেন। এবং তখনই তার পুরনো ইচ্ছেটা ফিরে এল। অনেক বছর হয়ে গেল, আর না। তিনি নিজে কথাটা দু'বার বলতে চেয়েছিলেন লেডি চ্যাটার্জিকে। প্রথমবার স্যার অমলেশ মারা যাওয়ার দু' বছর পরে। তখন ইমপোর্ট-এর দায়িত্বের সঙ্গে তাঁর ওপর এক্সপোর্টের দায়িত্ব পড়েছিল মিস্টার গুপ্ত অসুস্থ হয়ে দীর্ঘ ছুটিতে যাওয়ায়। সেই সময় মাদ্রাজের ফ্যাক্টরিতে গোলমাল হওয়ায় নির্দিষ্ট তারিখে মাল পাঠানো যায়নি অস্ট্রেলিয়ায়। এই কারণে অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানি চুক্তি অনুযায়ী অনেক টাকা খেসারত হিসেবে চাইতে পারে জেনে লেডি কণিকা চ্যাটার্জি কাপুরকে ডেকে পাঠিয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। কাপুর বোঝাতে চেয়েছিলেন ব্যাপারটা তার হাতের মধ্যে ছিল না। লেডি চ্যাটার্জি কোনও কথা শুনতে রাজি হননি। কাপুর বলেছিলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা শ্রমিক ধর্মঘটের জন্যে রফতানি ব্যাহত হলে কোনও খেসারত দিতে হবে না বলে চুক্তিতে লেখা আছে।

লেডি চ্যাটার্জি তার কোনও কথাই শুনতে চাননি।

সেদিন বিকেলে কাপুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, চাকরি ছেড়ে দেবে। খুব বিনয়ের সঙ্গে চিঠি টাইপ করে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন লেডি চ্যাটার্জির কাছে। স্যার অমলেশের সঙ্গে কাজ করে তিনি কখনও অপমানিত বোধ করেননি। বয়সের বিচারে লেডি চ্যাটার্জি তার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। কিন্তু ওঁর ব্যবহারে সেটা বোঝা যায় না। চ্যাটার্জি পরিবারের জন্যে কাপুর দিনের ষোলো ঘণ্টা ব্যয় করেও এই ব্যবহার পাওয়ায় খুব ক্ষুব্ধ হয়ে

উঠেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন লেডি চ্যাটার্জি তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করবেন কিন্তু কাপুরকে কিছুই জানানো হল না। সেই রাত্রে কাপুরের কাছে খবর এল মাদ্রাজের কারখানায় ধর্মঘট ডেকেছে শ্রমিকরা। সে তাজ্জব হয়ে গেল। আজ বিকেল পর্যন্ত সেখানে ধর্মঘটের কোনও কারণ ছিল না। তা ছাড়া প্রস্তুতি ছাড়াই অত বড় ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘট কী করে শ্রমিক নেতারা করতে সাহস পান তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না।

কাপুর কোম্পানি সেক্রেটারিকে ফোন করলেন। মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন, 'নোটিস দিয়েছিল দিন পনেরো আগে। গত দু' দিন ওরা কারখানায় এসে কর্মবিরতি করেছে, আজ সরাসরি ধর্মঘট।'

'ওদের দাবি কী?'

'এক্সপোর্টের প্রফিটের ওপর বিশ পার্সেন্ট কমিশন শ্রমিকদের দিতে হবে। খবরটা তো আপনার জানা উচিত!'

'মাই গড!' কাপুর রুমালে কপাল মুছলেন, 'এ রকম বোকার মতো দাবি ওরা কবে করেছে? কেউ তো আমাকে জানায়নি!'

'পনেরো দিন আগে। মিস্টার কাপুর আমার মনে হয় যেহেতু আপনি এক্সপোর্টের দায়িত্বে তাই জানি না বললে আপনার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন লেডি!' মিস্টার দাশগুপ্ত কথা বলে হাসলেন।

ফোন রেখে সোজা হয়ে বসেছিলেন কাপুর। লেডি চ্যাটার্জির সঙ্গে তার কথা হয়েছিল দুপুর বারোটায়। সে সময় তিনি প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং ধর্মঘটের কথা বলেছিলেন। তার পর এত অল্প সময়ের মধ্যে শ্রমিক নেতাদের নিয়ন্ত্রণ করে পনেরো দিন আগের নোটিস আনিয়ে আজ থেকেই ধর্মঘট চালু করার ক্ষমতা যে মহিলা দেখাতে পারেন তাঁর সঙ্গে লড়াই করা নিতান্ত বোকামি।

ঠিক রাত ন'টায় কাপুর টেলিফোন পেলেন, 'কাপুর, তুমি এখনও অফিসে কী করছ?'

লেডি চ্যাটার্জির গলা শুনে কাপুর বুঝল আর একটা খারাপ কিছু ঘটতে চলেছে। সাধারণ প্রয়োজন হলে ওঁর সেক্রেটারি ফোন করে জানায়।

'কাজ শেষ করলাম।' কাপুর বললেন।

'তোমার রেজিগনেশন লেটার পেয়েছি। ওই ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'

'বলুন।'

একটুকরো হাসি কানে এল, 'তুমি আগে বলতে, বলুন ম্যাডাম। ওয়েল,

তুমি আধঘণ্টার মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করো। আমি চ্যাটার্জি প্যালেসেই আছি।'

কাপুর ঘামতে লাগলেন। চ্যাটার্জি প্যালেসে তিনি এর আগেও কয়েকবার গিয়েছেন। স্যার অমলেশ প্রয়োজনে তাকে ডেকে পাঠাতেন। এখন ওই প্রাসাদে লেডি চ্যাটার্জি থাকেন ঝি-চাকর নিয়ে, একা। একমাত্র মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বোর্ডিং স্কুলে। অবিবাহিত কাপুর মাঝেমাঝেই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতেন। তার পক্ষে মহিলাসঙ্গ পেতে কোনও অসুবিধে হওয়ার কারণই নেই। তার চেহারা সুন্দর, সুগঠিত। বয়সও পঁয়ত্রিশের নীচে। কিন্তু ডাক্তার তাকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছিল। জন্মাবার পরই বাবা-মা ওকে নিয়ে চিন্তিত হয়েছিলেন। শিশুর লিঙ্গ অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষুদ্র। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন বয়স বাড়লে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু হয়নি। বারো বছর বয়সে একবার অপারেশন করা হয়েছিল কিন্তু তাতেও তেমন কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার তাকে বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে মানুষের অনেক কিছু করার আছে। সেই কাজগুলো শেষ করার সময় এক জীবনে পাওয়া যায় না। তুমি তাই করার চেষ্টা করবে। বিবাহিত জীবন তোমার জন্যে নয়। কারণ নিজেকে অক্ষম ভাবতে হবে প্রতিনিয়ত।' বারো বছর বয়সে যা ভাল বুঝতে পারেননি তা তরুণ বয়সে পরিষ্কার হয়েছিল। তারপর বিয়ে দূরের কথা, মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করতেন না, বরং এড়িয়ে যেতেন। প্রথম প্রথম আক্ষেপ থাকলেও এখন নিজেকে প্রতিবন্ধী হিসেবে ভেবেছেন তিনি।

গাড়ি থেকে নেমে চৌকিদার, দারোয়ান, চাকরদের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত লেডি চ্যাটার্জির নিজস্ব বসার ঘরে পৌঁছাতে পারল কাপুর। সে বুঝতে পারছিল তাকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ লেডি চ্যাটার্জি ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন ওদের।

মিনিট পাঁচেক চুপচাপ বসেছিল কাপুর। এই সময় একজন পরিচারিকা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জানাল, 'ম্যাডাম আপনাকে ওই ঘরে যেতে বললেন।'

ঘরটি দেখিয়ে দিয়ে পরিচারিকা চলে গেলে কাপুর দরজার পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। চার্চের ঘন্টার মতো একটা শব্দ খুব মৃদু বাজছে কোথাও। সুদৃশ্য সোফায় বসে আছেন লেডি চ্যাটার্জি। বললেন, 'এসো কাপুর, বসো।'

কাপুর উলটোদিকের সোফায় বসতেই চমকে উঠলেন। প্রতিদিন অফিসে

যাঁকে সে দেখছে তাঁর সঙ্গে কোনও মিল নেই এখনকার লেডি চ্যাটার্জির। শাঁখের মতো সুডৌল দুটো হাত দুই কাঁধ থেকে নেমে গেছে দু'পাশে। অনেকটা বুকের চাতাল দেখানো নীল সিল্কের পা ঢাকা রাত্রিবাস ওঁর পরনে।

'তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাইছ কাপুর?' নিজের নখ দেখছিলেন লেডি চ্যাটার্জি।

চুপ করে থাকলেন কাপুর।

'কোথায় যাবে?'

'আমি জানি না।' কাপুর উত্তর দিতে পারলেন।

'কিন্তু এখন মাদ্রাজের ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘট চলছে। ধর্মঘট চলছে বলে অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানি আমাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে না।' লেডি চ্যাটার্জি বললেন, 'আমি চাইছি তুমি কাল সকালে মাদ্রাজে যাও। ওদের ডিমান্ড নিয়ে কথা বলে মীমাংসায় এসো।'

'এ ব্যাপারে কি কথা শুরু হয়নি?'

'না। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই।'

'কিন্তু ওদের দাবি মেনে নিলে...'

'ক্ষতিপূরণ যা দিতে হত তার শতকরা একভাগ শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিলে দিয়ে দিলে ওরা খুশি হয়ে ধর্মঘট তুলে নেবে।'

'এ ব্যাপারে আপনি কি নিশ্চিত?'

'আমি খুব নিশ্চিত না হয়ে কথা বলি না।' হাসলেন লেডি চ্যাটার্জি, 'মাদ্রাজ থেকে ঘুরে এসো। তারপর যদি চলে যেতে চাও, যাবে। কিন্তু কোথায় যাবে?'

'আমি তো বললাম, জানি না।'

'তোমাকে আমি বকেছি কারণ সেটা তোমার পাওনা ছিল। অন্য কেউ হলে স্যাক করতাম। ওই ক্লজ দুটোর কথা যদি আমাকে আগে মনে করিয়ে দিতে তা হলে নিশ্চয়ই কিছু বলার দরকার হত না।'

'ম্যাডাম!'

'ইয়েস, বলো।'

'এত দ্রুত এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এটা কী করে সম্ভব হল।'

'দাশগুপ্ত ডিড এ গুড জব। ওয়েল, তুমি তো এখনও অবিবাহিত সুপুরুষ।' লেডি চ্যাটার্জি পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে হাসলেন, 'তোমার কোনও মেয়ে বন্ধু নেই?'

লজ্জা পেলেন কাপুর, 'নো, সময় পাই না।'

'গুড। অবশ্য তোমার উচিতও নয় কোনও মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা, তাই না?'

চমকে উঠলেন কাপুর। লেডি চ্যাটার্জি এই খবর পেলেন কী করে? জলন্ধরে তার বাল্যকাল কেটেছে, অপারেশন হয়েছিল লুধিয়ানায়, অত দিন আগের কথা কলকাতার কারও জানার কথা নয়।

'কাপুর। আই নিড ইওর লয়্যালিটি। তোমার রেজিগনেশন লেটার আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড।'

'কিন্তু।'

'কোনও কিন্তু নয়। কাল সকালে নতুন অর্ডার বেরুবে। তুমি মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসার পরে দাশগুপ্ত, এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের দায়িত্বে যাবে। ওর জায়গায় তুমি আসবে। কাল থেকে চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জির চিফ সেক্রেটারি হিসেবে তোমাকে প্রমোট করা হবে। আর ইউ হ্যাপি?'

'ইয়েস ম্যাডাম। কিন্তু মিস্টার দাশগুপ্ত?'

'ওঁর ব্যাপারটা আমাকে ভাবতে দাও। নাউ, এগিয়ে এসো, আমার হাতে চুমু খাও। এটা তোমার কর্তব্য।' হাসলেন লেডি চ্যাটার্জি।

এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে লেডি চ্যাটার্জির প্রসারিত বাঁ হাতের ওপর ঠোঁট রাখলেন কাপুর। দুই সেকেন্ডের জন্যে। তারপর মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সেই প্রথমবার চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব নাকচ হওয়ার পর চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জির জন্যে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন কাপুর। দাশগুপ্ত মনে করেছিলেন তাঁর ডিমোশন হয়েছে। সমস্ত চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জির সেক্রেটারির প্রতিপত্তি এক্সপোর্ট ইমপোর্ট সেক্রেটারির চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু লেডি চ্যাটার্জি তাঁর মাইনে অনেক বাড়িয়ে দিয়ে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দিলেন। দাশগুপ্তের না গিয়ে উপায় ছিল না। ওই টাকা তাঁকে অন্য কোনও কোম্পানি যে দেবে না তা তিনি জানতেন।

বছর খানেকের মধ্যে ঘটনাটা ঘটল। দাশগুপ্তের মাদ্রাজের ফ্ল্যাটে হঠাৎ আয়কর দফতর হানা দিল। তারা সেখানে পঁচিশ হাজার ইউ এস ডলার পেল যার কৈফিয়ত দাশগুপ্ত দিতে পারেননি। ফলে একই সঙ্গে আয়কর এবং 'ফেরা'র মামলায় জড়িয়ে পড়লেন দাশগুপ্ত। এই অবস্থায় তাঁকে বলা হল রেজিগনেশন দিতে। তা হলে তাঁর প্রাপ্য টাকা চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জি দিয়ে দেবে। আদালত যদি তাকে শাস্তি দেয় তা হলে কোম্পানি নিজের

সিদ্ধান্ত নেবে। দাশগুপ্ত পদত্যাগ করলেন। তাঁর জায়গায় লেডি চ্যাটার্জি মিস্টার শিবরামকৃষ্ণনকে নিয়োগ করলেন।

পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে মাঝরাতে কাপুরকে ফোন করলেন দাশগুপ্ত, 'কাপুর। এই মহিলার থেকে যত তাড়াতাড়ি পারো দূরে সরে যাও। শি ইজ এ বিচ্। পঁচিশ হাজার ডলার আমার অজান্তে ফ্ল্যাটে এসেছিল।'

কাপুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি ম্যাডামকে গালাগাল দিচ্ছেন কেন?'

'অস্ট্রেলিয়ার এক্সপোর্ট কেসটা তোমার মনে আছে? আমি কয়েক ঘন্টার মধ্যে ইউনিয়ন লিডারকে ম্যানেজ করেছিলাম ম্যাডামের অনুরোধে। ভেবেছিলাম ওটা করে আমি ওঁর প্রিয় হয়ে যাব। তাই গর্ব করে বলেছিলাম আমি ছাড়া কেউ পারত না। সঙ্গে সঙ্গে উনি স্থির করেছিলেন আমাকে সরিয়ে দেবেন। চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জিতে কেউ যদি ইমপর্টেন্ট হয়ে ওঠে তা হলে ম্যাডাম তাকে সহ্য করতে পারবেন না। কিন্তু ওঁকে একদিন এর মূল্য দিতে হবে।' দাশগুপ্ত বলেছিলেন।

দ্বিতীয়বার রেজিগনেশন লেটার লিখেও কাপুরকে ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছিল যেদিন কাবেরী হরপ্রীতকে বিয়ে করবে বলে জানিয়েছিল। খবরটা পাওয়া মাত্র ম্যাডাম কাপুরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

'কাপুর। তোমার সঙ্গে হরপ্রীত নামের ছোকরার সম্পর্ক কী রকম?'

'অনেক দূরের ম্যাডাম।'

'তুমি ওর সঙ্গে কাবেরীর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আমি ভেবেছিলাম কাবেরী একা থাকবে, পরিচিত কেউ শহরে থাকলে ওর সুবিধে হবে। আর হরপ্রীতকে আমার বেশ ভদ্র বিনয়ী বলে মনে হয়েছিল।'

'ভদ্র, বিনয়ী! হুঁ! তুমি নিশ্চয়ই জানো ওরা বিয়ে করছে।'

'বিয়ে? না ম্যাডাম! আমি জানি না।'

'কাবেরী আমাকে মুখের ওপর টেলিফোনে বলেছে যে ও অ্যাডাল্ট তাই যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। এই বিয়ে হোক আমি চাই না।'

'আমি চেষ্টা করব ম্যাডাম।'

'কীভাবে? ওখানে গিয়ে?'

'না। হরপ্রীতের বাবা-মাকে অনুরোধ করব।'

'তোমার ধারণা সে বাবা-মায়ের কথা শুনবে? বাঘ যেমন রক্তের ঘ্রাণ পেয়ে

খেপে ওঠে তেমনি হরপ্রীত জেনে গেছে কাবেরীকে বিয়ে করলে আমার উত্তরাধিকারী হতে পারবে। অবশ্য ও জানে না সেটা আমি কিছুতেই হতে দেব না। আর এই সবের জন্যে তুমি দায়ী। তোমার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা আমি ভাবছি। এখন তুমি যেতে পার।'

তখন সদ্য পঞ্চাশ পেরিয়েছেন কাপুর। তখনই তাঁর জুলপি সাদা হয়ে গিয়েছিল। যদিও লেডি চ্যাটার্জির শরীরে বয়স কোনও থাবা বসাতে পারেনি।

বাড়ি ফিরে এসেই রেজিগনেশন লেটার লিখেছিলেন কাপুর। নেহাতই ব্যক্তিগত কারণে তিনি পদত্যাগ করছেন বলে জানিয়েছিলেন। পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেওয়ার পর আবার তাঁর ডাক পড়েছিলেন রাত নটায়। সেই একই ঘরে বসেছিলেন লেডি চ্যাটার্জি। তাঁর পরনে যে পোশাক তা অন্তর্বাসকে স্বচ্ছন্দে প্রকট করছিল।

'বসো কাপুর।'

কাপুর বসলেন। লেডি চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি হুইস্কি খাও?'

'না ম্যাডাম।'

'এখন বস্টনে কটা বাজে?'

ঘড়ি দেখল কাপুর। বলল, 'সকাল সাড়ে এগারোটা।'

'কল দেম।' লেডি চ্যাটার্জি বললেন, 'ওই টেলিফোনের পাশের প্যাডে দুজনের নাম্বার লেখা আছে। আজ ওদের বাড়িতেই পাওয়া উচিত।'

কাপুর নাম্বার টিপলেন। প্রথমে হরপ্রীতের, 'কী বলব?'

'অদ্ভুত! আমাকে জিজ্ঞাসা করছ? টেল দেম, আমার কাছ থেকে যেন কিছু আশা না করে। বুঝতে পারছ!' লেডি চ্যাটার্জি চাপা গলায় বললেন।

'হ্যালো। হরপ্রীত! কাপুর আঙ্কল ফ্রম ক্যালকাটা। শুনলাম তুমি নাকি কাবেরীকে বিয়ে করছ! তোমাদের আলাপ আমিই করিয়ে দিয়েছিলাম। এ রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তোমার ভাবা উচিত ছিল যে কাবেরীর স্ট্যাটাস অনেক ওপরে। তুমি যদি মনে করে থাক কাবেরীকে বিয়ে করলে, চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জির মালিক হবে তা হলে তোমার চেয়ে মূর্খ পৃথিবীতে নেই। লেডি চ্যাটার্জি তাঁর মেয়েকে ত্যাজ্যকন্যা হিসেবে ঘোষণা করবেন শুধু তোমার জন্যে। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি কাবেরীর জীবন থেকে সরে যাও।' ওপাশ থেকে হরপ্রীত কী বললেন সেটা শুনে কাপুর রেগে গিয়ে বললেন, 'জাহান্নামে যাও।' তারপর রিসিভার নামিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, ছোকরা দেখছি খুব জেদি।'

'তুমি অনুরোধ করলে কেন? হোয়াই নট কম্যান্ড?'

'আমার সঙ্গে সে রকম সম্পর্ক নয়, ম্যাডাম।'

'হুঁ! কাবেরীকে ফোন করো।'

'কী বলব?'

'একই কথা। জানিয়ে দাও আমি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

কাপুর আবার টেলিফোনের বোতাম টিপলেন, 'কাবেরী, আমি কাপুর আঙ্কল, তুমি এ সময় বাড়িতে? ও হো, ভুলে গিয়েছিলাম আজ শনিবার, না, চান্স নিয়েছিলাম। কাবেরী, আমরা সবাই দুঃখিত হয়েছি তোমার সিদ্ধান্তের কথা শুনে। হরপ্রীত তোমার যোগ্য ছেলে নয়।' উত্তরটা শুনলেন কাপুর। তারপর বলল, 'কিন্তু এমন হতে পারে ও তোমার মায়ের বিপুল সম্পত্তির লোভে তোমাকে বিয়ে করতে চাইছে।'

উত্তরটা আবার শুনতে হল। কাপুর বললেন, 'হ্যাঁ, আমি জানি এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু এই বিয়ে করলে তোমার মা তোমাকে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন। প্লিজ ভেবে দ্যাখো। হ্যাঁ, উনি তোমাকে জানাবার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন।'

রিসিভার হাতে নিয়ে লেডি চ্যাটার্জির দিকে তাকালেন কাপুর। 'লাইন কেটে দিল।'

মাথা নাড়লেন লেডি চ্যাটার্জি, 'আত্মহত্যা করতে যাওয়ার সময় মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করে না। কিন্তু কাপুর, এবার তুমি চমৎকার কথা বলেছ। এ কারণেই তোমার রেজিগনেশন লেটারটা আমি ছিঁড়ে ফেলছি। তোমাকে আমার আরও কিছুকাল দরকার।'

ঢোঁক গিললেন কাপুর, 'আমি কি অন্য কোনও ভাবে হরপ্রীতকে আটকাবার চেষ্টা করব। বোস্টনের কয়েকজনকে আমি চিনি।'

'কথা বলে ওদের আটকানো আর যাবে না। একমাত্র রাস্তা হরপ্রীতকে সরিয়ে দেওয়ার। কিন্তু সেটা করে কোনও লাভ হবে না। এখন তুমি আসতে পারো। গুড নাইট।'

অতএব দ্বিতীয়বার পদত্যাগপত্র গৃহীত হল না।

আর কত বছর? খুব বেশি হলে দশ থেকে পনেরো। যত লড়াই করুন তিনি বার্ধক্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে হারিয়ে শরীরটাকে কব্জা করবেই। তখন চ্যাটার্জি

অ্যান্ড চ্যাটার্জির কী হবে? আজ রাত্রে এক পেগ দামি হুইস্কি নিয়ে লেডি কণিকা চ্যাটার্জি ভাবছিলেন। স্যার অমলেশ যেখানে শেষ করেছিলেন তার থেকে অন্তত বিশগুণ ব্যবসা তিনি বাড়িয়েছেন এতগুলো বছরে। স্যার অমলেশের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স কী এমন ছিল। সবে তিরিশ। শরীরটাকে উপভোগ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার এত প্রবল ছিল যে স্যার অমলেশ পাল্লা দিতে পারতেন না শেষ দিকে। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পরে কী আশ্চর্যজনক ভাবে নিভে গেল সব আগুন। অথচ তখন তিনি পূর্ণ যুবতী, কোটি কোটি টাকার মালিক। চাইলেই সব চাহিদা মেটাতে পারতেন। কিন্তু সেই পথে না হেঁটে দিন-রাত শুধু পরিশ্রম করে গিয়েছেন ব্যবসাটাকে বাড়াবার জন্যে। কোনও প্রলোভনে পা দেননি। মাঝে-মাঝে স্নানের ঘরে অথবা শূন্য বিছানায় শরীর জানান যে দেয়নি তা নয়। কখনও কখনও মনে হয়েছে কাপুরকে ডাকবেন। কাপুর সুদর্শন, অবিবাহিত, তার কাছাকাছি বয়সের। ওকে দিয়ে শরীরের আগুন নেভালে কেউ জানতে পারবে না। কাপুর হল ওয়ান মাস্টার্স ডগ। এত দিনে বুঝে গিয়েছেন তিনি যা বলবেন ও তাই করবে। তা ছাড়া তিনি ওর মুখের দিকে না তাকালে ও যে মুগ্ধ চোখে দ্যাখে সেটাও তাঁর জানা। কিন্তু সেই ইচ্ছেকেও আমল দেননি তিনি। কেন? কেন এই শরীরটাকে এখনও রোগমুক্ত রেখেছেন? কী জন্যে?

নিজের তৈরি নিয়ম ভেঙে আজ দ্বিতীয় পেগ নিলেন লেডি কণিকা চ্যাটার্জি। ছেলেটা মরে গেল। তিন বছরের ফুটফুটে ছেলেটা। কেন? ডাক্তাররা বলতেই পারল না। ছেলে হওয়ার পরে লেডি চ্যাটার্জির মনে হয়েছিল স্যার অমলেশের সঙ্গে যে প্রতারণা তিনি করেছিলেন তার প্রায়শ্চিত্ত করা হয়ে গেছে। ওরকম কুৎসিত মানুষকে এমন সোনার ছেলের বাবা হওয়ার সম্মান দিয়েছেন তিনি। এরপর আর ওই লোকটির সঙ্গে এক বিছানায় নয়। তাই ছেলেকে নিয়েই শুতেন তিনি। প্রথম দু' বছর পরিচারিকা থাকত পাশের ঘরে। রাত-বিরেতে ছেলে কেঁদে উঠলেই সে ছুটে আসত। তৃতীয় বছরে তার দরকার হয়নি। ছেলে বেশ চটপটে, টরটরে কথা বলে। ওর সঙ্গে থাকলে সময় দিব্যি কেটে যায়।

তারপর সেই রাতটা এল। মাঝরাতে ছেলে তাঁকে ডাকল, 'আমি টয়লেটে যাব।'

ঘুম জড়ানো গলায় তিনি বলেছিলেন, 'যাও।' তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মিনিট দশেকের মধ্যেই অস্বস্তি হতে চোখ মেললেন, ছেলে বিছানায়

ফিরে আসেনি। তিনি উঠলেন, টয়লেটের দরজা খোলা। ভেতরে যে নীল আলোটা সারা রাত জ্বলে সেটা জ্বলছে। ছেলের পেছন দিকটা দেখতে পেলেন। জল বিয়োগ করার ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি ডাকলেন 'কী হল?'

ছেলে মুখ ফেরাল। কিছু বলতে চাইল। তারপর ডান পা বাড়াতেই উলটে পড়ল। ছুটে গিয়ে তুললেন ওকে, বুঝলেন ছেলে পা ভাঁজ করতে পারছে না, হাঁটু শক্ত। ওকে কোলে তুলে বিছানায় শুইয়ে তিনি ছুটে গেলেন স্যার অমলেশের ঘরে।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে শহরের সব চেয়ে খ্যাতনামা নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হল ছেলেকে। ওই মধ্যরাতে বিখ্যাত ডাক্তাররা ছুটে এলেন। কিন্তু কিছুই হল না। ভোর পাঁচটায় ছেলের শরীর থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল। ডাক্তাররা বললেন, 'রিজন আননোন।'

জীবনে ওই প্রথম মৃত্যু এসে ধাক্কা দিয়েছিল তাঁকে। সেটা সামলাতে তিনি কিছুতেই পারছিলেন না। তখন স্যার অমলেশ সময় বের করে তাঁর পাশে থাকতেন। সান্ত্বনা দিতেন। তিন মাসের মাথায় এক রাত্রে ছেলের মুখ মনে পড়ায় গলায় কান্না এসে গেল। স্যার অমলেশ তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। কান্না গিলে ফেললেন তিনি। কিন্তু স্যার অমলেশ তাঁকে ছেড়ে না দিয়ে আদর করতে লাগলেন। সেই আদর শেষ পর্যন্ত স্নেহ-মমতায় সীমাবদ্ধ থাকল না। অদ্ভুত ব্যাপার, সেটা সংক্রামিত হল তাঁরও শরীরে। হঠাৎ মনে হল, আর একটি সন্তান এলে তিনি স্বাভাবিক হতে পারবেন। তাঁর আর একটি সন্তান দরকার।

মনে যত শোক থাক শরীরের নিজস্ব নিয়মগুলো তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। খিদেও পায়, টয়লেটেও যেতে হয়। তেমনই শরীরে সন্তান এল। ধীরে ধীরে আগের শোক হালকা হয়ে আসছিল, পেটে যে এসেছে তখন তাকে নিয়েই সব ভাবনা। সুন্দর সুন্দর গান শুনতেন, বই পড়তেন, ছবি দেখতেন আর ভাবতেন যে আসছে সে সর্বাঙ্গসুন্দর হবে। তারপর সেই দিনটা এল।

নার্সিং হোমে যন্ত্রণামুক্ত হয়ে যখন প্রায় অসাড় হয়ে আছেন তখন মনে হল চারপাশ চুপচাপ। ডাক্তার বেরিয়ে গেছেন, নার্সরা কথা বলছে না। খুব ভয় পেয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

'আপনার মেয়ে হয়েছে।' একজন নার্স কথা বলল।

এই সময় ওর কান্না শুনতে পেয়ে স্বস্তি পেলেন তিনি। এদের ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল যে শিশু জীবিত নেই। তিনি বললেন, 'ওকে দেখব।'

ধবধবে সাদা তোয়ালেতে জড়িয়ে যাকে নিয়ে এল নার্স চোখের সামনে

তার দিকে এক পলক তাকিয়ে ঝট করে মুখ সরিয়ে নিলেন তিনি। তার শরীর থেকে এই সন্তান পৃথিবীতে এসেছে। এত কালো যে মনে হচ্ছে কয়লার ডেলা। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের কথা মনে পড়ল। কান্না এল বুক নিংড়ে। চোখে হাত চাপা দিয়ে বললেন, 'সরিয়ে নিন, সরিয়ে নিন।'

তিনি যতই ওর সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে থাকুন না কেন, স্যার অমলেশ কিন্তু যতটা পারেন ততটা সময় মেয়েকে দিতেন। দু' বছর বয়স হওয়ার পর তাঁর কাছেই ঘুমাত মেয়ে। এই চ্যাটার্জি প্যালেসের অন্য প্রান্তে স্যার অমলেশ মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন যাতে ও তাঁর চোখের সামনে না আসে। রবীন্দ্রনাথের লাইন মনে আসে, রস বিকৃতির পীড়া সইতে পারি নে।

তাঁর মনে হত, ছেলে হওয়ার পর স্যার অমলেশ যতটা না খুশি হয়েছিলেন মেয়ে হওয়ার পর তার অনেক বেশি হয়েছেন। ছেলের শরীরের কোথাও তিনি ছিলেন না, মেয়ের সর্বাঙ্গে তিনি আছেন, ছেলের বেলায় নিজের প্রতিফলন না দেখতে পেয়ে একটিও কথা বলেননি স্যার অমলেশ কিন্তু এবারে তাঁর খুশির আতিশয্য দেখে মনে হচ্ছিল স্ত্রীর বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনও সন্দেহ তাঁর নেই।

এই ব্যাপারটাই লেডি কণিকা চ্যাটার্জিকে মেয়ের প্রতি আরও বিরূপ করে তুলেছিল। মেয়ে চার বছরে পৌঁছাতেই তিনি চাইলেন ওকে কোনও নামী বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিতে। দার্জিলিং অথবা মুসৌরিতে। স্যার অমলেশের এ ব্যাপারে অনিচ্ছা ছিল। মেয়ের দৈনন্দিন সম্পর্ক থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে তিনি প্রথমে রাজি হননি। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রীর অনুরোধ তো প্রায় আদেশের সমান। কাবেরীকে ভর্তি করিয়ে দিতে নিজে গেলেন স্যার অমলেশ দার্জিলিং-এ। বাল্যকালে ওই পাহাড়ে থাকায় কাবেরীর মনে দার্জিলিং একটা বিশেষ জায়গা নিয়েছিল। শহরে একটা বাড়ি ছাড়াও দার্জিলিং-এর পথে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন স্যার অমলেশ। মেয়েকে দেখতে গেলে সেখানে গিয়ে থাকতেন ক'দিন। ছুটিতে, বিশেষ করে শীতের ছুটিতে বাড়িতে আসত মেয়ে। তখন ওর জেদি হওয়ার বয়স। এক সকালে কারও বাধা না মেনে চলে এল তাঁর কাছে।

'তুমি আমার মা?' সোজাসুজি প্রশ্ন করল। তখন ওর সাত বছর বয়স।

'তোমার কী মনে হয়?' ঠোঁট টিপেছিলেন তিনি।

'সবাই বলছে যখন তখন তুমি আমার মা।'

'তা হলে জিজ্ঞাসা করতে এলে কেন?'

'তুমি কী উত্তর দেবে তাই শুনতে!'

'সবাই বলছে যখন তখন বোধহয় কথাটা সত্যি।'

'তা হলে তুমি অন্য মায়েদের মতো আমার কাছে আস না কেন? আমার হোস্টেলের মেয়েদের মায়েদের আমি দেখেছি। তাঁরা কত কী গিফট নিয়ে তাদের মেয়েদের দেখতে যান। তুমি যাও না কেন?'

'তোমার বাবা তো যান, একজন গেলেই হল।'

'না। তুমি সত্যি বলছ না।'

'মিথ্যে বলছি বলে মনে হচ্ছে?'

'না। মিথ্যেও বলছ না।'

'তা হলে?'

'তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। আমার গায়ের রং খুব কালো বলে তুমি আমাকে পছন্দ করো না। ঠিক কি না!'

'এ কথা তোমাকে কে বলেছে?' গম্ভীর হলেন লেডি চ্যাটার্জি।

'আমি বুঝেছি। কিন্তু বাবা কী বলেছে জানো?'

তাকালেন লেডি চ্যাটার্জি। তিনি লক্ষ করলেন মেয়েটার মুখের গড়ন খুব সুন্দর। দাঁতগুলো মুক্তোর মতো। কাবেরী বলল, 'কালো জগতের আলো। যাচ্ছি।'

আর একটা পেগ নিলেন লেডি চ্যাটার্জি। ঘড়িতে মধ্য রাত। এমন অনিয়ম তিনি কখনওই করেননি। আজকাল হুইস্কিতে কি অ্যালকোহল ঠিকঠাক থাকে? দুটো খেয়েও শরীরে কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না কেন?

কাবেরী আর হরপ্রীতের পুত্র সন্তান হয়েছে খবর পেয়েছিলেন একটু অদ্ভুত ভাবে। সেবার একটা বিজনেস ডিল ফাইন্যাল করতে ফিলাডেলফিয়াতে যেতে হয়েছিল। সঙ্গে কাপুর ছিলেন। একদিন গাড়িতে যেতে যেতে শাড়ি পরা আফ্রিকান মেয়েকে দেখতে পেয়ে কাবেরীর কথা মনে এল। অনেক দিন ওর খবর নেই, খবর দেওয়ার দায়ও ওদের নেই।

হোটেলে ফিরে এসে কাপুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাবেরীর টেলিফোন নাম্বার কোথায় পাওয়া যেতে পারে জানো?'

'চেষ্টা করতে পারি ম্যাডাম।'

'ওদের সম্পর্কটা কেমন আছে শুধু তাই জানার চেষ্টা করো।'

আধঘণ্টা বাদে কাপুর এসে বললেন, 'ওরা দুজনেই বাড়িতে নেই। একজন বেবিসিটার বাচ্চার জন্যে ওখানে আছে।'

'বাচ্চা?' অবাক হলেন লেডি চ্যাটার্জি।
'ওদের ছেলে।'
'আচ্ছা!'
'এখান থেকে বোস্টন বেশি দূরে নয় ম্যাডাম।'
'ভূগোলটা আমি তোমার থেকে কম জানি না কাপুর!'
কাপুর চুপ করে গিয়েছিলেন।

তৃতীয় পেগটা শেষ হল অথচ ঘুম আসছে না। ঘুমের ট্যাবলেট তিনি খান না, খেতে হয় না। ঘুম আসে স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু আজ কী হল? বিছানায় চলে গেলেন তিনি। এবং তখনই খেয়াল হল, পোশাক বদলাননি। ঘুমপোশাক ছাড়া বিয়ের পর কখনও বিছানায় শোননি। আবার নামলেন লেডি চ্যাটার্জি। পোশাক বদলালেন। বদলাবার সময় আয়নায় নিজেকে দেখলেন। শুকিয়ে আসছে শরীর। সত্তর পেরিয়ে গেলে বাঙালি মেয়েদের শরীরে কোনও রহস্য থাকে না। বাল্যকালে তাঁদের মালির বউকে দেখেছেন তিনি। নিশ্চয়ই সত্তর হয়নি সে তখন। কিন্তু বুকে জামা থাকত না আর সেই সঙ্গে লজ্জা বা সঙ্কোচ উধাও হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে ওর মেয়ে আসত বাচ্চাকে নিয়ে। নাতিটার বয়স এক কি দেড়। সে অবলীলায় দিদিমার বুক খুঁটত। মালি বউয়ের তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। ওদের চোখে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বলে মনে হত না।

কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে সবই যে আলাদা। এই সত্তর পেরিয়ে যাওয়া শরীরে শীতের ছোঁয়া লাগলেও বুক এখনও ভারী। একেবারে নিম্নমুখী নয়। এখনও তলপেটে চর্বি জমেনি। এই শরীরটাকে এমন ভাবে সাজিয়ে রেখে কী লাভ হল। চোখ বন্ধ করলেন লেডি চ্যাটার্জি। স্যার অমলেশের মৃত্যুর অন্তত আট বছর আগে শেষ বার শরীরটা আনন্দ পেয়েছিল। কত দিন হয়ে গেল? মাথা নাড়লেন তিনি। নাঃ, এর জন্যে আফসোস করে কী হবে? আনন্দিত হতে চাইলে কোনও না কোনও পুরুষকে প্রশ্রয় দিতে হত। কে বলতে পারে, সেক্ষেত্রে সেই পুরুষ তাঁকে গ্রাস করে নিত কি না। অন্য পুরুষের স্ত্রী হলে তিনি আর লেডি চ্যাটার্জি থাকতেন না। চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জি আজ বিশ্বপর্যায়ে উঠে আসত না।

দরজায় মৃদু শব্দ বাজল। খুব জরুরি কিছু না ঘটলে এত রাত্রে তাঁর

শোওয়ার ঘরে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। এই ঘরে টেলিফোনের লাইন রাখেননি। এখানে চলে এলে লেডি চ্যাটার্জি বিরক্ত হতে চান না। ভাবলেন শব্দটাকে উপেক্ষা করবেন। কিন্তু মত বদলালেন। অকারণে কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে সাহস করবে না। নিচু স্বরে বললেন, 'কাম ইন।'

পরিচারিকা দরজায় এল, লেডি চ্যাটার্জিকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়েই মুখ নামাল! 'মিস্টার কাপুর ফোন করেছেন।'

'কারণ?'

'বললেন, হঠাৎ জরুরি সমস্যা হয়েছে। তবে আপনি যদি ঘুমিয়ে পড়েন তা হলে না ডাকতে। আপনি কি টেলিফোন ধরবেন?' পরিচারিকা বললেন।

'নিয়ে এসো।'

দ্রুত কর্ডলেস রিসিভার চলে এল তাঁর হাতে, 'কী ব্যাপার?'

'সরি ম্যাডাম। আপনার ঘুম ভাঙানোর জন্যে খুব দুঃখিত। আমি অবশ্য ওদের বলেছিলাম আপনি ঘুমিয়ে পড়লে না ডাকতে।'

'কাপুর। কেন ফোন করেছ?'

'একটা খারাপ খবর আছে।' কাপুর বললেন।

লেডি চ্যাটার্জি চুপ করে থাকলেন।

'একটু আগে পুলিশ তৃণাকে অ্যারেস্ট করেছে।' কাপুর বলল।

লেডি চ্যাটার্জি কোনও শব্দ উচ্চারণ করলেন না।

কাপুর জানালেন, 'ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটা গাঁজার আড্ডা থেকে দু'জন বিদেশির সঙ্গে ওকে পুলিশ ধরেছে।'

'তুমি জানলে কী করে?' প্রথম প্রশ্ন।

'দীপ আমাকে টেলিফোন করেছিল। এখনও ওদের লোকাল থানায় রেখেছে।'

'দীপ?'

'তৃণার হাজব্যান্ড। পুলিশ ওকে ধরতে পারেনি।'

'কাপুর, এত রাত্রে আমাকে বিরক্ত করার জন্যে এই খবরটাকে সাফিসিয়েন্ট বলে মনে করো।"

'আমার মনে হয়েছে ম্যাডাম।'

'তুমি জানো আমি ওই বখে যাওয়া মেয়েটার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড নই।'

'জানি ম্যাডাম। কিন্তু সাংবাদিকদের ভয়ে আমি বাধ্য হয়েছি আপনাকে বিরক্ত করতে। কাল সকালের কাগজেই লেখা হতে পারে ব্যাপারটা! আপনার

নাম নিশ্চয়ই আনন্দের সঙ্গে ব্যবহার করবে ওরা।' কাপুর বললেন।

'আই সি। তুমি আমাকে দশ মিনিট পরে ফোন করো।'

জরুরি টেলিফোন নাম্বার লেখা ডায়েরিটা খুললেন লেডি চ্যাটার্জি। তারপর বিশেষ একটি নম্বর দেখে ডায়াল করলেন। ওপাশ থেকে সাড়া এল।

'আমি কণিকা চ্যাটার্জি বলছি। বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।'

'নো নো। হোয়াট এ সারপ্রাইজ! ইটস মাই প্লেজার লেডি। বলুন, আপনার জন্যে কী করতে পারি।'

'রক্তসূত্রে যে আমার নাতনি, যাকে আমি ডিজওন করেছি, সে এখন থানায়। পুলিশ ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটি গাঁজার আড্ডা থেকে ওকে অ্যারেস্ট করেছে। আমি চাই না খবরটা আগামীকালের কাগজে ছাপা হোক।'

'আপনি দু' মিনিট ফোনটা ধরে থাকবেন, প্লিজ।'

রিসিভার হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে আজকাল আর অভ্যস্ত নন লেডি চ্যাটার্জি। তবু করতে হল। মিনিট সাড়ে তিনেক বাদে ভদ্রলোকের গলা পাওয়া গেল, 'কিন্তু লেডি, মেয়েটি যে আপনার নাতনি সে ব্যাপারে আপনি কি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু পুলিশকে মেয়েটি বলেছে তার নাম পৃথা দত্ত। এখনও ওকে জেরা করা হয়নি। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ গাঁজা খাওয়া, ওর সঙ্গী বৈদেশিকদের কাছে ড্রাগ পাওয়া গিয়েছে। অতএব সাংবাদিকরা এখনও ওর ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে পারেনি।'

'কিন্তু জানতে পারবে।' লেডি চ্যাটার্জি বললেন।

'ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছি।'

'শুনুন। আমি কখনও কারও কাছ থেকে ফেভার নিইনি। আপনার উপকার আমি মনে রাখব।' লেডি চ্যাটার্জি বললেন।

'থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। তবে থানা থেকে খামোকা ছেড়ে দিলে কথা উঠবে। ওকে জেরা করার জন্যে আমার অফিসে আনাচ্ছি। আসার পথে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে ও নেমে যেতে পারে। কারণ তখন ডিপো ড্রাইভার আর সেপাই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাবে।' হাসলেন ভদ্রলোক।

'গুড নাইট।'

লোকটাকে এর বদলে কিছু দিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে টাকা পয়সা ও চাইবে না। ও চাইবে আরও উঁচুতে উঠতে। সেই ওঠার কাজে সাহায্য করতে হবে।

আর এটা করতে হচ্ছে ওই নচ্ছাড় মেয়েটার জন্যে। ফোন বাজল।

'হ্যালো। কাপুর, তুমি এখনই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে চলে যাও। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে একটা পুলিশের জিপ থেকে নেমে পালাবার চেষ্টা করবে। ওকে ধরে তোমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবে। বুঝেছ?'

'আমার ফ্ল্যাটে?' কাপুর অবাক।

'হ্যাঁ। তুমি নিজে যাবে, কাউকে পাঠাবে না।'

'কিন্তু ও যদি আসতে না চায়।'

'জিপ থেকে পুলিশরা নেমে গেলেই তুমি কাছে গিয়ে ডাকবে। তোমাকে দেখে ভরসা পেয়ে তোমার গাড়িতে উঠে বসবে। ফ্ল্যাটে নিয়ে এসে ঘুমের ওষুধ কফিতে মিশিয়ে খাইয়ে দেবে। আর হ্যাঁ, দোহাই, আজ রাত্রে আমি আর কোনও টেলিফোন চাই না। গুড নাইট।'

দীপ ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। রাত বারোটা বেজে গেল। অনেকক্ষণ সে থানার কাছাকাছি একটা বন্ধ দোকানের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। কাপুরকে ফোন করার পর ভেবেছিল সঙ্গে সঙ্গে লোকটা থানায় এসে তৃণাকে ছাড়িয়ে বের করে আনবে। কিন্তু কাপুর আসেনি। তাই সে ঘণ্টাখানেক আগে সামনের এস টি ডি বুথ থেকে ফোন করেছিল কাপুরকে। কাজের লোক তার নাম শুনেই বোধ হয় বলেছে সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছেন। তার মানে খবরটা লেডি কণিকা চ্যাটার্জির কাছে পৌঁছায়নি। এখন দীপের মনে হল খবরটা শুনলেও ভদ্রমহিলা আমল দিতেন না। নাতনির প্রতি তাঁর কোনও দায় নেই।

নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল খুব। বিকেলবেলায় নিউমার্কেটে যখন ওই ইতালিয়ানদের সঙ্গে পরিচয় হল এবং জানল ওরা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে উঠেছে তখনই মনে হয়েছিল ওদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। ভাল ট্যুরিস্ট কখনও ওই এলাকায় থাকে না। হয় অতি দরিদ্র নয় ড্রাগ খাওয়া লোকজনই এলাকাটাকে পছন্দ করে। ওরা ওদের ডেরায় নিয়ে গেল। হোটেল নয়, একটা প্রাচীন বাড়ির অনেকগুলো ঘর শুধু ওই রকম বিদেশিদের ভাড়া দেওয়া হয়। একটা ঘরে ওরা থাকে। গাঁজা বের করেছিল তৃণাই। দুটো টান দেওয়ার পর ইতালিয়ানদের মধ্যে যার বয়স বেশি সে হাত বাড়িয়ে নিয়ে এত জোর টানল যে সিগারেট অর্ধেকের নীচে নেমে এল। তখনই সে তৃণাকে ইশারা করেছিল বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। তৃণা শোনেনি। শেষ পর্যন্ত বাংলায় বলেছিল, 'তৃণা, এই জায়গাটা ভাল লাগছে না, চল, কেটে পড়ি।'

তৃণা হেসেছিল, 'দূর, তুই একটা ডরপোক। গাঁজা খা।'

'না। তুই ওঠ।'

'দশ মিনিট পরে।'

'আমি নীচ থেকে ঘুরে আসছি।' কথাটা বলেছিল সে অভিমানে। ভেবেছিল সে নীচে নেমে গেলেই তৃণাও নামবে। নীচে নেমে কয়েক পা হাঁটতেই পুলিশের ভ্যানটাকে গলিতে ঢুকতে দেখল সে। ঠিক ওই বাড়িটায় পুলিশগুলো ঢুকে গেল ভ্যান থেকে নেমে। আর তার মিনিট তিনেকের মধ্যে দুই ইতালিয়ান আর তৃণাকে শক্ত করে ধরে পুলিশগুলো ভ্যানে তুলল, তৃণা চিৎকার করছিল, 'দীপ, হেল্প মি দীপ, দীপ।'

কিন্তু দীপ কথা বলতে পারেনি। সে বুঝেছিল তখন কথা বলে কোনও লাভ হত না। সে যদি নীচে না নামত তখন তা হলে তাকেও ভ্যানে তুলত ওরা। তৃণার চিৎকারটা তার কানে পাক খাচ্ছিল। সে স্থানীয় থানায় ছুটে গিয়েছিল কিন্তু ভেতরে ঢুকতে সাহস পায়নি। ভ্যানের পুলিশগুলোকে থানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করতে দেখেছিল। তারপরই প্রথম ফোন করেছিল কাপুরকে।

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মুখ ফেরাতেই সে তৃণাকে দেখতে পেল। একটা পুলিশ ওকে নিয়ে জিপে উঠছে। ওকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। কোথায়। ড্রাইভার জিপ চালু করে দীপের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। মরিয়া হয়ে ট্যাক্সির খোঁজ করছিল দীপ। আশ্চর্য! আশেপাশে একটিও ট্যাক্সি ছিল না।

এই বৃদ্ধ বয়সে ফ্ল্যাট থেকে ভিক্টোরিয়ার দিকে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় তৃতীয়বার কাপুরের মনে হল পদত্যাগ করার কথা। এর আগের বার লেডি চ্যাটার্জি তাঁকে সম্মোহন করেছিলেন। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ওঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়েছিল। এবার আর নয়। এখন তাঁর আরাম করার কথা। শুধুই বিশ্রাম। তা না করে রাত দুপুরে বেরুতে হচ্ছে একটা বয়ে যাওয়া মেয়েকে পুলিশের কাছ থেকে ফেরত আনতে। তা না করলে চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জির বদনাম হয়ে যাবে। স্যার অমলেশের আত্মা দুঃখিত হবে। হ্যাঁ, ওই মানুষটির কাছে কাপুর ঋণী। ব্যবসায়ী কিন্তু একশো ভাগ ভদ্রলোক ছিলেন তিনি। অবশ্য লেডি চ্যাটার্জির ক্ষমতা যে স্বামীর চেয়ে অনেক বেশি তা তিনি প্রমাণ করেছেন। কিন্তু ভদ্রমহিলাকে একশো ভাগ ভদ্রমহিলা বলা কি যায়? চশমাটা পালটানো দরকার। বহুকাল পরে রাত্রে গাড়ি চালাতে গিয়ে টের পেলেন

পাওয়ার বেড়েছে। নাঃ, আর নয়। কালই পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেবেন তিনি। বলবেন, তাঁর শরীর আর কাজ করার পক্ষে সক্ষম নয়।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনেটা এখনও সুনসান নয়। কিছু গাড়ি ওপাশে, মাঠের গায়ে লাগানো। একটা ফুচকাওয়ালা সেখানে ব্যস্ত। গাড়িতে বসে হাই তুলছিলেন কাপুর। প্রায় পৌনে একটার সময় পুলিশের জিপটাকে দেখতে পেলেন। ধীরে ধীরে গাড়িটা মূল গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। একজন পুলিশ জিপ থেকে নেমে বলল, 'শালা এখনও এখানে পাবলিক। একটু বেশি হাঁটতে হবে জল ফেলতে।'

ড্রাইভারও নেমে পড়ল, 'চল, আমিও যাব।'

ওরা দুজন রাস্তা পার হয়ে মাঠের দিকে যেতে কাপুর গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত চলে এলেন জিপের কাছে। অন্ধকারেও তিনি তৃণাকে দেখতে পেলেন। চুপচাপ বসে আছে। নিচু গলায় বললেন, 'তৃণা, নেমে এসো। কুইক।'

'কাপুর আঙ্কল!'

মাও তাঁকে এই সম্বোধন করত। মেয়ে শিখেছে মায়ের মুখে শুনে। কাপুর বললেন, 'কুইক। ওরা ফিরে আসার আগে নেমে পড়ো।'

আর বলতে হল না। লাফিয়ে নামল তৃণা। মিনিট খানেকের মধ্যেই গাড়ি রেসকোর্স ছাড়িয়ে চলে এল। তৃণা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কী করে জানলে ওরা আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে? ওরা তো নাও নামতে পারত!'

'দ্যাটস লাক। ঘুম আসছিল না বলে ভিক্টোরিয়ায় গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি পুলিশের জিপে তুমি বসে আছ।'

'আমি না কিছুই করিনি। তবু জোর করে পুলিশ আমাকে ধরেছে।'

'আমার ভয় হচ্ছে, এটা শোনার পর তোমার হাতখরচের টাকাটা বন্ধ করে দেবেন ম্যাডাম।' কাপুর বললেন গাড়ি চালাতে চালাতে, 'তুমি পুলিশকে নিজের নাম নিশ্চয়ই বলেছ। ওরা তোমার খোঁজে নিশ্চয়ই যাবে!'

শব্দ করে হাসল তৃণা, 'তুমি আমাকে অত বোকা ভাব?'

'মানে?'

'নিজের নাম কেন বলব? ফলস নাম, ফলস অ্যাড্রেস দিয়েছি। ওরা জিন্দেগিতে খুঁজে পাবে না। তোমাদের লেডি টেরিবল জানতেও পারবে না।'

লেডি টেরিবল। হাসলেন কাপুর। একেবারে সঠিক নাম দিয়েছে মেয়েটা। কিন্তু তার পরেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি যে হেসেছেন এই খবরটাও ভদ্রমহিলার কানে চলে যেতে পারে।

'তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'আমার ফ্ল্যাটে।' বিপদের গন্ধ পেলেন কাপুর। এবার ঝামেলা শুরু করবে।

'কেন? তুমি আমাকে আমার ঘরে পৌঁছে দাও।' তৃণা চেঁচাল।

'লুক তৃণা, তুমি কি আবার পুলিশের হাতে পড়তে চাও?'

'না।'

'এখন তোমাকে নিয়ে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলেই বিপদে পড়তে হবে। তুমি যে ওদের জিপ থেকে পালিয়ে গিয়েছ এই খবর সমস্ত পুলিশ বাহিনী জেনে গিয়েছে। ওরা এতক্ষণে তোমার খোঁজে নেমে পড়েছে। মাথা নামাও, সামনে পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে।'

দূরে দাঁড়ানো একটা টহলদারি জিপ দেখে দ্রুত মাথা নামাল তৃণা।

লিফটে ওঠার পর তৃণা বলল, 'তুমি কাউকে পাঠিয়ে ওকে খবর দিতে পারবে?'

'কাকে?'

'দীপকে!'

'তোমাকে যখন পুলিশ ধরে সে তখন কোথায় ছিল?'

'নীচে নেমে গিয়েছিল পুলিশ আসার একটু আগে।'

'তারপর থেকেই তো সে বেপাত্তা। তোমার খোঁজ নিয়েছে? থানায় গিয়ে তোমায় ছাড়াবার চেষ্টা করেছে? অথচ তাকে খবর দেওয়ার জন্যে তুমি ব্যস্ত হয়েছ!' কাপুর বললেন।

ফ্ল্যাটে ঢুকে কাপুর কফি বানাতে বললেন কাজের লোককে। তারপর খেয়াল হতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডিনার নিশ্চয়ই করনি। খিদে পেয়েছে?'

'না।'

'তৃণা, এভাবে নিজেকে নষ্ট করছ কেন?'

'তুমি আমাকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করেছ বলে জ্ঞান দেওয়ার অধিকার পাওনি।' তৃণা উঠে দাঁড়াল, 'আমি স্নান করব।'

কাপুর ওকে ওঁর বেডরুমের লাগোয়া বাথরুম দেখিয়ে দিলেন। তৃণা ঢুকে গেল।

ওকে যে তাঁর ফ্ল্যাট পর্যন্ত আনতে পেরেছেন ওই খবরটা ম্যাডামকে দেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। কিন্তু আজ রাত্রে ওঁকে বিরক্ত করা নিষেধ বলে ফোন করলেন না। মেয়েটা এখনও ত্যাঁদোড়। কৃতজ্ঞতা বলে কোনও বোধ নেই।

কফি নিয়ে এল পরিচারিকা। কাপুর তাকে বললেন তৃণার কাপ ঢেকে রেখে যেতে। মিনিট সাতেক পরে তৃণা যখন এ ঘরে এল তখন তাকে দেখে কাপুরের চোখ কপালে উঠল। একটা লম্বা তোয়ালেকে শাড়ির মতো জড়িয়ে পরার চেষ্টা করেছে তৃণা। মাথায় একটা ছোট তোয়ালে জড়িয়েছে। পরনের তোয়ালে তার হাঁটুর অনেকটা ওপর পর্যন্ত ঢাকতে পেরেছে।

কাপুর ব্যস্ত হলেন, 'এখানে মেয়েদের পোশাক নেই, তোমাকে একটা গাউন দিতে পারি।'

'দরকার নেই।' পা মুড়ে সোফায় বসল তৃণা।

'তোমার কফি।'

ঢাকনা খুলে কাপ এগিয়ে দিলেন কাপুর।

'আমি কাল ভোরে এখান থেকে চলে যাব।' কাপ হাতে নিল তৃণা।

'বেশ।'

'আমি যে এখানে এসেছি তা যেন লেডি টেরিবল না জানে!'

'সিওর।'

হঠাৎ মুখ তুলল তৃণা, 'আচ্ছা, তুমি বিয়ে করনি কেন?'

হাসলেন কাপুর, 'কফি খাও।'

কফিতে চুমুক দিল তৃণা, 'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছ?'

'মিস টেরিবলের ভয়ে। ভয়ই পেয়ে গেলে, প্রেম করতে পারলে না। তুমি কেন, কেউ পারেনি। আসলে ওর ভেতরটা মরুভূমি; প্রেম কী করে থাকবে?' তৃণা বলল কফি খেতে খেতে। কাপুর ওর দিকে চোখ রাখতে পারছিলেন না। থাই তো বটেই, কোমরের অনেকটাই এখন দেখা যাচ্ছে। মেয়েটার শরীর এবং গায়ের রং প্রায় ওর দিদিমার মতো, শুধু পরিচর্যার অভাবটাই ফারাক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'আমার এত ঘুম পাচ্ছে কেন?' তৃণার গলা এবার জড়ানো।

'ঘুমিয়ে পড়ো। আমার বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়।'

'তুমি?'

'আমি এই ডিভানে শুচ্ছি।'

'কেন? তুমি তো যুবক নও, বৃদ্ধ, বুড়ো মানুষ। তুমি এক বিছানায় শুতেই পারো।' টলতে টলতে তৃণা চলে গেল বেডরুমে।

ওষুধটায় কাজ এত দ্রুত হবে ভাবেননি কাপুর।

একটি কাজের লোক এই ফ্ল্যাটে থাকে। তার ঘর উলটোদিকে। তাকে ডেকে কাপ দুটো নিয়ে যেতে বললেন। বললেন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়তে।

সে চলে গেলে ডিভানে শরীর এলিয়ে দিতে গিয়ে থমকে গেলেন। তৃণা নিশ্চয়ই আলো নেভাবে না। অতএব তিনি বেডরুমের দরজায় পৌঁছে গেলেন। গিয়ে মনে হল তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। অনেক চেষ্টায় নিজেকে সহজ করলেন তিনি। উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়েটা একদম বিবস্ত্র হয়ে শিশুর মতো নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছে। কাছে গেলেন কাপুর পা টিপে টিপে। ওর মুখে এখন অদ্ভুত সারল্য। বিদ্রোহী ভাবটা কোথাও নেই। ওর শরীরটাকে দেখলেন কাপুর চোরের মতো। এত যৌবন কোনও মেয়ের থাকতে পারে! খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে ছুঁয়ে দেখতে। এই বার্ধক্যে পৌঁছে সত্যিকারের নারী-শরীর দেখলেন তিনি মন ভরে। কিন্তু ছুঁতে ভয় করল। যদি তৃণার ঘুম ভেঙে যায়?

আলো নিভিয়ে পাশের ঘরের ডিভানে চলে এলেন তিনি। শুয়ে পড়ামাত্র মনে হল আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও যদি এরকম একটা শরীর পাশের ঘরে থাকত তা হলেও চলে আসতে হত তাকে। ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিয়েছেন জন্মাবার সময় থেকেই। হঠাৎ কান্না এল। নিজের জন্যে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন কাপুর।

কাপুরের ঘুম ভাঙল ঠিক সকাল ছটায়। টেলিফোনের শব্দে।

রিসিভার তুলতেই কানে এল, 'গুড মর্নিং কাপুর।'

'গুড মর্নিং ম্যাডাম।'

'সে কী করছে?'

'আমি, আমি ঘুমাচ্ছিলাম, দেখে এসে বলছি——।'

'শোনো, ওর সঙ্গে কোনও ব্যাগ আছে?'

'না ম্যাডাম।'

'ওকে তুমি কতক্ষণ আটকে রাখতে পারবে?'

'আমি চেষ্টা করব, মানে, যতক্ষণ পারা যায়——।'

'ওয়েল, তুমি দেখে এসো——.'

'আমি কি আপনাকে ফোন করব?'

'না, আমি অপেক্ষা করছি।'

কাপুর উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে গতরাতে দেখা দৃশ্যটি মনে পড়ল তাঁর। তৃণা কি এখনও বিবস্ত্র হয়ে শুয়ে আছে? ভুল হয়ে গেছে, গত রাতেই ওর শরীর

একটা চাদরে ঢেকে দেওয়া উচিত ছিল। আর ইতস্তত না করে কাপুর পাশের ঘরে ঢুকলেন।

বিছানায় কেউ নেই। তার মানে তৃণার ঘুম ভেঙে গেছে। বন্ধ বাথরুমের দরজা দেখলেন তিনি। তারপর সেই দরজায় নক করলেন। কোনও শব্দ নেই। নাম ধরে দু'বার ডেকেও কোনও সাড়া পেলেন না। একটু চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল।

বাথরুমে কেউ নেই। মেয়েটা গেল কোথায়? তারপর খেয়াল হতেই বুঝতে পারলেন তৃণা যে পোশাক এখানে ছেড়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল সেগুলো নেই। তার মানে মেয়েটা চলে গিয়েছে। ঝটপট অন্য ঘরগুলোয় খুঁজলেন কাপুর। কাজের লোকটি সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে কেউ কিছু বলে গেছে?'

মাথা নাড়ল লোকটি, 'না সাহেব।' ব্যালকনিতে চলে গেলেন কাপুর। অনেক নীচে ভোরের রাস্তা। দু'-চারজন মানুষ, একটা দুটো গাড়ি। এখন কী কৈফিয়ত দেবেন তিনি।

ফিরে এসে রিসিভার তুললেন, 'হ্যালো।'

'আমার মনে হচ্ছে, এত সময় লাগল যখন, তুমি ওকে খুঁজে পাওনি।' লেডি কণিকা চ্যাটার্জি শীতল গলায় বললেন।

'হ্যাঁ, ম্যাডাম।'

'অথচ কাল তুমি ঘুমের ওষুধ দেওয়ায় ও ঘুমিয়ে পড়েছিল।'

'হ্যাঁ ম্যাডাম।'

মৃদু শব্দে হাসলেন ম্যাডাম, কাপুরের কানে তা সাপের ছোবল বলে মনে হল।

'তোমার কৈফিয়ত কী?'

'ম্যাডাম, আমার বয়স হয়ে গিয়েছে। আমাকে এবার ছেড়ে দিন। আমি আজই রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দিচ্ছি।' কাপুর অনুনয় করলেন।

'অবশ্যই, একজন অপদার্থ মানুষকে আমি আমার পাশে রাখতে চাই না।' লাইনটা কেটে দিলেন মহিলা। কয়েক সেকেন্ড রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে থাকলেন কাপুর।

অপদার্থ! প্রায় পঞ্চাশ বছরের বিশ্বস্ততার বিনিময়ে কথাটা শুনতে হল। রিসিভার নামিয়ে রেখে কাপুর সোফায় বসলেন। এই ঘরে এখন বাসি গন্ধ ভাসছে, ঠিক তাঁর জীবনটার মতো। যাক, শেষ পর্যন্ত শেকড় ছিঁড়ল, এখন তিনি

মুক্ত। কিন্তু মুক্তির পরে কোথায় যাবেন? ভাবতে হবে। এই কলকাতায় আর থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা অপরাধবোধ কাজ করে যাচ্ছিল তাঁর। তৃণা যে এমন কাণ্ড করতে পারে তা তাঁর কল্পনায় ছিল না। সত্যি তো, আর একটু সতর্ক থাকা উচিত ছিল তাঁর। অবশ্য, তৃণা যদি তাঁর জেগে থাকা অবস্থায় বেরিয়ে যেতে চাইত তা হলে তিনি কী করে ওকে আটকাতেন?

অভ্যেসে স্নান ব্রেকফাস্ট শেষ করেছিলেন কাপুর। এখন সকাল সওয়া ন'টা। গতকালও এই সময় তিনি অফিসে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু আজ কোথাও যাওয়ার নেই। তাঁর জায়গায় যাঁকে ম্যাডাম দায়িত্ব দেবেন তাঁকে কিছু ফাইল বুঝিয়ে দিতে হবে। সে রকম অনুরোধ এলে তবেই তিনি অফিসে যাবেন। নইলে আর ওমুখো নয়।

বেল বাজল। কাজের লোক গেল দরজা খুলতে। তারপরেই তৃণাকে দেখলেন তিনি। দ্রুত ঘরে ঢুকে তার সামনে এসে দাঁড়াল, 'দীপ কোথায়?'

'আমি কী করে জানব?' কাপুর অবাক।

'মিথ্যে বলবে না। তুমি লোক পাঠিয়ে কাল রাত্রে ওকে ডেকে এনেছ।' তৃণার গলার স্বর এখন বেশ উঁচুতে।

'সরি তৃণা, আমি কাউকে ডাকিনি।'

'আমি ঘরে গিয়ে দেখলাম দরজায় তালা বন্ধ। শুনলাম কাল রাত্রে একটা গাড়ি এসেছিল। একটা লোক দীপের খোঁজ করে। ওরা শুনেছে লোকটা দীপকে বলেছে ওকে কাপুর সাহেব পাঠিয়েছেন জরুরি দরকারে। শোনামাত্র দরজায় তালা দিয়ে দীপ ওই লোকের সঙ্গে চলে গিয়েছে। কোথায় সে?' তৃণা প্রায় ক্ষিপ্ত।

কাপুর মাথা নাড়লেন, 'তৃণা, তুমি মনে করার চেষ্টা করো। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি একবারও আলাদা হইনি। আমি কী করে লোক পাঠাব? পাঠালে তোমাকে জানিয়ে ওকে এই বাড়িতে নিয়ে আসতাম।'

তৃণা চিন্তা করল। তারপর বলল, 'লোকটা দেড়টার পরে গিয়েছিল।'

'তখন তো আমি আর তুমি এখানে, এই ফ্ল্যাটে।' মাথা নাড়লেন কাপুর।

'তা হলে কে তোমার নাম করে গিয়েছিল? কে পাঠিয়েছিল?'

'আশ্চর্য! আমি কী করে বলব!'

তৃণার মনে হল এই বৃদ্ধ সত্যি কথা বলছেন। দীপের খবর পেতে হলে এঁর সাহায্য দরকার। সে সোফায় বসল, 'যারা ওকে নিয়ে গেছে তারা যদি ওকে মেরে ফেলে?'

'মারবে কেন? ও কি অন্যায় করেছে?'

'আমি জানি না। তা হলে তোমার নাম করে মিথ্যে বলবে কেন? কাপুর আঙ্কল, আমাদের উচিত পুলিশকে জানানো। একমাত্র পুলিশই ওকে খুঁজে বের করতে পারে।' কাপুরের হাত ধরল তৃণা। শীতল হাত।

'পুলিশ? তুমি পুলিশের কাছে যাবে?' কাপুর তাকালেন।

'আমাদের পাড়ার পুলিশ তো কাল আমায় ধরেনি। তা ছাড়া নামটাও তো ভুল বলেছি। আমি তো আর কালকের পুলিশের কাছে যাচ্ছি না!' তৃণা বলল।

'পুলিশরা সব এক। ঠিক ধরা পড়ে যাবে। ওরা যদি জানতে পারে তুমিই জিপ থেকে পালিয়েছ তা হলে কড়া শাস্তি পাবে।' কাপুর বললেন।

'উঃ। তা হলে আমি কী করি!' মুখ ঢাকল তৃণা দুই হাতে। তারপর একটু ভেবে বলল, 'তুমিই যাও না। প্লিজ।'

'আশ্চর্য! পুলিশের কাছে গেলে ওরা খোঁজ নিতে যাবে। গিয়ে শুনবে আমিই লোক দিয়ে ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছি। আমি ফলস পজিশনে পড়ে যাব।'

'কারেক্ট!' মাথা নাড়ল তৃণা। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'বুঝতে পেরেছি।'

'কী?'

'এটা লেডি টেরিবলের কাজ। ওই বুড়ি কখনও দীপকে পছন্দ করেনি। কিন্তু বুড়ি কী করে জানবে আমি ঘরে নেই!'

কাপুর তাকালেন, 'দীপকে তুমি খুঁজে পেতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে আমার উপদেশ লেডির সঙ্গে সমঝোতা করো। একমাত্র তিনিই পারেন পুলিশকে না জানিয়ে কাজটা করতে।'

'কিন্তু বুড়ি তো মাফিয়া নয়। গুন্ডা পোষে না।'

'না। কিন্তু মাফিয়ারা ওঁকে খাতির করে, ভয় পায়।'

'তুমি কী করে জানলে?'

'আমি প্রায় পঞ্চাশ বছর ওখানে কাজ করেছি।'

'করেছি মানে? এখনও তো করছ।'

কাপুর হাসলেন, 'তুমি লেডিকে ফোন করো।'

একটু ইতস্তত করে রিসিভারটা তুলল তৃণা। তারপর নাম্বার ডায়াল করল। একটু পরে ওপাশ থেকে সাড়া পেয়ে বলল, 'লেডি কণিকা চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলব। আমি? আমি ওঁর নাতনি, তৃণা।'

একটু পরেই লেডির গলা ভেসে এল, 'ইয়েস?'

'আমি তৃণা!'

'আমি এখন খুব ব্যস্ত!'

'আমি এক মিনিট সময় চাইছি।'

'ওয়েল, বলো।'

'আমি তোমার সাহায্য পেতে পারি?'

'সাহায্য? কোত্থেকে কথা বলছ?'

'কাপুর আঙ্কলের ফ্ল্যাট থেকে।'

'লায়ার। তোমার সবটাই মিথ্যে। এর পর আমাকে বিরক্ত করবে না।' লাইন কেটে দিলেন লেডি কণিকা চ্যাটার্জি।

তৃণা হতভম্ব। কিছুক্ষণ রিসিভারের দিকে তাকিয়ে সে চিৎকার করে বলল, 'আমাকে মিথ্যেবাদী বলল? তোমার ফ্ল্যাট থেকে ফোন করছি বলায় বলল আমার সবটাই মিথ্যে। হোয়াই? কাপুর আঙ্কল, ইউ কল হার। বুড়িকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতেই হবে। আমি যে এখন মিথ্যে বলিনি এটা ওকে জানাও। প্লিজ!'

'এমন হতে পারে, তুমি কখনও আমার ফ্ল্যাটে আসোনি, তাই...'

'আসিনি বলে কি আসতে পারি না? হোয়াট ননসেন্স? তুমি ফোন করবে কি না বলো?' তৃণা যেন খেপে গেল।

'দাঁড়াও। মাথাটা ঠান্ডা করে বোসো।'

ম্যাডামকে দোষ দিতে পারছিলেন না কাপুর। যে মেয়ে চোরের মতো ভোরের আগেই তাঁর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেছে তার তো এখন এখানে থাকার কথা নয়। তিনি বললেন, 'তৃণা যথেষ্ট হয়েছে, লেডির সঙ্গে আর শত্রুতা বাড়িয়ো না।'

'তার মানে?' খেঁকিয়ে উঠল তৃণা।

'চেষ্টা করো সমঝোতা করতে। তাতে আখেরে তোমারই লাভ হবে।'

'ইম্পসিবল।'

'নাথিং ইজ ইম্পসিবল ইন লাভ, ওয়ার অ্যান্ড পলিটিক্স।'

'পলিটিক্স? এটা তো ছিল না!'

'এখন যোগ করতে হবে। আমাকে একটু ভাবতে দাও। সকাল থেকে তুমি কি কিছু খেয়েছ? বোধহয় না, তাই না?' কাপুর জিজ্ঞাসা করলেন।

'সময় পাইনি।'

কাজের লোককে ডেকে তৃণার জন্যে একটা ভারী ব্রেকফাস্ট খুব তাড়াতাড়ি করে দিতে বললেন। এবং তখনই তার কেদার সিং-এর কথা মনে পড়ল। তিরিশ বছর ধরে কেদার সিং তাঁর অনুগত ছিল। কাজ করেছে যেমন-তেমন টাকাও পেয়েছে অনেক চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জি থেকে। আর এই দেওয়া-নেওয়া ছিল তাঁরই মাধ্যমে। হঠাৎ একটা কাজে ব্যর্থ হওয়ায় লেডি খেপে গিয়ে তাঁকে বলেন ওকে সরিয়ে দিতে। ওর বদলে যে এল তার সোর্স হল নতুন এম বি এ ছোকরা উপেন নায়েক। লোকটার নাম হাপি যাদব।

কাপুর কেদার সিং-কে ফোন করলেন, 'কেমন আছ কেদার?'

'নমস্তে কাপুর সাহেব। আছি, আছি এখনও। তবে বয়স হয়েছে বলে কাজ-কাম কমিয়ে দিয়েছি। লোকে বিশ্বাসও করে না বুড়ো হয়েছি বলে। আপনার মালিকান তো আমাকে তাড়িয়েই দিল। কিন্তু আমি আপনার উপকার ভুলব না।' কেদার সিং একটানা বলে গেল। গলার স্বরে আন্তরিকতা স্পষ্ট।

'কেদার সিং, আমার একটা উপকার করতে হবে।'

'হুকুম করুন, বান্দা তৈরি।'

কাপুর সমস্ত ঘটনাটা কেদার সিংকে জানালেন, তৃণার ঠিকানাও দিলেন। কেদার সিং চুপচাপ শুনল। তারপর বলল, 'ছেলেটাকে তুলেছে আপনার কোনও চেনা লোক?'

'জানি না। তবে যে তুলিয়েছে সে আমাকে জানে।'

'কাউকে সন্দেহ করেন সার?'

'অন্ধকারে ঢিল ছুড়ে লাভ নেই।'

'হাপি যাদব তো এখন কোম্পানির গোপন কাজ করে?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে ছয় ঘণ্টা সময় দিন সার।'

রিসিভার নামিয়ে কাপুর বললেন, 'তৃণা, খেয়ে নিয়ে স্নান করে একটা লম্বা ঘুম দাও। কেদার সিং যদি ছয় ঘণ্টার মধ্যে খবর না দেয় তা হলে তোমার বয়ফ্রেন্ডের খবর কেউ দিতে পারবে না।'

'কাপুর আঙ্কল! দীপ আমার বয়ফ্রেন্ড নয়, হাজব্যান্ড।'

উত্তর দেওয়ার আগেই ফোন বাজল। রিসিভার তুললেন কাপুর, 'ইয়েস?'

'মিস্টার কাপুর?'

'ইয়েস।'

'গুড মর্নিং। আমি উপেন নায়েক।'

'বলুন।'

'আমি শুনলাম আপনি রেজিগনেশন দিয়েছেন স্বাস্থ্যের কারণে। ম্যাডাম আমাকে বলেছেন কেন্ট অ্যান্ড হিলের কেসটা হ্যান্ডেল করতে। কিন্তু ফাইলটা আপনার আলমারিতে আছে, চাবিও আপনার কাছে।'

হাসলেন কাপুর, 'মিস্টার নায়েক, রেজিগনেশন লেটার আমি এখনও সাবমিট করিনি, তবে করব। আমি একটু বাদেই অফিসে যাচ্ছি। তবে ফাইল আমি ম্যাডামের হাতেই দেব।' কথাগুলো বলে লাইন কেটে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'হু ইজ কেদার সিং?' তৃণা প্রশ্ন করল।

'এই শহরে পুলিশের প্যারালাল কিছু লোক আছে যারা নিজেরাই বড় সংস্থার ক্যাপ্টেন। কেদার সিং ইজ ওয়ান অব দেম।'

'মাফিয়া?'

'শব্দটা বড্ড ভারী তৃণা।'

'তা হলে আমাকে এই ছয় ঘণ্টা এখানে বন্দি হয়ে থাকতে হবে?'

'বন্দি তোমাকে কেউ করেনি। তুমি ইচ্ছে করলে রাস্তায় বেরিয়ে দীপ দীপ বলে চিৎকার করতে পারো। আমি বেরুচ্ছি। কেদার সিং ফোন করলে আমার মোবাইলে তুমি ফোন করবে। নাম্বার জানো?'

'জানি।'

কাজের লোক এসে জানাল তৃণার ব্রেকফাস্ট তৈরি।

অফিসে গেলেন কাপুর, কম্প্যুটারে বসে নিজের হাতে রেজিগনেশন লেটার টাইপ করলেন চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জিকে অনেক কৃতজ্ঞতা, স্যার অমলেশকে পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে লেডি চ্যাটার্জিকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর স্বাস্থ্যের কারণে অক্ষমতা জানিয়ে রেহাই চাইলেন।

চিঠিতে সই করে ইন্টারকমে অপারেটরকে বললেন তিনি লেডি চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে চান। অপারেটর জানাল, 'ম্যাডাম এখন বিরক্ত করতে নিষেধ করেছেন স্যার।'

পিওনের হাতে বন্ধ খামটা পাঠিয়ে দিলেন কাপুর। সে ম্যাডামের পি এ-কে

দিয়ে আসবে। ব্যক্তিগত জিনিসগুলো, ডায়েরি ইত্যাদি যা এই ঘরে ছিল তা বের করে আর একজন পিওনকে দিয়ে গাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

চিঠি পাঠানোর পর এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও যখন ম্যাডামের সাড়া পাওয়া গেল না তখন কাপুর উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক তখনই ফোন বাজল।

'হ্যালো।'

'খবরটা দিচ্ছি সাব। যে লোকটা ওই ছোকরাকে তুলেছে সে হ্যাপি যাদবের জন্যে কাজ করে। আপনার নাম বলে নিয়ে গিয়েছে অথচ আপনি জানেন না। আপনার সঙ্গে চ্যাটার্জি কোম্পানির সম্পর্ক কি ভাল নয়?' কেদার সিং প্রশ্ন করল।

'এখন, মানে এই মুহূর্তে আমি আর কোম্পানিতে নেই।' কাপুর বললেন।

'ও, তা হলে ঠিক আছে। আমি দেখছি সাব।'

কেদার সিং ফোন রাখা মাত্র অপারেটার জানাল, 'ম্যাডাম আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন স্যার।'

তিন মিনিটের মধ্যে লেডি চ্যাটার্জির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন কাপুর। প্রথমেই ওঁর নিজস্ব রিসেপশন, পি এ-র ঘর। ওপাশে ওঁর দু'জন সেক্রেটারির চেম্বার। পি এ এগিয়ে এল, 'প্লিজ কাম।'

ব্যাপারটা অভিনব। আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে ম্যাডামের ঘরে যাওয়ার সময় এসকর্ট করেনি। এদের অনেকের চাকরি তো তিনিই দিয়েছেন।

দরজা খুলল পি এ। ভেতরে ঢুকেই বিরক্ত হলেন কাপুর। টেবিলের এপাশে বসে আছে উপেন নায়েক। ওপাশে বসে ম্যাডাম তাকে কিছু বলছেন।

'মে আই কাম ইন?' প্রশ্নটা বহু দিন পরে করলেন।

'ইয়েস। বসো,' লেডি চ্যাটার্জি কাপুরের পাঠানো চিঠিটা তুলে ধরলেন, 'তোমার চিঠি। এতগুলো বছর কাজ করে যাওয়ার জন্যে চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। যা কিছু তোমার প্রাপ্য তা অফিস থেকে পৌঁছে দেবে। কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ।'

'বলতে পারো।'

'ব্যক্তিগত কথা। তৃতীয় ব্যক্তির সামনে নয়।'

'এখন নায়েক চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জির একজন। ইনফ্যাক্ট আমি তরুণ প্রজন্মকে আরও বেশি ইনভলভ করতে চাইছি।' লেডি চ্যাটার্জি বললেন।

তাকালেন কাপুর। গত কুড়ি বছরে তাঁর নিজের শরীরটা একদম বদলে

গেছে, শরীরে যে কোনও অংশে জরা থাবা বসিয়েছে কিন্তু ওই মহিলা যেন একই আছেন। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি বলেছি, ব্যক্তিগত কথা।'

'ও!'

সঙ্গে সঙ্গে উপেন নায়েক উঠে দাঁড়াল, 'ম্যাডাম, আমি...'

'ইয়েস।'

নায়েক চলে গেল।

পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে লেডি চ্যাটার্জির দিকে এগিয়ে দিলেন কাপুর। 'যেসব জরুরি ফাইল আমার আলমারিতে আছে সেগুলো এই চাবি দিয়ে খুললেই পাওয়া যাবে।'

'এটা কিন্তু ব্যক্তিগত কথা নয়।'

'হ্যাঁ। তৃণা আপনার সঙ্গে আমার ফ্ল্যাট থেকেই কথা বলেছিল!'

কপালে ভাঁজ পড়ল লেডি চ্যাটার্জির, 'হতে পারে।'

'আপনি ওকে মিথ্যেবাদী বলায় ও খুব আপসেট হয়ে পড়েছে।'

'হওয়ার কথা নয়। যে যা তাই অ্যাকসেপ্ট করা উচিত।' মাথা নাড়লেন লেডি চ্যাটার্জি, 'ও তো জন্মসূত্রে আমেরিকান সিটিজেন। ওকে বলো সেখানেই চলে যেতে।'

'কেন?'

'তা হলে আমাকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়াবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে না।'

'ও বিবাহিতা।'

'স্বামীকে নিয়ে যাক। তবে তার প্লেনের টিকিটের দাম আমি দেব না।'

'তাকে ও খুঁজে পাচ্ছে না।'

'খুঁজে বের করুক, এটা ওর সমস্যা।'

'ম্যাডাম, ওকে কি আপনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন না?'

'ওকে? তুমি কী বলছ কাপুর? তুমি সব জানো। কাবেরী যখন মেয়েটাকে নিয়ে দেশে ফিরে এল তখন চ্যাটার্জি প্যালেসে তাদের জায়গা হয়েছিল। আই অফারড দেম এভরিথিং। তৃণাকে লা'মার্টসে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার পর অসুবিধে হচ্ছে দেখে ইন্টারন্যাশন্যাল স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। ওর মা সন্ধে ছ'টার পর ঘরের দরজা বন্ধ করে মদ্যপান করে বলে ওর জন্যে গভর্নেস রেখেছিলাম,' শ্বাস নিলেন লেডি চ্যাটার্জি।

'ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছিল মেয়েটা।'

'হ্যাঁ। সেই সঙ্গে অ্যাবরশন করাতে হয়েছিল বাঙ্গালোরে নিয়ে গিয়ে। ওই বয়সে সে একটা ড্রাইভারকে বেছে নিয়েছিল শরীরের জন্যে। তবু আমি ক্ষমা করেছিলাম। ওই বয়সে ভুল হয়।' লেডির চোখের সামনে তাঁর বাবার বাড়ির গোয়াল ঘরের গ্রাম্য তরুণটি চলে এল হঠাৎ, এত বছর পরে।

'হ্যাঁ। প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হল ইংরেজি অনার্স নিয়ে। কী হল? বেছে বেছে একটা দলের সঙ্গে ভিড়ল যারা সিগারেট গাঁজা খায়, কবরখানায় রাত কাটায়। একটার পর একটা ওয়ার্নিং দিয়েছি, কানে তোলেনি। শেষ পর্যন্ত উচ্চাশাহীন ছোকরাকে বিয়েই করে ফেলল যে ওই গাঁজা সাপ্লাই দিয়েছে ওকে। আমি যখন আপত্তি করলাম তখন আর কেউ যা বলতে পারেনি ও তা বলেছে। আমার টাকা বাড়ি ব্যবসা সম্পত্তির জন্যে ও জন্মায়নি। ও স্বাধীনতা চায়। আমার মতো যক্ষ হয়ে সারাজীবন বেঁচে থাকতে চায় না। আমি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সেই মুহূর্তে ওকে এ বাড়ি থেকে বিদায় করে দিয়েছি। ওর মাও তো ওকে সমর্থন করেনি। আজ তুমি আমাকে বলছ ওকে অ্যাকসেপ্ট করতে?' শেষ কথাগুলো যেন ঠিকরে বের হল লেডি চ্যাটার্জির গলা থেকে।

রিং হচ্ছিল। সেটা যে তাঁর পকেটে রাখা মোবাইল থেকে হচ্ছে বুঝতে পারেননি কাপুর। এতক্ষণ যে কাহিনী তিনি শুনছিলেন তার সবটাই ওঁর জানা। তবু একমনে শুনে যাচ্ছিলেন। লেডি চ্যাটার্জি বললেন, 'তোমার পকেটে ফোন বাজছে!'

সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত ঢুকিয়ে যন্ত্রটা বের করে কানে চাপলেন তিনি, 'হ্যালো।'

'সাব।'

'ইয়েস।'

'ওকে বের করে এনেছি সাব।'

'আচ্ছা।' লেডির দিকে তাকালেন কাপুর।

'আর কিছুক্ষণের মধ্যে যাদব টের পেয়ে যাবে। কোথায় পাঠাব?'

'আমার ফ্ল্যাটে চলে এসো।' লাইন কেটে দিলেন কাপুর।

'আই অ্যাম সরি। আমি অনুরোধ উইথড্র করছি।' কাপুর বললেন, 'তা হলে আমি এখন উঠতে পারি?'

তাকালেন লেডি চ্যাটার্জি, 'একদিন সবাইকেই চলে যেতে হবে। স্যার অমলেশ কি ভেবেছিলেন অত অল্প বয়সে চলে যাবেন। কিন্তু কাপুর, তুমি এখন কী করবে?'

'ভাবনা-চিন্তামুক্ত হয়ে থাকার বিলাসিতা উপভোগ করব।'

'বাঃ। তবে মাঝে মাঝে যোগাযোগ কোরো বাড়িতে।' বলতে না বলতেই লেডি চ্যাটার্জির ডাইরেক্ট নাম্বারের ফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো। হুঁ! আচ্ছা! তোমার লোকজন কী করছিল? ওয়ার্থলেস। নো। আই ডোন্ট নিড দ্যাট।' রিসিভার নামিয়ে রেখে কাপুরের দিকে তাকালেন লেডি চ্যাটার্জি। একটু ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি যে ফ্ল্যাটে থাক তার রেন্ট তো অফিস দেয়, তাই না? অফিসের নামেই ভাড়া!'

'হ্যাঁ ম্যাডাম। আমি এক মাসের মধ্যেই ছেড়ে দেব।'

'সে কথা আমি তোমাকে বলিনি। চলো, আজ তোমার ফ্ল্যাটে গিয়ে লাঞ্চ করি।'

'লাঞ্চ? আপনি? আমার ফ্ল্যাটে! কিন্তু ম্যাডাম, আজ আমার ওখানে লাঞ্চের কোনও ব্যবস্থাই নেই। ইন ফ্যাক্ট আমি বাড়িতে লাঞ্চ করি না।'

'তাজ থেকে কেউ পৌঁছে দেবে। তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি আমি ভেজ খাই।' উঠে দাঁড়ালেন লেডি কণিকা চ্যাটার্জি।

কাপুরকে ওর গাড়িতে না উঠতে দিয়ে নিজের গাড়িতে ডেকে নিলেন লেডি। এবং তখনই কাপুরের মেরুদণ্ড কনকন করতে লাগল। যে মহিলা জীবনে তাঁর ফ্ল্যাটে যাওয়ার মতো অসম্মানজনক কাজ করেননি তিনি হঠাৎ ওই ফোন পাওয়ার পর এরকম বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? তাঁর এই কোম্পানিতে শেষ দিনটাকে সেলিব্রেট করতে? অসম্ভব। কাকে তিনি ওয়ার্থলেস বলে ধমকালেন? যাদবকে? ছেলেটা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে জেনে যাদব নিশ্চয়ই ওঁকে ফোন করেছিল। এবং তখনই ওর মনে পড়েছে তিনি একটু আগে কাউকে বলেছেন ওঁর ফ্ল্যাটে চলে আসতে। উঃ, কী ভুল হয়ে গিয়েছে। ওঁর সামনে এই কথাটা বলা একদম উচিত হয়নি। লেডি চ্যাটার্জি বুদ্ধিমতী, সবাই জানে। তাঁর তো জানা উচিত ওঁর মস্তিষ্ক কতখানি বুদ্ধি ধরে। অথচ কেদার সিং-এর ফোন পেয়ে তিনি এমন ভান করার চেষ্টা করেছিলেন যে ওটা কোনও গুরুত্বপূর্ণ ফোন নয়। তখন অভিনয়টা ভালই করেছিলেন কারণ সে সময় লেডি চ্যাটার্জির মনে কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি। যাদবের ফোন পাওয়ার পর তিনি অঙ্ক কষেছেন এবং সেটা মিলে গেছে।

যা হওয়ার হবে। মরিয়া হলেন কাপুর।

মোবাইল ফোনের বোতাম টিপলেন লেডি চ্যাটার্জি গাড়িতে বসে। আড় চোখে দেখলেন কাপুর।

'হ্যালো। কাল সন্ধের পরে তোমার মেয়েকে পুলিশ ধরেছিল গাঁজা অথবা ড্রাগ খাওয়ার অপরাধে। ওহোঃ, তুমি ইন্টারেস্টেড না হলেও আমাকে মাথা ঘামাতে হয়েছে। আজকের কাগজে এ কারণে আমার নামও ছাপা হত। আর একটা খবর, কাপুর রেজিগনেশন দিয়েছে। সম্ভবত বয়সের জন্যেই। মন্তাদা কাছে পিঠে আছে? ও, কখন ফিরবে? কেমন দেখছ ওঁকে? হুঁ। বাই।'

যন্ত্রটাকে বন্ধ করে লেডি কণিকা চ্যাটার্জি হাসলেন, 'এই একটা ব্যাপারে কাবেরীর সঙ্গে আমার মিল আছে। ও যদি নিজেকে নষ্ট না করত তা হলে আমি চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জির ভবিষ্যৎ নিয়ে একটুও ভাবতাম না?'

কাপুর কোনও উত্তর দিলেন না। এত বছরের অভিজ্ঞতায় তিনি জানেন এসব ক্ষেত্রে কথা বলা বোকামি করা ছাড়া কিছু নয়। আজ অফিস থেকে ওঁকে নিয়ে বের হবার আগে তাজে ফোন করে খাবারের অর্ডার দিয়েছিলেন। বলা যায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এখন চিন্তা একটাই, তৃণা ফ্লাটে আছে কি না। দীপকে তার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিতে তিনি নিজেই বলেছেন। দুজনের কারও মাথায় যদি এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকে তা হলে এতক্ষণে ওর ফ্ল্যাট ছেড়ে যাওয়ার কথা।

হঠাৎ কাপুরের মনে হল তিনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। দিদিমা এবং নাতনির মুখোমুখি হলে হোক না। তৃণাকে এখন যেটুকু তিনি দেখেছেন তাতে সে কম যাবে না। সিংহির সঙ্গে চিতাবাঘ? তুলনাটা ঠিক জুতসই বলে মনে হল না। তৃণার বলা 'লেডি টেরিবল' শব্দ দুটো মনে পড়তেই হেসে ফেললেন কাপুর।

'পাগল হয়ে গেলে নাকি? লেডি চ্যাটার্জির গলায় শ্লেষ।

'সরি ম্যাডাম।' গম্ভীর হলেন কাপুর।

কাজের লোকটি দরজা খুললেন। কাপুর বললেন, 'আসুন ম্যাডাম।'

লেডি কণিকা চ্যাটার্জি ভেতরে ঢুকলেন। চার পাশে নজর বুলিয়ে বললেন, 'তুমি এখানে কত বছর আছ কাপুর?'

'দশ বছর।'

'এই ফ্ল্যাটের ভাড়া কে দেয়? তুমি, না চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জি?'

'এতদিন কোম্পানি দিত ম্যাডাম। এখন...'

'এখনও দেবে। তবে যেহেতু তুমি রেজিগনেশন দিয়েছ তাই এখানে থাকবে কি না ভেবে দেখতে পারো।' লেডি চ্যাটার্জি ঘরের ভেতরে চলে

এলেন। কাপুর তাকে বসতে বললে সম্রাজ্ঞীর মতো বসলেন।

এই সময় কাজের লোকটি জানাল, একটু আগে তাজ থেকে খাবার দিয়ে গেছে।

কাপুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'ম্যাডাম, খাবার এসে গেছে, দিতে বলব?'

ঘড়ি দেখলেন লেডি চ্যাটার্জি, 'একটু পরে। হ্যাঁ। এই ফ্ল্যাটে গত রাত্রে তৃণা এসে থেকেছিল?' কাজের লোকটি ভেতরে চলে গেল।

'হ্যাঁ ম্যাডাম।'

'ওর সঙ্গে বাড়তি পোশাক ছিল না, অতএব পোশাক চেঞ্জ করতে পারেনি?'

ঢোঁক গিললেন কাপুর। কী বলবেন?

'চমৎকার!'

'মানে?'

'ওর মতো মেয়ে পোশাক না পরেও বিছানায় শুতে পারে। তাই না ?'

'না ম্যাডাম। তোয়ালে পরেছিল।'

'এখন সে কোথায়?'

'আমি... আমি যখন বেরিয়েছিলাম তখন এখানে ছিল, এখন আছে কি না জানি না। ঠিক আছে দেখছি।' কাপুর কাজের লোকটিকে ডাকলেন, সে এলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেমসাহেব কি চলে গেছেন?'

'না সাহেব।'

'ওকে বলো এখানে আসতে।' লেডি চ্যাটার্জি হুকুম করলেন।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তৃণা এই ঘরের দরজায় চলে এল, 'হোয়াট আ সারপ্রাইজ! তুমি! কত দিন পরে তোমাকে দেখলাম। উঃ, কী যে ভাল লাগছে।' দ্রুত এগিয়ে এসে লেডি চ্যাটার্জির হাত ধরল তৃণা, 'কেমন আছ দিদু?'

হাত সরিয়ে নিলেন লেডি চ্যাটার্জি, 'তুমি এখানে কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ফুলে উঠল, দু'হাতে মুখ ঢাকল তৃণা। 'আমি খুব বিপদের মধ্যে আছি, দিদু।'

'ইউ ডিজারভ দ্যাট।'

'আমি, আমি ভুল করেছি, খুব ভুল করেছি।' গলায় কান্না।

'কী বলতে চাও?'

'তোমার কথা না শুনে ভুল করেছি।'

'আমার কথা শোনোনি কেন?'

'দীপ আমাকে ভুল বুঝিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম ও আমাকে খুব ভালবাসে। কিন্তু টাকা শেষ হয়ে গেলে ওর আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। দিদু, তুমি ঠিক বলেছ, পুরুষমানুষদের বিশ্বাস করতে নেই। ওর জন্যেই পুলিশ আমাকে ধরল।'

'ওর জন্যে? কী ভাবে?'

'ওই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ইতালিয়ানদের কাছে। বলেছিল ওরা কখনও বাঙালি সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে গল্প করেনি। ওদের সঙ্গে গল্প করলেই টাকা পাওয়া যাবে।'

'ছিঃ।'

'আমি বুঝতে পারিনি দিদু। আমাকে ওখানে বসিয়ে রেখে ও কখন কেটে গিয়েছে আর তখনই পুলিশ এসে আমাদের ধরল।'

'মিথ্যে কথা। তুমি ওদের সঙ্গে বসে গাঁজা, ড্রাগ খাচ্ছিলে!'

'এম্মা! এসব কে বলেছে তোমাকে? দীপের পাল্লায় পড়ে আমি এক আধবার গাঁজাপোরা সিগারেটে টান দিয়েছি ঠিক, সেটা ওকে খুশি করতে। দীপই তো ওখানে বসে ড্রাগ খেয়েছিল।'

'আমি তোমার কোনও কথা বিশ্বাস করি না। তোমার সবটাই মিথ্যে।'

'তুমি আমায় আর বোকো না দিদু। আমি মিথ্যে বলছি না। প্রমিস।'

লেডি চ্যাটার্জি নাতনির দিকে তাকালেন, 'মাই গড। কে বলবে আমার রক্ত তোমার শরীরে। ঠিক হিপিনির মতো চেহারা হয়ে গেছে। কাল রাত্রে তোয়ালে জড়িয়ে শুয়েছিলে?'

'হুঁ। কাপুর আঙ্কলের কাছে মেয়েদের পোশাক ছিল না।'

'তোমার একটুও লজ্জা করল না?'

'না। কাপুর আঙ্কল তো দাদুর মতো।'

'কিন্তু আফটার অল কাপুর পুরুষমানুষ।'

'জানি। তবে ওই বয়সের পুরুষমানুষরা তো হার্মলেস হয়।'

কাপুর মুখ নামালেন। লেডি চ্যাটার্জি কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

'দিদু, আমি আর দীপের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না।'

'ইটস ইওর প্রবলেম।'

'আমি আমেরিকায় চলে যেতে চাই। আমি তো ওখানকার সিটিজেন।'

'তোমার ইচ্ছে।'

'কিন্তু আমার প্যাসেজ মানি নেই।'

'তুমি সত্যি যেতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'দীপ এখানে আসেনি?'

'দীপ? এলে দরজা খুলবই না।'

'তোমার মাকে আমি ফোন করেছিলাম। সে তোমার নামই শুনতে চায় না।'

'আমি তোমার মতো দেখতে বলে মা আমাকে পছন্দ করে না।'

লেডি চ্যাটার্জি উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি তোমার টিকিট পাঠিয়ে দিচ্ছি। চেষ্টা করা হবে যাতে আজকের ফ্লাইট ধরতে পারো। এদেশে তোমার ছায়াও দেখতে চাই না আমি।' লেডি চ্যাটার্জি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

কাপুর দ্রুত ওঁর পাশে গেল। 'ম্যাডাম, লাঞ্চ—।'

'ওটা ওকে খাইয়ে দাও। আর হ্যাঁ, যতক্ষণ টিকিট না পাচ্ছ ততক্ষণ তুমি এই ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও যাবে না।'

লেডি চ্যাটার্জিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে এলেন কাপুর। তাঁর মাথা কাজ করছিল না। মেয়েটা যা বলল তা কি সত্যি? ও কি আমেরিকায় যেতে চায়? তা হলে দীপের জন্যে ওইরকম উদ্বিগ্ন হয়েছিল কেন?

লেডি চ্যাটার্জির লাঞ্চ করতে আসা কি একটা বাহানা? অফিস থেকে ইন্টারনেটে অর্ডার দিলে তাজ খাবার পাঠিয়ে দেবে। তাঁদের কোম্পানির সঙ্গে এই ব্যবস্থা আছে। তাঁদের কোম্পানি শব্দ দুটো নিজের মনেই বেঠিক ঠেকল এখন।

ঘরে ঢোকামাত্র কাজের লোকটি বলল, 'সাহাব, ফোন।'

রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই কানে এল, 'কাপুর, তোমার রেজিগনেশন লেটার অ্যাকসেপ্ট করতে পারলাম না। তোমাকে এখনও দরকার আছে আমার।'

লাইন কেটে গেল। কয়েক সেকেন্ড লাগল কাপুরের রিসিভার নামিয়ে রাখতে।

মেয়েটার সঙ্গে বোঝাপড়া করা দরকার। ভাবলেন কাপুর।

বেডরুমের দরজা ভেজানো। সেটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই চমকে উঠলেন তিনি। দুটো শরীর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে খাটে শুয়ে চুমু খেয়ে চলেছে। তিনি যে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন তাতে কোনও হুঁশ নেই ওদের।

দীপই তাঁকে প্রথম দেখতে পেয়ে উঠে বসল, 'থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার কাপুর!'

'তুমি? তুমি কখন এলে?'

'আধঘণ্টা আগে। আপনার কথায় তো ওরা আমাকে পৌঁছে দিল।'

'মাই গড। তুমি এতক্ষণ এই ঘরে ছিলে?'

'হ্যাঁ।' দীপ মাথা নাড়ল।

চিত হয়ে শুয়ে হাসছিল তৃণা। এবার লাফিয়ে খাট থেকে নেমে চলে এল কাপুরের কাছে। আচমকা জড়িয়ে ধরে বলল, 'একটা উপকার করবে, প্লিজ, আর একটা।'

কোনওমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাপুর বললেন, 'কী হচ্ছে।'

'ইউ আর মাই সুইট আঙ্কল।'

'লেডি জানতে পারলে কী হবে ভেবেছ?'

'তুমি না বললে কী করে জানবে? তা ছাড়া এখন আমার ওপর একটু সফ্‌ট হয়েছে, না?'

'কিন্তু তুমি আজ চলে যাচ্ছ!'

'সেই জন্যেই তো উপকার চাইছি। তোমাদের কোম্পানি যে ট্র্যাভেল এজেন্সি থেকে টিকিট কাটে তাদের তো তুমি চেনো। তাই না?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন কাপুর।

'লেডি টেরিবল টিকিট পাঠালে সেটা ওদের কাছে নিয়ে গেলে যাতে রিফান্ড করিয়ে দেয় তার ব্যবস্থা করবে? তুমি বললেই ওরা শুনবে!'

হেসে ফেললেন কাপুর, 'তুমি মূর্খের স্বর্গে বাস করছ। ওরা ক্রেডিটে টিকিট দেয়। এই টিকিটের দাম একমাস পরে কোম্পানি থেকে পাবে। অতএব রিফান্ড দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'

'তোমার কথাতেও না?'

'না। তা হলে তুমি আমেরিকায় যাবে না?'

'কোনও প্রশ্নই নেই।'

'তুমি বলেছ ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। ওর বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ করেছ, সেগুলো নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা?'

'যুদ্ধ এবং ভালবাসায় মিথ্যে বললে অন্যায় হয় না।'

'তা হলে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমরা এখান থেকে চলে যাও।'

'কেন?'

'আমি কোনও জবাবদিহি দিতে পারব না।'

'কিন্তু আমাকে ওই টিকিটের জন্যে এখানে অপেক্ষা করতে বলেছেন দিদু।'

'তুমি যখন যাবে না তখন অপেক্ষা করে লাভ কী!' বিরক্ত হলেন কাপুর।

'সেটা আমি বুঝব। যতক্ষণ না টিকিট আসছে ততক্ষণ অপেক্ষা করব। আর হ্যাঁ, তোমার কাজের লোককে বলো খাবার দিতে, খুব খিদে পেয়েছে ওর।' বেশ আদুরে গলায় অনুরোধ জানাল তৃণা।

'দ্যাখো তৃণা, কেউ খেতে চাইলে না বলাটা আমার সৌজন্যবোধে বাধে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা লেডির পছন্দ হবে না। তবু, মিনিট পনেরোর মধ্যে দয়া করে খেয়ে দেয়ে বিদায় হও।'

'পাগল!' হাসল তৃণা।

'তার মানে?'

এতক্ষণে দীপ কথা বলল, 'মিস্টার কাপুর, লেডি চ্যাটার্জি যদি জানতে পারেন গতরাত্রে তৃণা যখন এখানে অসহায় অবস্থায় ঘুমিয়েছিল তখন আপনি ওর শরীরে হাত দিয়েছিলেন, ওকে রেপ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু লজ্জায় সে কথাটা ও বলতে পারেনি তা হলে উনি ব্যাপারটাকে কীভাবে নেবেন?'

তৃণা হাসল, 'আমাকে যতই অপছন্দ করুক, নিজের নাতনিকে কেউ রেপ করতে চেয়েছিল শোনার পর লেডি টেরিবল যে চুপ করে থাকবেন না তা আপনি ভাল করে জানেন। অতএব প্রভুভক্ত কুকুর না হয়ে আপনার মতো থাকুন, আমাদেরও থাকতে দিন।'

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না কাপুর। এর মাকে তিনি জন্মাবার পরে দেখেছেন, এই মেয়ে কি কাবেরীর মেয়ে?

শ্লথ পায়ে বেরিয়ে এসে কাজের লোককে বললেন ওদের খাবার দিতে। তারপর বাইরের ঘরের সোফায় বসে পড়লেন থপ করে। কিছুক্ষণ বাদে তাঁর মনে হল, একটা কিছু করা উচিত। কী করা যায়?

আধঘণ্টা বাদে কাপুর লেডি কণিকা চ্যাটার্জিকে টেলিফোন করলেন।

'ম্যাডাম!'

'ইয়েস কাপুর।'

'তৃণা, তৃণা—, ওইটুকুনি মেয়ে আমার সম্পর্কে যা তা বানিয়ে বলছে।'

'কেন?'

'আমি দীপ আর ওকে এই ফ্ল্যাট থেকে চলে যেতে বলেছি। তাই ওরা কাল রাত্রে তৃণার শ্লীলতাহানি করেছি বলে আমার মুখ বন্ধ করতে চাইছে।'

'আচ্ছা! তৃণাকে বলো দশ মিনিটের মধ্যে ফ্ল্যাট খালি করে দিতে। আর কাপুর, চিন্তিত হোয়ো না, তুমি যে ওসব পারো না তার রিপোর্ট এখনও আমার কাছে আছে।' ফোন রেখে দিলেন লেডি চ্যাটার্জি।

আজ সকাল থেকেই আধা অন্ধকার, পৃথিবী কুয়াশায় মোড়া। ঘুম ভাঙার পর তৈরি হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই কাবেরীর কানে এল, 'গুড মর্নিং।'

'এই রকম সকাল তোমার ভাল লাগে মন্তামামা?'

'অ্যাঁঃ। ভাল লাগে? হাঁটতে বেরিয়ে ফিরে এলাম বাধ্য হয়ে। দু'পা দূরের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না কুয়াশার জন্যে।' মন্তামামা লনে দাঁড়িয়েছিলেন।

হাসলেন কাবেরী, 'তবু তো গুড মর্নিং বললে!'

'তোমায় বলেছি। তোমার জন্যে সকালটা শুভ হোক।'

ইতিমধ্যে আবদুল বেতের চেয়ারগুলো শিশিরমুক্ত করে দিয়েছে। তার একটায় বসলেন কাবেরী, 'আমার অবশ্য এই কুয়াশা খুব ভাল লাগে। চারপাশ কীরকম রহস্যময়। ভৌতিক সিনেমার মতো। সব পাহাড়ে তো এমন দৃশ্য দেখা যায় না।'

'হুম্।' উলটোদিকের চেয়ারে বসলেন মন্তামামা।

'ও হ্যাঁ, তোমাকে বলা হয়নি, কাল লেডি চ্যাটার্জি ফোন করেছিলেন!'

'আচ্ছা!'

'তোমার খোঁজ করছিলেন! তোমাকে আমার কেমন লাগে জানতে চেয়েছিলেন।'

হাসলেন মন্তামামা, 'উত্তরটা কী দিলে?'

হাসলেন কাবেরী, 'তোমায় বলব কেন?' তারপরেই গম্ভীর হয়ে গেলেন।

মন্তামামা ব্যাপারটা লক্ষ করলেন। কাবেরী না চাইলে ওর কথা জানা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে চুপ করে থাকাটাই ভাল।

'আমি যা চাই না তাই মা করে এসেছে বরাবর।' কাবেরী যেন নিজের মনে কথা বলছেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয় সেই ছোট্টবেলা থেকে মা যদি আমাকে একটু বুঝতে চাইত, জীবনটা অন্যরকম হয়ে যেত। চিরটাকাল মা নিজের ইগো নিয়ে কাটিয়েছে। কোনও কমপ্রোমাইজ করেনি। ওর নাতনির সঙ্গে এখন কোনও সম্পর্ক রাখেনি কিন্তু যেই শুনেছে পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করেছে অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তাকে ছাড়াতে। আমি জানি, নিজের ইমেজ বাঁচাবার জন্যে মা পুলিশ কেন মিলিটারির হাত থেকেও নাতনিকে বের করে আনবে।'

'তোমার মেয়েকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে? কেন?'

'আমি জানি না। আমি শুনতেও চাই না। শি ইজ এ স্পয়েল্ট চাইল্ড। আমার মনে ওর জন্যে কোনও জায়গা নেই।' কাবেরীর কথার মধ্যেই আবদুল চা নিয়ে এল। তাকে মাথা নেড়ে নিঃশব্দে চলে যেতে বলে কাবেরী চা তৈরি

করলেন। এক কাপ চা মন্তামামার দিকে এগিয়ে দিতে তিনি সেটা নিলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে কাবেরী বললেন, 'ও আমেরিকান সিটিজেন। ওকে নিয়ে যখন ফিরে এসেছিলাম তখন ওর বয়স সাত। আমি চেয়েছিলাম ও কোনও বোর্ডিং স্কুলে থেকে পড়ুক। কিন্তু কলকাতায় আসা মাত্র মা ওর দখল নিয়ে নিল। সুন্দরী নাতনি যাকে তার নিজের মতো দেখতে তাকে কাছ ছাড়া করতে চাইল না। কিন্তু সারাদিন ওকে সময় দিত বড়জোর দশ মিনিট। ব্যবসা মাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল। এখনও বোধ হয় আছে। মেয়ে ভর্তি হল কলকাতার এক নামী আন্তর্জাতিক স্কুলে। বারো বছর বয়সে আমি ওর স্কুল ব্যাগে সিগারেটের প্যাকেট পেলাম। ও বলল ওর এক সহপাঠী রাখতে দিয়েছে। প্যাকেটে একটা সিগারেট কম ছিল। যে ড্রাইভার ওকে স্কুলে নিয়ে যেত তাকে ডেকে পাঠালাম। কিন্তু সে আমার কাছে আসার আগেই মা তাকে তাড়িয়ে দিল। কেন দিল বলো তো মন্তামামা?'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, বুঝতে পারছেন না তিনি।

'ইতিমধ্যে তৃণা, ওই দশ বছর বয়সের তৃণা, তার দিদাকে ফোন করে জানিয়েছে যে ওই ড্রাইভার তাকে একটা সিগারেটের প্যাকেট উপহার দিয়েছে। সে কী করবে? ভাবতে পারো। মা কোনও কথা না শুনে লোকটাকে তাড়িয়ে দিল। আমি যখন মেয়েকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম তখন সে অম্লানবদনে বলল ড্রাইভারের ওপর দোষ না চাপালে আমি নিশ্চয়ই স্কুলে গিয়ে কমপ্লেন করতাম, তাতে তার প্রেস্টিজ যেত। ওই শুরু। অন্তত আমি যা জানি। হ্যাঁ, আমার একটা ত্রুটি ছিল। আমি সন্ধে ছ'টার পরে ওকে কখনও সময় দিইনি। সেসময় ওর পড়াশুনা করার কথা, গভর্নেস ছিল, টিচার আসত পর পর। ওরও সময় ছিল না আমার সঙ্গে কাটাবার।'

'তারপর?' মন্তামামা জিজ্ঞাসা করলেন।

চা শেষ করলেন কাবেরী। চোখ মেললেন পাহাড়ে। কুয়াশা এখন দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু আকাশে জলভরা মেঘ। এই মেঘে ভারী বৃষ্টি হয় না।

বারো বছর বয়সে ওর বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে প্রেমপত্র পেলাম। মজার কথা হল সেগুলোতে কোনও নাম নেই, কে লিখছে কাকে লিখছে বোঝা যাচ্ছে না। মেয়ে বলল ওগুলো এক বান্ধবীর, তার কাছে জমা রেখেছে। আমি বিশ্বাস করলাম না। ঠিক করলাম স্কুলে গিয়ে ওর প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করব।

দু'দিন বাদে স্কুলে গেলাম। ভদ্রমহিলা আমাকে চিনতেন। চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জির কাছ থেকে মোটা ডোনেশন পেত স্কুল। হাসিমুখে আমাকে চেয়ারে

বসিয়ে বললেন, 'আপনার মা লেডি চ্যাটার্জির কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।'

আমি অবাক হলাম।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'তৃণা ওঁকে সমস্যার কথা বলেছিল বলে উনি যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তাতে চমৎকার কাজ হয়েছে।'

'কী রকম?' আমি আরও অবাক।

'স্কুলের গেটের সামনে কিছু বাজে ছেলে রোজ ছুটির সময় ভিড় করত। ওরা মেয়েদের লভলেটার দিত। তৃণা সেগুলো কালেক্ট করে ওঁকে দেয়। তারপরেই পুলিশ ছেলেগুলোকে এই চত্বরে আর আসতে দেয় না। মেয়েদের আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না স্কুলে আসতে।' কৃতজ্ঞ হাসি হাসলেন মহিলা।

'আপনি ঠিক জানেন তৃণা ওগুলো মেয়েদের কাছ থেকে কালেক্ট করেছে?'

'হ্যাঁ। তৃণা তাই বলেছে। তা ছাড়া ওর মনে যদি অন্য কোনও চিন্তা থাকত তা হলে লেডিকে কেন দেখাবে!'

আমি ইচ্ছে করলে ওঁকে সব খুলে বলতে পারতাম। কিন্তু ভাবলাম কথা বলা উচিত লেডি চ্যাটার্জির সঙ্গে।

পরদিন ব্রেকফাস্টের টেবিলে ওর সঙ্গে কথা বললাম। ও যে আমাদের দুজনকে দু' রকমের কথা বলেছে এবং মনে হচ্ছে কোনওটাই সত্যি নয়, জানালাম।

লেডি অবাক হয়ে বললেন, 'ওর ব্যাপারে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন?'

'তার মানে?'

'ওর লাস্ট এগজামের রেজাল্ট দেখেছ? অ্যাভরেজ নাইনটি পার্সেন্ট। আমার মনে হয় ওই বয়সে তুমিও পাওনি। তা ছাড়া যারা ওইসব চিঠি লিখেছে তাদের পুলিশ তাড়িয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে ভেবো না।' লেডি বলেছিলেন।

'তুমি কিন্তু ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছ!'

'আমি কাকে কী দিই সেটা জেনেই দিয়ে থাকি। ও যদি এরকম রেজাল্ট করে যেতে পারে তা হলে ওকে বাইরে পাঠাব এম বি এ করতে। আমি ওর সম্পর্কে আমার ভাবনা শেষ করে ফেলেছি। ওকে?' লেডি খাওয়া শেষ করে উঠে গিয়েছিলেন।

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় যে মেয়ে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করল তার ব্যাগে অশ্লীল বই পেয়ে বুঝলাম আমি কোনও কিছুই করতে পারব না। ওই রেজাল্টেই লেডি চ্যাটার্জি অন্ধ হয়ে গেছেন। ইকনমিক্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হতে

কোনও অসুবিধে হল না। গাড়ি যায় ওকে পৌঁছে দিতে। বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, মাঝের সময়টায় ও উড়ে বেড়ায়। এই ওড়ার ব্যাপারটা আবার আমার চোখেই ধরা পড়ে গেল। দুপুরে নিউমার্কেটে গিয়েছিলাম। ওয়ান ওয়ে বলে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ঘুরে আসতে হচ্ছিল। হঠাৎ ওকে দেখলাম। দুটো ছেলের সঙ্গে একটা গলিতে ঢুকছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। গাড়ি থামিয়ে সেই গলিতে ঢোকার আগেই ওরা উধাও। খোঁজ নিতে বললাম ড্রাইভারকে। সে এসে জানাল ওইসব বাড়িতে বিদেশি হিপিরা এসে থাকে। ওরা কোন বাড়িতে ঢুকেছে তা সে খুঁজে বের করতে পারেনি।

সেই বিকেলে ও বাড়ি ফিরতেই মুখে বিশ্রী গন্ধ পেলাম। চোখ লাল। রাগের মাথায় ওকে চড় মারলাম। ও কী বলল জানো? বলল, 'তোমার ওই কালো হাত দিয়ে আমার গালে মারলে? এত সাহস তোমার?'

পরদিন দুপুরে লেডি চ্যাটার্জি আমাকে ফোন করল।

'তুমি তোমার মেয়েকে মেরেছ কেন?'

'ও একটা নষ্ট মেয়ে।'

'প্রমাণ কী?'

'গতকাল আমি নিজের চোখে ওকে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের খারাপ পাড়ায় ঢুকতে দেখেছি। তখন ওর ক্লাসে থাকার কথা।'

'তুমি ভুল দেখেছ।'

'না। ঠিক দেখেছি।'

'জোরে কথা বোলো না। আমার সামনে ওর এই মাসের কলেজের অ্যাটেন্ডেন্সের রিপোর্ট আছে। ও প্রত্যেকটা ক্লাস করেছে। আশা করি ওকে আর বিরক্ত করবে না। এটা আমার শেষ কথা।'

মাথা নাড়লেন কাবেরী। খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আকাশ একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে। মর্নিং শোজ দ্য ডে বলে কেউ এখানে পার পাবে না। আজকাল বোধহয় জীবনের ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য নয়।

মন্তামামার দিকে তাকালেন তিনি, 'ছেলেমেয়েরা দুষ্টুমি করে, অন্যায় করে। বাবা মা তাদের শাসন করে। কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। তৃণা বুঝে গিয়েছিল ওই বাড়ির আসল ক্ষমতা লেডি চ্যাটার্জির হাতে। তার ইচ্ছেই শেষ কথা। ওই বয়সে একটা মেয়ের অমন ছলচাতুরি কী করে করা সম্ভব আমি জানি না। কিন্তু ও বুঝে গিয়েছিল লেডি চ্যাটার্জিকে হাতে রাখলে ও যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাকে তোয়াক্কা করার কোনও দরকার নেই।

যেদিন সে বলেছিল, তোমার ওই কালো হাত দিয়ে আমার গালে মারলে? এত সাহস তোমার? সেদিনই ওর সম্পর্কে আমার সব দুর্বলতা চলে গিয়েছিল। উলটে আফসোস হয়েছিল, কেন মারলাম! ওই মারের পেছনে যে যন্ত্রণা, কষ্ট, স্নেহ এবং ওকে বাঁচাবার তাগিদ ছিল ও তো তার যোগ্য ছিল না। জীবনে প্রথমবার কাউকে মেরেছিলাম আমি, মারাটা কি অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল?'

লেডি চ্যাটার্জির শেষ কথা শোনার পর আমি স্থির করলাম কলকাতার বাইরে চলে যাব। মেয়েটা চোখের সামনে উদ্ধত হয়ে ঘুরে বেড়াবে, ইচ্ছে করে সন্ধে ছ'টার পরে আমাকে বিরক্ত করবে এটা মেনে নেওয়া যাচ্ছিল না।

বাড়ির সব পরিচারক পরিচারিকাও জানত যে সন্ধে ছ'টার পরে আমাকে বিরক্ত করা নিষেধ। ওই সময়ে আমি ঘরের দরজা বন্ধ রাখি। কলকাতায় আসার পর থেকেই এটা চালু ছিল, দীর্ঘকাল ধরেই তৃণা এটা জানে।

ওই ঘটনার দিন কয়েক পরে ঠিক সন্ধে সাড়ে সাতটায় সে আমার ঘরের দরজায় শব্দ করল। টেলিফোনে কেউ বিরক্ত যাতে না করতে পারে তাই রিসিভার নামিয়ে রাখতাম। দু'বার শব্দ করার পর সে চিৎকার করে বলল, 'মা, আমার খুব অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং হচ্ছে, কী করব? মা—!'

কথাগুলো কানে যেতে আমি আর কনসেন্ট্রেট করতে পারলাম না। বাধ্য হলাম সব কিছু বন্ধ করে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে। আমার পরনে তখন কালো আলখাল্লা ছিল, তাড়াতাড়িতে ওটা খুলে আসার কথা মনে ছিল না।

আমাকে দেখে সে চোখ কপালে তুলল, 'মাই গড! এটা কী পরেছ?'

'কী হয়েছে তোমার?' বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

সে নাক টানল, 'কী করছিলে তুমি?'

'আমি কী করছি তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। কী হয়েছে?'

'নাথিং!'

'তা হলে একটু আগে কী বললে?'

'যদি কখনও খুব ব্লিডিং হয় তা হলে কী করব জানতে ইচ্ছে হল।'

মনে হল মেরে ওর মুখ ভেঙে দিই। কিন্তু নিজেকে সামলালাম। আমার মুখের অবস্থা দেখেই বোধহয় ও দ্রুত সরে গিয়েছিল। পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে লেডি চ্যাটার্জি আমাকে বললেন, 'তুমি কি জানো কাল রাত্রে ডক্টর মুস্তাফিকে কল করতে হয়েছিল?'

'না তো। কেন?' আমি অবাক। ডক্টর মুস্তাফি এই পরিবারের ডাক্তার।

'আমি তোমার কাছে এটা আশা করিনি। আফটার অল শি ইজ ইওর ডটার। ওরকম পেইন নিয়ে ও তোমার কাছে গেল আর তুমি সেটাকে আমল দিলে না? ডক্টর মুস্তাফি এসে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওষুধ দিয়ে গেছেন। সেই ওষুধ খেয়ে ও এখনও ঘুমাচ্ছে।' লেডি চ্যাটার্জি বললেন।

'সেই ওষুধ ও যে খেয়েছে সেটা কে দেখেছে?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'তার মানে?'

'ওর কিছুই হয়নি। আমাকে ডিস্টার্ব করার জন্যে ডেকেছিল। সন্ধে ছ'টার পর আমি একা থাকতে চাই এটা সবাই জানে, ওর সহ্য হয়নি।'

'একা থাকতে চাও তার মানে এই নয় পৃথিবী রসাতলে গেলেও তুমি দরজা খুলবে না। তোমার মুখে কীসের গন্ধ বের হচ্ছিল?'

'আমার মুখে?' অবাক হয়ে গেলাম।

'তোমার মুখে তৃণা একটা আনকমন গন্ধ পেয়েছে কাল।'

'বাঃ!' সঙ্গে সঙ্গে আমি মনস্থির করে ফেললাম, 'তোমার পাহাড়ের বাড়িটা এখনও খালি আছে বলে শুনেছি। তাই না?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন লেডি চ্যাটার্জি।

'আমি ওখানে গিয়ে থাকতে চাই।' বললাম।

কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন লেডি চ্যাটার্জি, 'গুড। আমারও মনে হচ্ছে সেটাই সবার পক্ষে ভাল হবে।'

ঠিক তিনদিন পরে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের প্লেনে চেপে বাগডোগরায় নেমেছিলাম আমি। আসার কথা সবাই জানত, সম্ভবত তৃণা জানত না।

মন্তামামা চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। তৃণাকে তিনি দ্যাখেননি। মেয়েটির যা বয়স তাতে এত ধূর্ত হওয়া অস্বাভাবিক। কিন্তু হল কেন? ও নিশ্চয়ই জানে ঠিকঠাক চললে লেডি ওকে এই সাম্রাজ্য দিয়ে যাবেন। তা হলে কেন এই আচরণ?

মন্তামামা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তৃণা তোমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করল কেন?'

'অনেক ভেবেছি। আমেরিকায় যে কয় বছর ছিল ওর সময় কাটত বেবি সিটারের সঙ্গে। মেয়েটা ছিল হিস্পানিজ। আমি কাজে বেরিয়ে যেতাম, হরপ্রীত ব্যবসায়, বড় ছেলে স্কুলে। সে সময় ও কী শিখেছিল আমি জানি না। ও যখন স্কুলে যেতে শুরু করল তখন দেখতাম ওর সব বন্ধু সাদা। নিদেনপক্ষে চিনে। কালোদের সঙ্গে ও কথাই বলত না। সাদাদের দেখাদেখি ব্ল্যাকি বলত

ওদের। এ জন্যে ওকে খুব বকেছিল হরপ্রীত। জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি তোমার মাকে কী বলবে? ব্ল্যাকি?'

মেয়ে, চার বছরের মেয়ে, মাথা শক্ত করে দাঁড়িয়ে জবাব দিয়েছিল, 'মাম্মি স্পিক্স বেঙ্গলি।'

হাসলেন কাবেরী, 'আমি জানি না। তবে ও যখন বলল আমি কেন আমার কালো হাত দিয়ে ওকে মেরেছি তখন মনে পড়ে গিয়েছিল ওইসব কথা। মা বলে আমার সঙ্গে থাকতে বাধ্য হয়েছিল তৃণা, এ ব্যাপারে দিদিমার মানসিকতা ওকে প্রভাবিত করেছে।'

'কিন্তু এই যে মিথ্যাচার, এটা কী কারণে?' মন্তামামা জিজ্ঞাসা করলেন।

'বাড়ির ডিসিপ্লিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে! লেডি চ্যাটার্জি ওকে প্রশ্রয় দিয়েছেন বটে কিন্তু চ্যাটার্জি হাউসের কঠোর ডিসিপ্লিনের বাইরে যাওয়া একদম পছন্দ করেননি, তৃণা ভান করত যে সে বাড়ির নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলছে কিন্তু বাইরে বেরিয়েই ও সেটা ভাঙতে পারলে খুশি হত।'

'তারপর?'

'তারপর মানে?'

'লেডি চ্যাটার্জির মোহভঙ্গ হল কী করে?'

'জানি না।' মাথা নাড়লেন কাবেরী, 'হঠাৎ একদিন টেলিফোন এল। লেডি চ্যাটার্জি বললেন, 'আমি তোমাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে তোমার মেয়ে তৃণার সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই। আমি তাকে চ্যাটার্জি হাউস থেকে বের করে দিয়েছি। তবে হ্যাঁ, যাতে না খেয়ে না মরে তাই মাসে দু'হাজার টাকা সে পাবে।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'হঠাৎ?'

'আমি ভুল করেছিলাম। এবং এই বয়সেও ভুল সংশোধন করতে জানি।'

ব্যাস আর কোনও কথা বলেননি।

আমি খোঁজখবর করলাম। চ্যাটার্জি হাউসের কেউ ভয়ে মুখ না খুললেও কাপুর আঙ্কলও বলব না বলব না করেও কিছু বলে ফেলেন। জানলাম তৃণা বিয়ে করেছে ওর সহপাঠীকে। বিয়ের পরদিন সেটা জানিয়েছে লেডি চ্যাটার্জিকে। লেডি নাকি কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাননি। উলটে ছেলেটিকে দেখা করতে বলেছিলেন। তৃণা ছেলেটিকে নিয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখে একটুও পছন্দ হয়নি লেডির। তিনি বুঝেছিলেন ওই ছেলের মনে কোনও উচ্চাভিলাষ

নেই। অত্যন্ত সাদামাঠা পরিবারের ছেলে, শরীর স্বাস্থ্যও মজবুত নয়। তিনি ছেলেটির সামনেই তৃণাকে জিজ্ঞাসা করেন ওকে কেন সে নির্বাচন করল? তৃণা নাকি জবাব দিয়েছিল মজা করতে গিয়ে ও কনসিভ করে ফেলেছে। এখন আর অ্যাবরশনের সুযোগ নেই, তাই। শুনে খেপে গিয়েছিলেন লেডি চ্যাটার্জি। কাপুর আঙ্কলকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে। তৃণা কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। সে তার ইউরিন পরীক্ষা করার রিপোর্ট দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিল এখন অ্যাবর্ট করা কতটা ঝুঁকির ব্যাপার হবে।

লেডি চ্যাটার্জি চুপ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু কাপুর আঙ্কলকে বলেছিলেন ওই প্যাথলজিতে গিয়ে খোঁজ নিতে। সেখানে প্রভাব খাটাতেই কাপুর আঙ্কলের মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। তৃণার ইউরিন টেস্টের কোনও রেকর্ড প্যাথলজিতে নেই। ওই রিপোর্ট বানানো। একজন বেয়ারা স্বীকার করতে বাধ্য হল যে দশ টাকার বিনিময়ে সে রিপোর্টের ফর্ম একটি ছেলেকে দিয়েছিল।

সেদিন অফিসে খুব জরুরি মিটিং ছিল। সবকটা ডিভিসনের জেনারেল ম্যানেজাররা ছাড়াও সেক্রেটারিরা মিটিং-এ ছিলেন। চিফ মিনিস্টার অনুরোধ করেছেন চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জির প্রস্তাবিত ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স কলকাতায় করতে। এ ব্যাপারে সবাই দ্বিমত পোষণ করছিলেন। কিন্তু কাপুরের মুশকিল হচ্ছিল। প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড থেকে জানাতে তাঁর কেবলই ভুল হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত লেডি চ্যাটার্জি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কাপুর, আমার মনে হচ্ছে তোমার একটু ফ্রেশ এয়ার দরকার।'

'ইয়েস ম্যাডাম।'

সবাই চাপা হাসি হাসল।

মিটিং-এর শেষে সবাই চলে গেলে লেডি চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার প্রবলেমটা কী বলো তো? আজ তোমাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে।'

'না ম্যাডাম—।' কাপুর রুমালে ঘাড় মুছলেন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে। তারপর ফাইল গোছালেন।

'ও হ্যাঁ। তৃণার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছ?'

'হ্যাঁ।' কাপুর ঘাড় নাড়লেন।

'ও যদি সত্যি প্রেগন্যান্ট হয় তা হলে ছেলেটাকে অ্যাকসেপ্ট না করে উপায় নেই। আমার ওকে চাই। সেক্ষেত্রে বেশ জমকালো পার্টি দিতে হয়। আর ওই ছেলের বাবা-মায়ের সঙ্গে আমার বদলে তুমি গিয়ে কথা বলবে।' লেডি উঠে

দাঁড়ালেন। ড্রয়ারের চাবি রোজ যেমন নিজের হাতে বন্ধ করেন আজও তাই করলেন।

'কিন্তু ম্যাডাম!'

'ইয়েস!'

'ওই ইউরিন রিপোর্টটা ঠিক নয়।' কাপুর ফস্ করে বলে ফেললেন।

চোখ বন্ধ করলেন লেডি। পাক্কা পঞ্চাশ সেকেন্ড গুনলেন কাপুর।

'তুমি সিওর?'

'ইয়েস ম্যাডাম। ওইদিন যাদের রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল তাদের নাম এখানে আছে। রেজিস্টার থেকে জেরক্স করে এনেছি। আর—।'

'আর?'

'একটা বেয়ারা স্বীকার করেছে যে টাকা নিয়ে ব্ল্যাঙ্ক ফর্ম দিয়েছে।'

'বাঃ। তা হলে দেখা যাচ্ছে ও মিথ্যেবাদী কিন্তু বুদ্ধিমতী নয়। কে যেন বলেছিল জীবন সমুদ্রের মতো। আর সমুদ্র সব ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু আমি তো লর্ড চ্যাটার্জি নই। আই অ্যাম নট গোয়িং টু অ্যাকসেপ্ট দিস। শোনো, আমি ওর মুখ আর দেখতে চাই না। যা করার তুমি করবে।' দরজার দিকে এগোলেন লেডি চ্যাটার্জি।

'ম্যাডাম।'

'আমি এই মুহূর্তে ওকে ভুলে গেছি। কাল সলিসিটারকে বলবে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমার উইল আমি চেঞ্জ করতে চাই। গুডনাইট।'

সেই রাত্রে কাপুরকে ছুটতে হয়েছিল চ্যাটার্জি হাউসে। তৃণা তখন বারমুডা আর গেঞ্জি পরে দীপের সঙ্গে আড্ডা মারছে। অত রাত্রে কাপুরকে দেখে সে অবাক।

'হাই আঙ্কল। তুমি এখন?'

কাপুর লক্ষ করলেন মেয়েটার চোখ অতিরিক্ত লাল। ঘরে বোঁটকা গন্ধ।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'দীপের সামনে বলতে পারো। ও হ্যাঁ। তোমার লেডির কী হয়েছে বলো তো, আমি ফোন করেছিলাম। শুনলাম, ওঁর শরীর ভাল নেই; শুয়ে পড়েছেন।'

'তৃণা!'

'ইয়েস আঙ্কল।'

'তুমি বিয়ে করেছ এবং বলেছ মা হতে যাচ্ছ। এই সময় যে কোনও মেয়ের উচিত তার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে থাকা। অবশ্য বাচ্চা হওয়ার আগে আসতে পারো।'

'এটা কার কথা? হার ম্যাজেস্টির?'
'হ্যাঁ।'
'ইমপসিব্‌ল। দীপের মা এই বিয়ে মেনে নেয়নি।'
'তা হলে অন্য কোথাও যাও!'
'হোয়াই! এটা আমার বাড়ি। আমি অন্য কোথাও যাব কেন?'
'এটা তোমার মায়েরও বাড়ি, তিনি এখানে থাকেন না।'
'শি ইজ এ সেন্টিমেন্টাল ফুল।'
এই সময় দীপ পেছন থেকে বলল, 'আপনাকে লেডি এ সব বলতে বলেছেন?'
'ইয়েস। তিনি আরও কঠিন ভাবে বলেছেন।'
'আই ডোন্ট বিলিভ দিস। লেডি আমাকে ভালবাসে।' তৃণা বলল।
'উনি কাল সকালের মধ্যে তোমাকে এই বাড়ি ছেড়ে যেতে বলেছেন।'
'বাট হোয়াই?'
'কারণ তুমি প্রেগন্যান্ট নও, মিথ্যে কথা বলেছ।'
'কীসে প্রমাণ হল?'
'ইউ নো বেটার দ্যান এনিবডি।'
তৃণা দীপের দিকে তাকাল। দীপ বলল, 'দ্যাট ওয়াজ এ ব্লাডি ট্রিক!'
'শাট আপ।' চিৎকার করল তৃণা।
'তুমি যদি সত্যি মা হওয়ার দিকে যেতে তা হলে লেডি তোমাদের জন্যে বিশাল পার্টির ব্যবস্থা করতেন।'
সঙ্গে সঙ্গে দীপের দিকে ঘুরে দাঁড়াল তৃণা, 'শুনলি? আমি তোকে কতবার বলেছিলাম কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ করার দরকার নেই, তুই শুনিসনি।'
'এই বয়সে তুই মা হতে পারিস কিন্তু আমি বাবা হতে পারব না।'
দীপ কাঁধ নাচাল, 'কয়েকদিন সময় চা।'
তৃণা কাপুরের দিকে তাকাল।
কাপুর বলল, 'আই অ্যাম সরি। লেডি কোনও সময় দেবেন না।'
দীপ বলল, 'ঠিক আছে, চল, তোর মায়ের কাছে গিয়ে থাকব।'
'মা আমাকে পছন্দ করে না।' তৃণা বলল।
'আমাকে দেখলে করবে।'
'ইউ ডোন্ট নো হার। শি ইজ টেন টাইমস অ্যারোগেন্ট দ্যান দিদা।'
'দেন, মাল ছাড়তে বল। বাড়ি ভাড়া নিতে গেলে টাকা লাগে।' দীপ বলল।

কাপুর বললেন, 'যখন বিয়ে করেছিলে তখনই তোমাদের এ ব্যাপারে ভাবা উচিত ছিল।'

কাপুর ফিরে যাচ্ছিলেন, তৃণা দৌড়ে তাঁর কাছে এসে হাত ধরল, 'ওয়েল কাপুর আঙ্কল, তুমি, তুমি তো আমাকে ভালবাস, তুমি নিশ্চয়ই চাও না আমি ফুটপাথে শুয়ে থাকি, ঠিক আছে, দিদা যখন বলছে তখন এখানে আমরা থাকব না কিন্তু কোথায় যাব বলো! আচ্ছা, তুমি তো বিয়ে করোনি, একা থাক, তোমার ওখানে যদি যাই? না না, বেশি দিন নয়, একটা অন্য কিছুর ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত, তুমি নিশ্চয়ই না বলবে না।'

কাপুর তাকালেন, 'তা হলে আমাকেও চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জি থেকে চলে যেতে হবে। গুড নাইট।' কাপুর বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

কাবেরী চুলে হাত বোলালেন, 'এ সব কথা একটু একটু করে কাপুর আঙ্কলের কাছে পরে শুনেছি, এই মানুষটি আমাকে ভালবাসতেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা গিয়েছিলেন। হরপ্রীতের সঙ্গে পরিচয় ওঁর মাধ্যমে হয়েছিল বলে একটা অপরাধবোধে ভোগেন। উনি পরিচয় না করিয়ে দিলে নাকি আমার জীবনটা এরকম হত না। কী জানি।' কাবেরী অন্যমনস্ক গলায় কথাগুলো বললেন।

'তৃণা আর যোগাযোগ করেনি?' মন্তামামা বললেন।

'না। ও জানে যোগাযোগ করে কোনও লাভ হবে না।'

'কিন্তু এভাবে চললে মেয়েটা তো নষ্ট হয়ে যাবে।'

'তার কিছু বাকি আছে নাকি!' শ্বাস ফেললেন কাবেরী, একটু শব্দ হল।

কাপুরের ফ্ল্যাট থেকে আবার পুরনো ডেরায় ফিরে গিয়েছিল ওরা। হিসেব করে দেখা গেল চিকিৎসা বাবদ পাওয়া পাঁচ হাজার টাকার অনেকটাই রয়ে গেছে। অতএব এখন আর কোনও সমস্যা নেই। দীপ বেশ খুশি। কিন্তু তৃণা মাথা নাড়ল, 'নো! আমাদের আরও অনেক টাকা পেতে হবে।'

'পেতে হবে মানে? কে দেবে?' দীপ বলল।

'সেটা ভাবতে হবে। আচ্ছা তোর পরিচিত এবং আত্মীয়দের মধ্যে যাদের প্রচুর টাকা আছে তাদের একটা লিস্ট কর তো!'

'কেন?'

'টাকা চাইবি। গিয়ে বলবি বিয়ের পর হঠাৎ আমার পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। ডাক্তারবাবু বলছে গলব্লাডারে স্টোন আছে, অপারেশন করাতে হবে।

অন্তত ত্রিশ হাজার টাকা চাই। তুই দশ হাজার জোগাড় করেছিস, বাকিটা যদি ধার পাস—।'

'ধ্যেৎ, কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'কেন?'

'সবাই জানে তুই লেডি কণিকা চ্যাটার্জির নাতনি। ওঁর কাছে ত্রিশ হাজার টাকা থুতু ফেলার মতো ব্যাপার।' দীপ বলল।

'ঠিক। কিন্তু তোর মতো অর্ডিনারি ছেলেকে বিয়ে করেছি শুনে উনি সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। এটা সত্যি কথা, তাই না দীপ?'

'আমি অর্ডিনারি? হায়ার সেকেন্ডারিতে এইট্টি ফাইভ পার্সেন্ট ছিল, মনে নেই?'

দীপ আহত হল। হাসল তৃণা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে, 'জানি জানি, কথাটা যে টাকা দেবে তাকে বলতে বললাম যাতে লেডি চ্যাটার্জির ওপর রেগে যায়। তোর মায়ের কথাও বলবি। মা সৎমায়ের মতো আচরণ করছে।'

'টাকা নিয়ে কী করবি?'

হাসল তৃণা, 'দ্যাখ না কী করি। হাজার নয়, লাখ, কোটি হোক আগে।'

দীপ লিস্ট করল। প্রথম টার্গেট ওর এক কাকা যিনি আলিপুরে থাকেন, অবস্থা খুব ভাল। দুই ছেলে বিদেশে, তারাও টাকা পাঠায়। দীপের মায়ের সঙ্গে ওঁর মন মেলে না বলে বেশ কয়েক বছর যাওয়া আসা বন্ধ।

ট্যাক্সি থেকে বাড়ির কাছাকাছি নেমে তৃণা জিজ্ঞেস করল, 'তোর কতক্ষণ লাগবে বল তো।'

'পাঁচ মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা। যদি রিফিউজ করে তা হলে কে ওখানে বসে থাকবে।' দীপ বলল। ভাড়া মেটাল তৃণা, 'তা হলে আমি এখানে কোথাও, ওই তো, একটা ফাস্ট ফুড জয়েন্ট দেখছি, ওখানেই ওয়েট করছি। উইশ ইউ গুড লাক।'

দীপ এগিয়ে গেলে তৃণা রাস্তা পেরিয়ে দোকানটায় ঢুকল। এখন বিকেল, তবু কোনও খদ্দের নেই। একটা লিমকা চাইল সে।

এই কাকাকে দীর্ঘকাল পরে দেখল দীপ। শেষ দেখেছিল যখন, তখন সে স্কুলের নিচু ক্লাসে। পরিচয় দিলে খুব অবাক হয়েছিলেন ভদ্রলোক। ড্রইং রুমে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনও খারাপ খবর? কষ্ট করলে কেন, ফোন করলেই তো হত।'

'না, সে-অর্থে খারাপ নয়।'
'ও। দাদা কি তোমাকে পাঠিয়েছেন?'
'না। আমি এখন ওই বাড়িতে থাকি না।'
'স্ট্রেঞ্জ! কেন?'
'মা চাননি আমি ওখানে থাকি।'
'বাট হোয়াই!'
'আমার স্ত্রীকে মা মেনে নিতে পারেনি।' কথাটা বলার সময় তাকাল দীপ।
'মাই গড! তুমি, তুমি এই বয়সে বিয়ে করেছ?'
'আপনি কিছু শোনেননি?'
'না। তুমি নিশ্চয়ই জানো তোমাদের ব্যাপারে আমি ইন্টারেস্টেড নই!'
'ও হ্যাঁ:' মাথা নাড়ল দীপ, 'আমি খুব সমস্যায় পড়েছি।'
'বিয়ে করে? মেয়েটা কে?'
'আপনি নিশ্চয়ই লেডি কণিকা চ্যাটার্জির নাম শুনেছেন!'
'কে শোনেনি! তাঁর সঙ্গে কী সম্পর্ক?'
'আমার স্ত্রী ওঁর নিজের নাতনি।'
হাঁ হয়ে গেলেন কাকা। সময় লাগল একটু, 'আচ্ছা!'
'লেডি চ্যাটার্জি বিয়েটা মেনে নেননি।'
'স্বাভাবিক।'
দীপ চুপ করে থাকল। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় আছ?'
'একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছি।'
'রোজগার?'
'চেষ্টা করছি, ব্যবসাও।'
'কীরকম?'
'টুকটাক।'
'সমস্যা কী?'
'দিন পাঁচেক আগে ওর পেটে খুব পেন হয়। ডাক্তার দেখাই, এক্সরে করে দেখা গেছে গলব্লাডারে স্টোন হয়েছে। বেশ বড় বড়। দু'চার দিনের মধ্যে অপারেট করাতে হবে। নার্সিং হোমে গেলে তিরিশ হাজারের মতো খরচ পড়বে। কিন্তু এখন আমি দশ হাজারের বেশি জোগাড় করতে পারিনি।'
'নার্সিংহোম কেন? হাসপাতালে যাও। ওই টাকায় দিব্যি হয়ে যাবে।'
'কথাটা আমি তৃণাকে বলতে পারিনি।'

'তোমার বউয়ের নাম তৃণা?'

'হ্যাঁ। লেডি চ্যাটার্জির নাতনি হিসেবে যে জীবনযাপন করেছে তাতে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাতে ওর মন মেনে নেবে না। এমনিতেও আমরাই ছেলেবেলা থেকে কারও কিছু হলে নার্সিংহোমে গিয়েছি দেখাতে, হাসপাতালে গেছি বলে মনে হয় না।'

'হ্যাঁ। কথাটা ঠিক।' কাকা বললেন, 'তোমার বাবা বা লেডি চ্যাটার্জি কথাটা জানেন? তাঁরা টাকা দিতে চাননি?'

'না। জানেন না। আসলে ওই ব্যবহারের জন্যে তৃণা কিছুতেই ওঁদের কাছে সাহায্য চাইতে রাজি নয়।' দীপ বিনীত গলায় বলল।

'ডাক্তার কে? কোন নার্সিংহোমে অপারেশন হবে?'

দীপ তাকাল। এই প্রশ্নটা শুনতে হবে সে আশা করেনি। বলল, 'ডক্টর এস কে দেব। হেলথকেয়ার নার্সিংহোম।'

'ঠিক আছে। একটু বসো।' কাকা ভেতরে চলে গেলেন।

লিমকা শেষ হতেই তৃণার কানে এল কেউ চেঁচিয়ে তাকে ডাকছে। সে পেছন ফিরে দেখল একটা জেন গাড়ির জানলা থেকে হাত নাড়ছে অঞ্জন সেন। সে খুব অবাক হল। অঞ্জন থার্ড ইয়ারে পড়ে, তার সঙ্গে দু'-একবার কথা বলার চেষ্টা করেছিল, সে খুব পাত্তা দেয়নি। দরজা খুলে গাড়ির বাইরে এসে অঞ্জন বলল, 'হোয়াট এ সারপ্রাইজ? তুমি এখানে?'

'কেন?' কাছে এল তৃণা, 'আপত্তি আছে?'

'আরে না না। এ পাড়ায় তোমায় প্রথম দেখলাম, তাই—।'

'তুমি এ পাড়ায় থাক?'

'হ্যাঁ। ওই বাড়ি।' হাত তুলে একটা গেট বন্ধ বিশাল বাগানওয়ালা তেতলা বাড়ি দেখাল অঞ্জন, 'তোমার যদি অসুবিধে না থাকে তা হলে একবার ঘুরে যাও। আমার মা খুব খুশি হবেন। টেলিগ্রাফে তোমার দিদিমা সম্পর্কে যে ফিচার বেরিয়েছিল সেটা পড়ে উনি খুব এক্সাইটেড।'

ঘড়ি দেখল তৃণা। পনেরো মিনিট হয়ে গেছে। তার মানে দীপ টাকা পাচ্ছে। এই ছেলেটার বাড়ি থেকে যদি কিছু ম্যানেজ করা যায় মন্দ কী! সে 'একমিনিট' বলে দোকানটায় ফিরে গেল, 'এক্সকিউজ মি! একটু বাদে দীপ নামে একটি ছেলে আসবে। তাকে যদি একটু অপেক্ষা করতে বলেন তা হলে খুব ভাল হয়।'

দোকানদার মাথা নাড়ল।

গাড়িতে উঠে বসল তৃণা। ইঞ্জিন চালু করে অঞ্জন বলল, 'ভাবতেই পারছি না তুমি গাড়িতে আমার পাশে বসে আছ। এ সময় এদিকে!'

'একটু দরকার ছিল।'

'তোমার সম্পর্কে কলেজে একটা গুজব ছড়িয়েছে—!' হাসল অঞ্জন।

'কী? বিয়ে করেছি?'

'হুঁ। আমি বিশ্বাস করিনি। ক্লাসমেটের সঙ্গে আড্ডা মারা যায় কিন্তু বিয়ে করা যায় না। গুজবটা নিশ্চয়ই নেহাতই গুজব?'

'উত্তরটা তো তুমিই দিয়ে দিলে।' মুখ ঘোরাল তৃণা। হর্ন বাজতেই গেট খুলল দারোয়ান। বাগান পেরিয়ে গাড়িবারান্দা।

তৃণাকে নিয়ে গিয়ে দোতলার যে ঘরে বসাল অঞ্জন সেটি চমৎকার সাজানো। অঞ্জন বলল, 'বসো, মাকে ডেকে নিয়ে আসি।'

হঠাৎ হুঁশ এল। আচমকা সে চলে এল কেন? এতে অঞ্জন নিশ্চয়ই খুশি হয়েছে কিন্তু তার কী লাভ হচ্ছে! অঞ্জনের কাছে সরাসরি টাকা চাওয়া যায় না। কলেজে প্রচারিত হবে, সে তাকাল। নাঃ, বোকামি হয়েছে।

অঞ্জন মাকে নিয়ে এলেন। মহিলা সুন্দরী, ভারী চেহারার। লেডি চ্যাটার্জির খুব প্রশংসা করলেন। একজন বাঙালি মহিলার কৃতিত্বের জন্যে সবার গর্বিত হওয়া উচিত। কী খেতে ভালবাসে জিজ্ঞাসা করলেন। তৃণা হাসল। তারপর অঞ্জনকে বলল, 'একমিনিটের জন্যে একটু বাইরে যাবে, প্লিজ!'

'ও শিওর।' বলে অঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তৃণা ভদ্রমহিলাকে বললেন, 'আমার খুব খারাপ লাগছে—।'

'কী হয়েছে, বল না?'

'মনে হচ্ছে পিরিয়ড শুরু হয়েছে। আমি তৈরি হয়ে বের হইনি। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলে বাড়ি চলে যেতে পারি। অঞ্জনকে তো এ কথা বলা যায় না।' তৃণা বলল।

'অবশ্যই। কিন্তু বাড়িতে যেতে হবে কেন এ জন্যে! তুমি আমার সঙ্গে চলো।'

'কোথায়?'

'আমার বেডরুমের টয়লেটে। ওখানে সব আছে, কোনও লজ্জা কোরো না।'

'না-না।'

'আঃ। তুমি আমার মেয়ের মতো। এসো।'

কয়েকটা ঘর পেরিয়ে প্রশস্ত বেডরুমে ঢুকে একটা দরজা দেখিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা, 'বাঁ দিকেই দেখতে পাবে।'

অতএব টয়লেট কাম বাথরুমে ঢুকতে হল। দরজা বন্ধ করে নিজেকে গালাগাল দিল সে। বাঁ দিকের পাল্লা খুলে দেখল নতুন প্যাকেট সেখানে দুটো রয়েছে। একটা খুলে ন্যাপকিন বের করে পকেটে ঢুকিয়ে আয়নার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। আয়নার নীচে সোনার গয়না খুলে রেখেছেন অঞ্জনের মা। হয়তো স্নানের আগে খুলেছিলেন পরে ভুলে গেছেন পরতে। কিন্তু আজ উনি এখনও স্নান করেছেন বলে মনে হচ্ছে না। তা হলে ওগুলো কাল থেকেই পড়ে আছে। গয়নাগুলো দেখল তৃণা। একটা বড় হিরের লকেট ঝোলানো চমৎকার সোনার হার। এর দাম কত? এক লাখ? নাকি তারও বেশি। ঝটপট সেটাকে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল সে। তারপর সময় নষ্ট করতে লাগল। তাড়াতাড়ি বের হলে যত সরলই হন ভদ্রমহিলার সন্দেহ হবে।

কাকা ফিরে এলেন একটা প্যাড আর কলম নিয়ে, 'শোনো, তোমাকে কোনও চিন্তা করতে হবে না। বউমার ট্রিটমেন্টের সব দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।'

অবাক হয়ে তাকাল দীপ। ভদ্রলোক হাসলেন, 'বুঝতেই পারছ, আমার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল আজ তার জবাব দেব। হ্যাঁ, তুমি ডাক্তার, বউমার আর নার্সিংহোমের নাম ঠিকানা এখানে লিখে দাও। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব। বউমার অপারেশনের ব্যাপারে যা খরচ হবে তার জন্যে ওরা তোমাকে বিব্রত করবে না। শুধু একটাই অনুরোধ, বউমা ভাল হয়ে বাড়ি যাওয়ার দিন তুমি তোমার মাকে ফোন করে আমার সামনে ঘটনাটা জানাবে। নাও, লেখো।'

কল্পিত নাম ঠিকানা লিখতে বাধ্য হল দীপ।

দূর থেকে দীপকে দেখতে পেল তৃণা। দেখেই বুঝতে পারল খানিকটা। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'টাকা পাসনি?'

মাথা নেড়ে না বলল দীপ, 'হেভি চালু, বোকা বানিয়ে দিল।'

'তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ডাক, এখান থেকে ঝটপট কেটে পড়।'

'কেন?'

'পরে বলছি, ওই যে ট্যাক্সি।'

পড়ি কি মরি করে ওরা ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'গল্পটা কী'?

‘বলছি। আগে তোর কেসটা কী হল বল।’

দীপ জানাল। শেষ করল, ‘বহুৎ ক্লেভার!’

‘রবার্ট ব্রুস হতে হবে দীপ। হার মানলে চলবে না। এসপ্ল্যানেড যাবেন ভাই।’ ট্যাক্সিওয়ালাকে একই ভঙ্গিতে বলে গেল তৃণা।

‘এসপ্ল্যানেড কেন?’

‘অনেক দিন লাইটহাউসের গলিতে শরবত খাইনি।’

‘তুই পারিস। তার জন্যে এত তাড়াতাড়ি করলি?’

তৃণা কিছু বলল না। লাইটহাউসের গলির মোড়ে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে ওরা একটা দোকানে ঢুকে আমের শরবত খেল। তারপর নিউ মার্কেটের গলিতে হাঁটতে হাঁটতে তৃণা নিচু গলায় বলল, ‘গয়না কেনা বেচা করে এমন কাউকে চিনিস? কোনও দোকান?’

‘না। কেন?’

‘তুই যে কী জানিস!’

‘আশ্চর্য, আমি গয়নার খবর রাখব কেন?’

‘বাঃ। আমি তোর বউ, তুই আমাকে গয়না দিবি না?’

দীপ গম্ভীর হল। অন্যরকম গলায় বলল, ‘এইজন্যে আমি তোকে বলেছিলাম কয়েক বছর অপেক্ষা করতে। এখন আমার রোজগার নেই। চাকরির চেষ্টা করছি!’

‘চাকরি? এই কোয়ালিফিকেশনে? কত মাইনে পাবি? গ্রাজুয়েট, এম এ হয়েও লোকে চাকরি পায় না। আর তুই যদি চাকরির চেষ্টা আর করিস তা হলে তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকবে না বলে দিলাম।’ তৃণা বলল।

‘আশ্চর্য! আমাদের চলবে কী করে?’

‘তুই চাকরি করে মাইনে পাবি আর আমি সেই টাকায় বাজার করে রান্না করব, দয়া করে এমন স্বপ্ন দেখিস না। আমি তার জন্যে জন্মাইনি।’

‘তা হলে?’

‘আমরা অ্যাডভেঞ্চার করব। জীবনটা নিয়ে।’

‘কিন্তু টাকা না থাকলে!’

‘টাকা থাকবে, টাকা আমাদের পেছনে তাড়া করবে। আমার ওপর তোর দেখছি একটুও ভরসা নেই। এলগিন রোডে চল।’

‘কেন?’

'ওঃ। কৌতূহল থাকা ভাল কিন্তু তার একটা সীমারেখা থাকা উচিত।' হাসল তৃণা। 'তুই একটা হাঁদা। চল।'

এলগিন রোডের মাঝামাঝি বিরাট সোনার দোকানের সামনে দীপকে দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকল তৃণা। এই দোকানে সে লেডি চ্যাটার্জির সঙ্গে মাত্র একবার এসেছিল। প্রয়োজন হলে এরাই যায় গহনা নিয়ে ওঁর কাছে। কিন্তু গত বছর হঠাৎই লেডি চ্যাটার্জি তাকে নিয়ে আইনক্সে এসেছিলেন ছবি দেখতে। ইংরেজি ছবি। ছবি দেখে বেরিয়ে এই দোকানে ঢুকেছিলেন। দোকানের মালিক সেদিন যে খাতির করেছিলেন তাতে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছিলেন লেডি চ্যাটার্জি।

সেলস কাউন্টারে গিয়ে তৃণা বলল, 'এক্সকিউজ মি, আপনাদের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কেন?'

'সেটা ওকেই বলব।'

'আপনি?'

'বলুন লেডি কণিকা চ্যাটার্জির নাতনি।'

লোকটি একটি কাচের ঘরে চলে গেল। তারপরেই মালিক বেরিয়ে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। সামনে এসে বললেন, 'ওয়েলকাম মিস্। আপনি তো লেডির সঙ্গে সেবার আমার দোকানে এসেছিলেন!'

'হ্যাঁ।'

'বলুন, কী চাই?'

'একটু আলাদা বলা যাবে?'

'শিওর।'

মালিক ওকে নিয়ে গেলেন তাঁর চেম্বারে। বিনীত ভঙ্গিতে তৃণাকে বসিয়ে নিজের চেয়ারে বসলেন, 'বলুন!'

'খুব খারাপ লাগছে বলতে।'

'প্লিজ!'

'আমার সঙ্গে দিদুর মতান্তর হয়েছে। আমি যাকে বিয়ে করেছি তাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে আলাদা আছি। এখন তিনি নরম হয়েছেন, আমাকে স্বামীকে নিয়ে ফিরে যেতে বলছেন। আমি কেন যাব? ঠিক করেছি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবে ফিরব।'

'খুব ভাল।' মাথা নাড়লেন মালিক, 'অবশ্য আমার এই কথাটা লেডিকে

বলবেন না। আপনাকেই বললাম।'

'না। বলব না। মুশকিল হল, আমি যে ভাবে মানুষ হয়েছি তাতে সাধারণ চাকরি করে, বুঝতেই পারছেন।'

'ঠিক ঠিক।'

'কিন্তু আমি দাঁড়াবই। তবে যত দিন না দাঁড়াই তত দিন লড়াই করার জন্যে টাকার দরকার। হ্যাঁ কি না?'

'নিশ্চয়ই হ্যাঁ।'

জিনসের পকেট থেকে হিরের হার বের করল তৃণা, 'এটা দিদুই আমাকে দিয়েছিল। দেখুন তো, এর দাম কত হবে?'

ভদ্রলোক গয়নাটা হাতে নিয়ে বললেন, 'এটা তো আমাদের দোকান থেকে বিক্রি হয়নি।'

'কী করে হবে? দিদু তো বোম্বে থেকে কিনেছিলেন।'

'তাই বলুন। কলকাতায় উনি আমাদের ছাড়া কোনও দোকানে যান না। হুঁ। এ তো আসল হিরে।' ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান, 'এক মিনিট।'

উনি বেরিয়ে গেলে তৃণা চোখ বন্ধ করল। ভদ্রলোক কি অন্য ঘরে থেকে দিদুকে ফোন করবেন? করলেই হিট উইকেট হয়ে যাবে!

মিনিট আটেক বাদে যখন উদ্বেগে তৃণা উঠে দাঁড়িয়েছে ঠিক তখন ফিরে এলেন ভদ্রলোক চিন্তিত মুখে, 'খুব দুঃখিত মিস, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখতে হল আপনাকে। কিন্তু এত মহামূল্যবান গয়না। এটা কেনার ভ্যালিড পেপার আপনার কাছে আছে?'

মাথা নাড়ল তৃণা, 'না। নেই। ওটা দিদুর কাছে থাকলেও থাকতে পারে।'

'নিয়ে আসলে সুবিধে হবে মিস্।'

'কী করে আনব? তা হলে তো দিদুর কাছে সারেন্ডার করতে হয়!'

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, 'দেখুন, সোনা নিয়ে আমি ভাবছি না। কত আছে, বড় জোর দু'ভরি। কিন্তু উইদাউট পেপার এই হিরে কেনা-বেচা সম্পূর্ণ বেআইনি।'

'তা হলে কী হবে?' তৃণা বলল, 'আপনি আমার উপকার করবেন না?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু যাকে আমি বিক্রি করব সে তো পেপার ছাড়া কিনতে চাইবে না, আর কিনলেও বাজারদর থেকে অনেক কম দেবে।'

'কত কম?'

'অনেক। ধরুন পঞ্চাশ।'

'মাত্র পঞ্চাশ? অন্তত পঁচাত্তর না পেলে— ঠিক আছে, দিন, ওটা আমি দিদুকেই ফেরত পাঠিয়ে দেব।' হাত বাড়াল তৃণা।

'আপনি বলেছিলেন আপনার টাকার খুব প্রয়োজন—!'

'হ্যাঁ, তাই বলে ওই টাকায় কী করে দেব? দিদু শুনলে কী বলবেন!'

'মাই গড। এটা আমার কাছে বিক্রি করলে ওঁকে জানাবেন নাকি?'

'একদম না। কেন জানাব? আপনি আমার উপকার করলে—।'

'মিস। ষাট। ব্যাপারটায় ঝুঁকি আছে। আমি ষাটের বেশি দিতে পারব না। খদ্দের ষাটের বেশি কিছুতেই দেবে না। এতে আমার কোনও প্রফিট নেই। এরকম কাজ আমি করি না। শুধু আপনাদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ভেবেই—।' হাসলেন ভদ্রলোক।

যেন বাধ্য হয়ে রাজি হল তৃণা, ' ঠিক আছে।'

'এক মিনিট প্লিজ!' ভদ্রলোক উঠে গেলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফিরে এলেন একটা প্যাকেট নিয়ে, 'দুটো বান্ডিল আছে। পাঁচশোতে পঞ্চাশ, একশোতে দশ। একেবারে ব্যাঙ্ক নোট। গোনার পরিশ্রম বেঁচে গেল।'

প্যাকেট থেকে বান্ডিল দুটো বের করে দুই পকেটে ঢুকিয়ে নিল তৃণা, 'অনেক ধন্যবাদ। দয়া করে কথাটা যাতে দিদুর কানে না যায়, তা হলে এত কমে বিক্রি করেছি শুনলে আমাকে খুব বকবেন!'

'না না। ইট উইল বি এ টপ সিক্রেট।' ভদ্রলোক তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন, 'আমার দরজা আপনার জন্যে সবসময় খোলা রইল। আপনার কাছে যদি এরকম দামি জিনিস থাকে, প্রয়োজন হলে আসবেন মিস। আই অ্যাম অ্যাট ইওর সার্ভিস।'

মাথা নেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল তৃণা।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বান্ডিল দুটো বের করল তৃণা। চোখ বড় হয়ে গেল দীপের, 'এ কী রে! এত টাকা। কোথায় পেলি?'

হাসল তৃণা, 'মিসেস লছমী নারায়ণম্ দিয়েছেন।'

'তিনি কে?'

'তুই চিনবি না!'

'কিন্তু এত টাকা তুই রাখবি কোথায়? এখানে?'

'পাগল! কিন্তু আমার খুব খিদে পেয়েছে।'

'খাবার আনব?'

'না। আজ একটু জমিয়ে খাওয়া যাক। তুই স্নান করে নে।' পকেট থেকে ন্যাপকিনের প্যাকেটটা বের করল তৃণা, ছুড়ে মারল ঘরের কোণে।

'ওটা কী?'

'মেয়েলি ব্যাপার। তোর দেখার দরকার নেই।' সিগারেটের প্যাকেট থেকে সরু সিগারেট বের করে আগুন ধরাল তৃণা, 'আমাদের টাকা পেতে হবে দীপ, অনেক টাকা।'

দুপুরবেলায় ওরা একটু সেজেগুজে বের হল। ঘরে টাকা রাখতে সাহস না পাওয়ায় বান্ডিল দুটো পকেটেই রেখেছিল তৃণা। দু'পাশে হিন্দিভাষী মানুষ লুঙ্গি পরে ঘুরছে। ফুটপাতের এক জায়াগায় ছোট্ট ভিড়। দীপ দেখল তাদের বাড়িওয়ালাও ওই ভিড়ে আছে। চোখাচোখি হতে সে ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে?

লোকটা বেরিয়ে এসে হাসল, 'সবাই পেন্সিলারের কাছে লাগাচ্ছে।'

'লাগাচ্ছে মানে?'

'আজ দুটো থেকে রেস। যারা মাঠে যেতে পারে না, বেশি টাকাও নেই তারা এই পেন্সিলারের কাছে অল্প টাকা স্লিপে খেলে। আজ খবর এসেছে তিন নম্বর রেসের পাঁচ নম্বর ঘোড়া জিততে পারে। তাই সবাই পাঁচ দশ লাগাচ্ছে।' লোকটি জানাল।

মাথা নেড়ে ওদের ছেড়ে এগিয়ে চলল দীপ, তৃণার পাশাপাশি।

পার্ক স্ট্রিটের রেস্টুরেন্টে দু'জনের বিল হল সাড়ে তিনশো টাকা। এখনও আগের পাঁচ হাজারের অনেকটাই রয়ে গেছে। তা থেকেই বিল মেটাল দীপ, খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। দীপের একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে রাতদিনের নামী ব্যাঙ্কে। কিন্তু সেখানে যতটা না রাখলে অ্যাকাউন্ট চালু থাকবে না তার বেশি নেই। আপাতত ওই অ্যাকাউন্টে টাকাটা রাখা যেতে পারে।

দুটো বেজে গেছে। তৃণা বলল, 'চল!'

'বাড়ি?'

'না। চল একটু ঘুরে আসি।'

ট্যাক্সিতে উঠে তৃণা বলল, 'রেস কোর্স।'

দীপ চমকে উঠল, 'সে কী রে!'

'চল না, কখনও তো যাইনি। তুই গিয়েছিস?'

'না।'

'একটা কথা আছে, বিগিনার্স লাক, ট্রাই করা যাক।'

'বেশি খেলিস না। পঞ্চাশ কী একশো।'

দুশো টাকার টিকিট কেটে ওরা যখন রেসকোর্সে ঢুকল তখন দ্বিতীয় বাজি শুরু হচ্ছে। সুসজ্জিত পুরুষ মহিলার ভিড়। কিন্তু বাজারের আবহাওয়া নয়। কোথায় টিকিট বিক্রি হয়, কোথায় বুকিরা মোটা টাকার বেটিং নিয়ে কার্ড দিচ্ছে, ঘুরে ঘুরে দেখল ওরা। দ্বিতীয় বাজির ঘোড়াগুলোকে ছুটতে দেখল। দর্শকদের প্রবল চিৎকারের মধ্যে এক নম্বর ঘোড়া জিতে গেল। বোর্ডে ডিভিডেন্ড টাঙিয়ে দেওয়া হল, দশ টাকায় বাইশ টাকা।

তৃতীয় বাজির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে সবাই। তৃণা দেখল পাঁচ নম্বর ঘোড়াটার দাম দশ টাকায় তিরিশ টাকা। দীপকে কথাটা বলল সে।

দীপ বলল, 'একশো টাকা খেললে তিনশো টাকা।'

'যদি জেতে।'

'চান্স নেওয়া যেতে পারে, গেলে তো একশো যাবে।'

পাশে বসা এক বৃদ্ধ বললেন, 'একশো খেললে বুকে গিয়ে খেলো। হয়তো একশোতে চারশো পেয়ে যাবে। শুধু খেলার সময় পনেরো টাকা ট্যাক্স দিতে হবে। বুকে তো একশোর নীচে খেলা যায় না।'

তৃণা বলল, চল।

বুকিদের সামনে বেশ ভিড়। সব বুকি পাঁচ নম্বরের দর দিয়েছে দুই। অর্থাৎ একশো খেললে তিনশো, এর ওপর ট্যাক্স বাদ যাবে। হঠাৎ কিছু লোক হুড়মুড় করে এক নম্বর ঘোড়ার ওপর টাকা লাগাতে দর বদলে গেল। এক নম্বরের দর পড়ে গেল, পাঁচ নম্বরের হল চার। অর্থাৎ একশো টাকায় পাঁচশো। দীপ বলল, 'খেলি?'

সে বান্ডিল থেকে কুড়িটা পাঁচশো টাকার নোট বের করে একজন বুকিকে দিয়ে বলল, 'পাঁচ নম্বর।'

টাকা গুনে নিয়ে বুকি বলল, 'হাফ ট্যাক্স দিন, সাতশো পঞ্চাশ টাকা।'

তৃণা আরও দুটো পাঁচশোর নোট এগিয়ে দিলে লোকটা একটা কার্ডে বেটিং লিখে আড়াইশো ফেরত দিল।

দীপ হতভম্ব। কোনওক্রমে বলল, 'তুই অত টাকা খেললি?'

'হুঁ।'

মিনিট তিনেক বাদে দেখা গেল আর একজন বুকি পাঁচ নম্বরের দর দিয়েছে সাড়ে চার। তৃণা একুশ হাজার পাঁচশো বের করে লোকটাকে দিয়ে বলল 'কুড়ি।'

লোকটা অবাক হয়ে তাকাল। তারপর টাকা গুনে কার্ড লিখে দিল।

বাজি শুরুর আগে চল্লিশ হাজার টাকা পাঁচ নম্বর ঘোড়ার ওপর লাগিয়ে দিল তৃণা। তার জন্যে তিন হাজার টাকা ট্যাক্স নিল ওরা। এখনও সতেরো হাজার রয়েছে পকেটে। ওই টাকায় অনেক দিন চলে যাবে।

গ্যালারিতে বসল ওরা। দীপ কথা বলছে না। কাঠ হয়ে আছে।

তৃণা হাসল, 'টাকাটা তো আমার নয়। আমরা রোজগারও করিনি। গেলে যাবে। অত নার্ভাস হচ্ছিস কেন?'

'ইচ্ছে করে নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।' দীপ বলল।

'আমরা বিয়ে করব বলে যে ঝুঁকি নিয়েছি তার কি কোনও মানে হয়?' তৃণা সরাসরি জিজ্ঞাসা করল।

'এ দুটো কি এক হল?'

'অলমোস্ট। দুটোই গ্যাম্বলিং।' দীপের হাত ধরল তৃণা।

তৃতীয় বাজি শুরু হল। অনেকগুলো ঘোড়া বহু দূর থেকে দৌড়ে আসছে, রিলে হচ্ছে কিন্তু নাম্বার না বলে নাম বলছে। পাঁচ নম্বরের নাম মাস্টার অব দ্য গেম। তার নাম শুনতেই পাচ্ছিল না ওরা। দীপ ফিসফিস করে বলল, 'নাম বলছে না রে।'

বাঁক ঘুরল ঘোড়াগুলো, এক ঘোড়া বাকিদের থেকে অনেকটা এগিয়ে আছে। প্রবল চিৎকার করছে দর্শকরা। ঘোড়াটা তাদের সামনে দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার সময় দীপ চিৎকার করে উঠল, 'পাঁচ নম্বর, পাঁচ নম্বর।'

পাঁচ নম্বর জিতে গেল।

মোট দু'লক্ষ পনেরো হাজার টাকা নেওয়ার মতো জায়গা সঙ্গে ছিল না। ওদের বয়স দেখেই বোধ হয় একজন বুকি একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ দিলেন, 'সাবধানে নিয়ে যাবে। দিনকাল খুব খারাপ।'

ট্যাক্সিতে বসে দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তোর উত্তেজনা হচ্ছে না?'

'ভাল লাগছে।' তৃণা বলল।

'শুধু ভাল লাগছে?'

'এই তো শুরু। দাঁড়া না।' তৃণা বলল, 'তোর ব্যাঙ্কে আমার নামে অ্যাকাউন্ট খুলব।'

দীপ তাকাল, 'বেশ তো। সন্ধে অবধি খোলা থাকে। চল গিয়ে কথা বলি।'

আবদুলকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছিল কাবেরী। আজ সকালে মন্তামামাকে না দেখে ওঁর ঘরে গিয়ে আবিষ্কার করলেন ভদ্রলোক জ্বরে কাহিল। তাঁকে দেখে স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করে বলেছিলেন, 'এমন কিছু নয়, একটু ফিবারিশ।' কাবেরী ওঁর কপালে হাত রেখে বুঝেছিলেন বেশ ভাল রকমের জ্বর।

এখানে তাঁর কখনও ডাক্তারের প্রয়োজন হয়নি। এই ছোট্ট শহরে কোনও ডাক্তার আছেন কি না তাও জানা নেই। খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। আবদুল কাউকে ধরে না আনতে পারলে ওকে দার্জিলিং-এ পাঠাতে হবে। তেমন বুঝলে মন্তামামাকে নিয়ে শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে যেতে হবে।

এরকম নির্জনে ততক্ষণই ভাল থাকা যায় যতক্ষণ না শরীর বিকল হয়। মন্তামামার জ্বর কী ধরনের তার ওপর ওঁর এখানে থাকা নির্ভর করছে। এই পাহাড়ে সুস্থ না থাকলে টিকে থাকা বড় সমস্যা।

দশটার সময় গাড়িটা এল। আগেভাগে ব্যাগ নিয়ে দৌড়ে ভেতরে এসে আবদুল জানাল, 'ডাক্তার সাব এসেছেন।'

কাবেরী বাগানে বসেছিলেন, উঠলেন। ততক্ষণে ডাক্তার চলে এসেছেন।

'গুড মর্নিং।' কাবেরী বললেন।

'গুড মর্নিং।' ডাক্তার মাথা নাড়লেন। পঞ্চাশের আশপাশে বয়স। বেশ পেটানো শরীর। লম্বাও। পরনে লালচে জ্যাকেট।

'আমি কাবেরী। আসুন, পেশেন্ট আমার মামা—।'

ডাক্তারকে নিয়ে মন্তামামার ঘরে এলেন তিনি। একটা চেয়ার টেনে বসে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে আপনার?'

'নাথিং। বাড়াবাড়ি করছে মেয়েটা। সামান্য জ্বর—।'

'দেখি হাতটা।'

মিনিট চারেক ধরে নানা পরীক্ষা করার পরে স্টেথো ব্যাগে ঢুকিয়ে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু খেয়েছেন?'

'নাঃ। ভাল্লাগছে না।'

'উঁহু। যা রোজ খেয়ে থাকেন তাই খেতে হবে। আমি ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। যদি কাল সকালের মধ্যে জ্বর কমে যায় তা হলে তো ল্যাটা চুকেই গেল, নইলে কাল ব্লাডটা পরীক্ষা করাব। ঠিক আছে?' ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন।

'ধন্যবাদ।'

কাবেরী হাসলেন, 'এয়ার ফোর্সের বড় অফিসার ছিলেন, দেখে কে বলবে!'

'এয়ারে যিনি স্বচ্ছন্দ তিনি মাটিতে একটু কাবু হতেই পারেন।'

লোকটি রসিক, কাবেরী বুঝলেন।

ওঁরা বেরিয়ে এলে কাবেরী বললেন, 'যদিও এটা আপনার প্রফেশনাল ভিজিট, তবু প্রথম এলেন। এককাপ চা খাওয়ার সময় কি আপনার আছে?'

'অবশ্যই।'

আবদুলকে নির্দেশ দিয়ে ডাক্তারকে বাগানেই বসালেন কাবেরী।

ডাক্তার বললেন, 'আমি চন্দ্রনাথ মুখার্জি। থাকি দার্জিলিং-এ।'

'দার্জিলিং-এ?' অবাক হলেন কাবেরী।

'আজ সকালে একটা প্রয়োজনে এখানে এসেছিলাম। চৌমাথায় যে ওষুধের দোকান রয়েছে সেখানে গিয়ে কথা বলার সময় শুনলাম আপনার লোক ডাক্তারের খোঁজ করছে। তখনই জানতে পারলাম আপনি লেডি কণিকা চ্যাটার্জির মেয়ে।' চন্দ্রনাথ হাসলেন।

'কী আশ্চর্য! খবরটা এখানে প্রচারিত হয়ে গেছে! আমি তো কোথাও যাই না।'

'তেমন ভাবে হয়নি। হলে দার্জিলিং-এ বসে আমি জানতে পারতাম।' বলার ভঙ্গিটা এমন ছিল যে কাবেরী শব্দ করে হেসে ফেললেন। গলা মেলালেন চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনার এই বাড়িটি বেশ সুন্দর। এই বাগানে বসলে মন ভাল হয়ে যায়।'

'বাড়িটা আমার মায়ের, আমি আছি, এই অবধি। হ্যাঁ, সত্যি ভাল লাগে। হ্যাঁ, আপনার পেশেন্টকে কেমন দেখলেন? সিরিয়াস কিছু? ওঁর বয়স হয়েছে বলে জিজ্ঞাসা করছি।'

'মনে হয় না। বোধহয় ঠান্ডা লাগিয়েছেন। কালই ঠিক হয়ে যাবেন।'

'আপনি কি দার্জিলিং-এর হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত?'

'না। বহুকাল বিদেশে ছিলাম। আচমকা স্ত্রী দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ায় চলে এলাম দেশে। কলকাতায় খুব খারাপ লাগছিল থাকতে। চলে এলাম দার্জিলিং-এ। ওখানকার কয়েকটি সেবা-প্রতিষ্ঠানে সময় দিই। একটা ছোট্ট বাড়ি কিনেছি জলাপাহাড়ে। ভালই আছি।' চন্দ্রনাথ বললেন, 'কিন্তু আপনি এত অল্প বয়সে স্বেচ্ছানির্বাসনে কেন?'

'প্রথম কথা, আমার বয়স মোটেই অল্প নয়। ছোটমেয়ের বয়স উনিশ, বড়র তেইশ, চব্বিশ। ওরা অবশ্য স্বাধীন হয়ে থাকাই পছন্দ করেছে। আর আমি

নির্বাসনে নই। এই ফুল, বাগান, কুয়াশা, পাহাড় নিয়ে বেশ আরামসে আছি।' কাবেরী বললেন।

আবদুল চা নিয়ে এল। সেটা খাওয়ার পর ডাক্তার ব্যাগ থেকে দু'ধরনের ওষুধ বের করে বুঝিয়ে দিলেন কখন কীভাবে খাওয়াতে হবে। তারপর বললেন, 'চলি।'

'এক মিনিট।' কাবেরী ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন। কিন্তু ডাক্তার তাঁর আপত্তি জানালেন, 'না। আপনাকে এখনই ভেতরে যেতে হবে না।'

'তার মানে?'

'আপনি আমার দক্ষিণা আনতে যাচ্ছিলেন তো!' চন্দ্রনাথ হাসলেন, 'ওটা তো পেয়ে গেছি। আর কী?'

'মানে?'

' এই যে দারুণ চা খাওয়ালেন, এর বেশি কী চাই!'

'না। আপনি ডাক্তার, কত কষ্ট করে এসেছেন, আপনাকে দক্ষিণা না দিলে মন্তামামার অসুখ সারবে না। তা ছাড়া আপনি যদি এখানে না আসতেন তা হলে কী বিপদে পড়তাম।' কাবেরী ভেতরে চলে গেলেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন পার্স নিয়ে। 'আমার কোনও ধারণা নেই, কী দিলে আপনাকে অসম্মান করা হবে না—।'

'একটাকার কয়েন!'

'না-না। প্লিজ—।'

'শুনুন কাবেরী, যে সব ভারতীয় বিদেশে চাকরি করতে যায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয় করেন ডাক্তাররা। আমি যা আয় করেছি তারপর ভারতীয় টাকায় আর আয় করার প্রয়োজন নেই। উলটে যা সুদ পাই তার অর্ধেকটাই আমি পাহাড়ি মানুষদের জন্যে খরচ করার চেষ্টা করি। ওই এক টাকার বেশি দিলে আমি অসম্মানিত হব।' চন্দ্রনাথ হাত বাড়ালেন, 'কই দিন।'

মাথা নাড়লেন কাবেরী, তারপর এক টাকার কয়েন পার্স থেকে বের করে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রনাথ হাঁটু মুড়ে বসে একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার ভেতর কয়েনটাকে ঢুকিয়ে মাটি চাপা দিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হয়ে গেল।'

'ওটা কী হল?'

'চিলিতে ভিনা ডেল মার নামে একটা জায়গা আছে। সেখানকার

আদিবাসীরা নতুন কারও সঙ্গে আলাপ হলেই মাটিতে একটা কয়েন পুঁতে ফেলে। কেন জানেন? আর যাই হোক সেই লোকটির সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে যেন কোনও ঝগড়া কখনও না হয়।' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বললেন, 'কাল দয়া করে আপনার মামার রিপোর্টটা জানাবেন।'

চন্দ্রনাথকে তাঁর গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন কাবেরী। ব্যাপারটা আবদুলকেও অবাক করল। মেমসাব তো কাউকে এত সম্মান জানান না। অবশ্য বেশিরভাগ আগন্তুকের সঙ্গে উনি দেখাই করেন না। গাড়ি চোখের আড়ালে চলে গেলে কাবেরী কার্ডটায় চোখ রাখলেন। আশ্চর্য, ভদ্রলোক নামের আগে ডক্টর শব্দটি যেমন লেখেননি, নামের পর অর্জিত ডিগ্রিও বসাননি। ওঁর মনে হল, লোকটি বেশ, অন্যদের থেকে আলাদা।

বিকেল নাগাদ মন্তামামার জ্বর ছেড়ে গেল। শাল গায়ে না দিয়ে চেয়ারে বসেছিলেন, কাবেরী তাঁকে ধমকালেন, 'দিনকে দিন বাচ্চা হচ্ছ, না?'

মন্তামামা বললেন, 'আর একটু বকো। খুব ভাল লাগছে শুনতে।'

কাবেরী বললেন, 'তা তো লাগবেই। যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে!'

'এই ডাক্তারটি কিন্তু ভাল। চমৎকার ওষুধ দিয়েছে!'

'আমি ওষুধ দিলেও সেরে যেত, তোমার কিছুই হয়নি।'

'না না। কথাবার্তা বেশ ভাল। ভাবছি, মাঝে মাঝে ওর ওখানে যাব গল্প করতে, কোথায় থাকে জেনে নিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ। তোমাকে দার্জিলিং যেতে হবে তা হলে।'

'সে কী? এখানে থাকে না?'.

' না।' ঘড়ি দেখলেন কাবেরী, ছ' টা বাজতে পনেরো মিনিট। বাইরে সন্ধে নেমে গেছে। বললেন, 'আবদুলকে বলে দিচ্ছি, একটু বাদে চিকেন স্যুপ আর টোস্ট দিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে খেয়ে নিয়ে।'

'তুমি কি এখন গুহায় ঢুকে পড়বে?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা! রোজ এক রুটিন কেন? তুমি তো আমার সামনে বসেও পান করতে পারো। তার জন্যে দরজা বন্ধ করতে হবে কেন?'

হাসলেন কাবেরী, 'দরজা বন্ধ করে আমি পান করি না।'

বাইরে বেরিয়ে আসতেই আকাশে মেঘের ঘনঘটা চোখে পড়ল। তুমুল বৃষ্টি হবে আজ। আবদুলকে ডেকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই টেলিফোন বেজে উঠল। এই সময় কে ফোন করল?

নিজেই রিসিভার তুললেন কাবেরী, 'হ্যালো।'

'কাবেরী?'

'ইয়েস।'

'কাবেরী, আমি হরপ্রীত। তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। কাল রাত্রে তোমার মেয়ের ফোন পেলাম। কী ব্যাপার জানবার জন্যে সকাল হতেই তোমায় ফোন করছি।' হরপ্রীত দ্রুত ইংরেজিতে বলল।

'ও কেন ফোন করছে তা ওই জানে, আমার জানার কথা নয়।'

'ও বলল দীপ বলে কোনও ছেলেকে আমেরিকান ভিসার জন্যে স্পনসর করতে।'

'দীপ!'

'হ্যাঁ। কে দীপ জিজ্ঞাসা করতে বলল, ছেলেটার সঙ্গে ও স্টে টুগেদার করে।'

'কী?'

'হ্যাঁ। আমি খুব অবাক হয়েছি। এটা তো তোমার মা বা তোমার মেনে নেওয়ার কথা নয়। ব্যাপারটা কী?' হরপ্রীত জিজ্ঞাসা করল।

'আমি জানি না। জানতেও চাই না। ও তোমাকে ফোন করেছে বলে এত দিন পরে খোঁজ খবর যখন নিচ্ছ তখন ব্যাপারটা কী তা ওকেই জিজ্ঞাসা কোরো।' রূঢ় গলায় বললেন কাবেরী।

'করতাম। কিন্তু ও বলল ওর কোনও ফোন নাম্বার নেই।'

'সেটা তোমাদের সমস্যা। আমাকে বিরক্ত কোরো না।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন কাবেরী। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন হরপ্রীত তাকে ইচ্ছে করে টিজ করছে। যে লোকটা এতগুলো বছরে ফোন করার প্রয়োজন মনে করেনি স্বাভাবিক কারণে, সাদা আমেরিকান বউয়ের সেবায় যার দিন কেটেছে তার তো মেয়ের ফোন পেলে মজা লাগবেই।

শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে পোশাক পালটালেন কাবেরী। কালো আলখাল্লাটা পরে নিয়ে মাথায় কালো কাপড় জড়ালেন। তারপর স্ফটিক গোলকটির সামনে বড় বড় দুটো মোমবাতি জ্বাললেন। সন্ধে ছ'টা বেজে গেছে।

ঘরের দক্ষিণ কোণে কার্পেটের ওপর লাল কাপড়ে মোড়া বেদির ওপর স্ফটিক গোলকটিতে আলো পড়ায় রহস্যময় দেখাচ্ছে। ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেন কাবেরী। তারপর বেদির সামনে পদ্মাসনে বসলেন। প্রথম প্রথম

পদ্মাসন করতে খুব কষ্ট হত। মিনিট পনেরোর মধ্যে শরীর বিদ্রোহ করত। তখন আর পারতেন না। একবার আসন ভাঙলে সেই রাতে আর আসনে বসে লাভ নেই। তখন মন খুব খারাপ হয়ে যেত। দু'তিনটে হুইস্কি খেয়ে শুয়ে পড়তেন। কিন্তু ধীরে ধীরে অভ্যেস তৈরি হল। এখন স্বচ্ছন্দে সাত ঘণ্টা একই ভাবে পদ্মাসনে থাকতে পারেন, শরীরে সামান্য অস্বস্তি হয় না। প্রায় তেরো বছরের অনুশীলনে এটা সম্ভব হয়েছে।

সমস্ত ঘর অন্ধকার। শুধু স্ফটিক-গোলকটির ওপর মোমবাতির আলো পড়ায় তার কিছুটা ফিরে আসছে ঘরের খুব সামান্য অংশে। মেরুদণ্ড টানটান করে পদ্মাসনে বসে কাবেরী তাকালেন গোলকটির দিকে। মিনিট খানেকের মধ্যে যাবতীয় চিন্তা ভাবনা, তাঁর চারপাশের পৃথিবীর ছবি মন থেকে উধাও হয়ে গেল। সমস্ত চিন্তাশক্তিকে একত্রিত করে সূঁচের মতো স্ফটিক গোলকটির গভীরে প্রবেশ করাতে চাইলেন তিনি; এই দীর্ঘকাল ধরে প্রতি রাতে একই চেষ্টা চালিয়ে গেছেন কাবেরী। ঠিক যেভাবে ন্যান্সি তাঁকে শিখিয়েছেন সেই ভাবে। বলেছিলেন, শুরু যখন করেছ তখন হাল ছেড়ো না। মাঝপথে থামলে যত দূরে তুমি এগোবে তার দ্বিগুণ পিছিয়ে যাবে। বাড়িতে ঘর ছিল কম। সন্ধে ছ'টার সময় দরজা বন্ধ করলে হই হই শুরু হয়ে যেত। দুটো বাচ্চাই তাকে দেখার জন্যে বেশি চেঁচামেচি শুরু করত। একদিন হরপ্রীতও বলেছিল, 'এসব কী নাটক শুরু করেছ। সন্ধেবেলায় ঘরের দরজা বন্ধ করে কী করো? বাচ্চাগুলোর কথা মনে থাকে না?'

কাবেরী জবাব দিয়েছিলেন, 'পুজো করি।'

'পুজো?' হো হো শব্দে হেসে উঠেছিল হরপ্রীত, 'একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না।'

কথাটা ন্যান্সিকে জানিয়েছিলেন কাবেরী। ন্যান্সি বলেছিলেন, 'তোমার সমস্যা বুঝতেই পারছি। ঠিক আছে, তুমি এখন আংশিক অনুশীলন করো। রোজ বিকেলে আমার এখানে চলে এসে রাত ন'টা পর্যন্ত নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করো। বাড়িতে বলে এসো তোমার ডিউটি রাত নটায় শেষ হয়ে যাবে। সে সময় আমার এখান থেকে চলে যাবে। যাওয়ার আগে ভুল করেও আমাকে ডেকো না। বাইরের দরজা টেনে দিলেই বন্ধ হয়ে যাবে।'

তাই শুরু হল। পাশের ঘরে একটা স্বল্প আলোর গোলাকার টেবিল ল্যাম্পের সামনে বসতে হত তাঁকে। কিন্তু বেশিক্ষণ বসার মতো অবস্থায় আসতে প্রায় বছর ঘুরল। একদিন সময় যখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা, ন্যান্সির বাড়িতে যাওয়া মাত্র

নান্সি বললেন, 'তোমাকে আজ বাড়িতে ফিরে যেতে হবে।'

'কেন?' অবাক হলেন কাবেরী।

'কেন বলছি, কীভাবে জেনেছি এই প্রশ্নগুলো কোরো না। সন্ধে সাতটা নাগাদ বাড়িতে ফিরে যাবে। এমন হতে পারে তুমি গিয়ে দেখলে সব কিছু স্বাভাবিক। গতকাল যা ঘটেছে আজ তাই ঘটবে এমন তো বেশিরভাগ সময়ে হয় না। কিন্তু যদি একই ঘটনা ঘটে তা হলে কিছুতেই মাথা গরম কোরো না। ধরে নেবে এটা তোমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট। তোমাকে অন্য পথে যাওয়ার জন্যে এই ঘটনা সাহায্য করল।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এর বেশি আমি কিছু বলতে পারছি না। সত্যি কথা বলছি আমি অনেকটাই অনুমানের ওপর নির্ভর করে।' আশা করি তেমন কিছু হলেও তুমি কালকে আমার কাছে আসবে।'

প্রবল বিস্ময় নিয়ে ফিরে এসেছিলেন কাবেরী। বাড়ির কাছাকাছি পার্কে গিয়ে দ্যাখেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে ওই সন্ধেবেলায় বেবিসিটার বসে আছে। অবশ্য তখনও প্রচুর বাচ্চা পার্কে খেলছে। মেয়েটা ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বায়না করল আইসক্রিমের জন্যে।

কাবেরী বেবিসিটারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত রাত পর্যন্ত এখানে কেন?'

ছেলে জবাব দিল, 'মা, এখনও রাত আসেনি কারণ সন্ধে যায়নি।'

দুটো ডলার ছেলের হাতে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'বোনকে আইসক্রিম কিনে দিয়ো, তুমিও খেয়ো। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে বাড়িতে চলে আসবে।'

'দশ মিনিট পরে তো আটটা বাজবে না।' ছেলে আপত্তি জানাল।

'আটটার সঙ্গে তোমাদের কী সম্পর্ক?'

'বাবা বলেছে আটটার পর আসতে। এই দ্যাখো বাড়ির চাবি দিয়ে দিয়েছে।'

'তোমরা কখন এখানে এসেছ?'

'ছ'টায়।'

'দেখি, চাবিটা দাও।'

ওদের পার্কে রেখে দ্রুত হাঁটলেন কাবেরী। ছেলেমেয়েদের চাবি দিয়ে পার্কে পাঠানোর মতো ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে বন্ধ দরজায় চাবি ঢুকিয়ে খুললেন কাবেরী। শব্দ হল না। প্যাসেজে আলো জ্বলছে। হঠাৎ কানে আওয়াজ এল। নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনে পাথর হয়ে গেলেন তিনি। শব্দটা ভেসে আসছে হরপ্রীতের

বেডরুম থেকে। নিঃশব্দে পা ফেলে সেই ঘরের দরজায় দাঁড়াতেই দেখলেন একটা সাদা বিবস্ত্র যুবতী হরপ্রীতকে জড়িয়ে ধরেছে। হরপ্রীতের শরীর পোশাকমুক্ত। হাসতে হাসতে যুবতী বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। ইউ আর ওয়ান অব দ্য গ্রেটেস্ট ফাকার অব দ্য ওয়ার্ল্ড।'

চোরের মতো পালিয়ে এলেন কাবেরী। নিজের ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসেও তাঁর শরীর থেকে থরথরানিটা যাচ্ছিল না। হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হল। ইচ্ছে করছিল এখনই ওদের খুন করে আসেন। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার শক্তি শরীর থেকে উধাও। ন্যান্সির কথা মনে এল। কিছুতেই মাথা গরম কোরো না। ধরে নেবে এটা তোমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট। মনে হওয়ামাত্র শরীর শিথিল হল। হরপ্রীতের সঙ্গে বাঁধন ছিন্ন করার সুযোগ কী অনায়াসে পেয়ে গেলেন তিনি।

করিডোরে পায়ের আওয়াজ হল। বাইরের দরজা খোলার শব্দ। 'বাই' 'বাই' কানে এল। তারপর হরপ্রীত এই ঘরের দরজায়, 'তুমি? এই সময়ে? চাবি কোথায় পেলে?'

উত্তর দিলেন না কাবেরী।

'হুঁ। তুমি যখন সবই জেনে গেছ তখন ভালই হল। আমাকে কিছু বলতে হবে না।'

'না। তার দরকার নেই।'

'অনেক ধন্যবাদ।' হরপ্রীত সরে গেল সামনে থেকে।

স্ফটিক গোলকের ওপর দৃষ্টি স্থির করলেন কাবেরী। ধীরে ধীরে পৃথিবীটা যেন এক অন্ধকারে হারিয়ে গেল। শুধু চোখের সামনে এক আলোকিত গোলক ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। এই সময় থেকেই মন এমন শান্ত হয়ে যায় যে নিজের বলে কিছু আছে এমন অনুভূতিই হয় না।

তারপর যা ছিল মোমবাতির আলোয় আলোকিত তা থেকে মৃদু আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে। খুব নরম আলো। কাবেরীর চোখের সামনে যে স্ফটিক গোলক তার মধ্যভাগে যেন ছায়া জমতে থাকে। পূর্ণ চাঁদের বুকে যেন আঁকিবুকি, যা কিনা উপগ্রহটির বাস্তব অবস্থানের প্রমাণচিহ্ন, ঠিক তেমনটি নয়। ছায়াগুলো এখানে পাক খেতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়া চলে কতক্ষণ সেই বোধও কাজ করে না কাবেরীর। এখানে, এই পাহাড়ে আসার আগে কাবেরী এই রকম দেখার স্তরে পৌঁছেছিলেন। এখানে আসার কিছু দিন পরে তাঁর কানে আলতো শব্দ বাজল, 'কাকে চাও কাকে চাও?'

'ন্যান্সি, ন্যান্সিকে!'

'তাকে পাবে ভোরে। ভোরে। ভোরে।'

ব্যাস শব্দটা মিলিয়ে গেল।

সেই শুরু। পরপর তিনবার এমন হওয়ার পর সন্ধে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত পদ্মাসনে বসে থেকে কাবেরী স্ফটিক গোলকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ভোর চারটের সময় পিঁপড়ের চলার মতো শব্দটা কানে লাগল, 'কাকে চাও, কাকে চাও?' কাবেরী জবাব দিলেন, 'ন্যান্সি, ন্যান্সিকে।'

তারপর কয়েক সেকেন্ড প্রতীক্ষায় কাটল। শেষ পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত গলা কানে এল, 'কংগ্রাচুলেশন। আমি জানতাম তুমি পারবেই। কেমন আছ কাবেরী?'

'ন্যান্সি?' কাবেরী উত্তেজিত।

'হ্যাঁ। কিন্তু এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে তোমাকে। প্রথম স্তর হল শ্রবণ, তার পর দর্শন। দর্শন স্তরে আসার পরে তোমার সঙ্গে অন্যান্য সদস্যদের পরিচয় হবে। তখনই তুমি আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যাবে।' ন্যান্সির গলা।

'তোমাকে কেন সন্ধেবেলায় পাওয়া যায় না। কেন এই ভোরে?'

হাসির আওয়াজ ভেসে এল, 'তোমাদের সন্ধে ছ'টায় মানে তো আমেরিকায় সকাল। আমি তো সন্ধে ছ'টায় আসনে বসি। তখন তোমাদের ওখানে ভোর হব হব।'

কিছু বলতে গিয়ে বুঝলেন শব্দ নেই। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

কিন্তু এটা একটা নেশার মতো হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। সন্ধের পর আসনে বসে ধীরে ধীরে যখন স্ফটিক নিজেই আলো ছড়াতে শুরু করে, যখন মনঃসংযোগ সঠিক স্তরে পৌঁছায় তখন এক একদিন এক এক কণ্ঠের সঙ্গে পরিচয় হয়। এরা কি আত্মা? বুঝতে পেরে শিহরিত হন কাবেরী। কাকে চাও, কাকে চাও?

'আমার দিদিমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষায় কাটল। তারপর স্পষ্ট কানে এল, 'তিনি চলে গেছেন পৃথিবীতে। নতুন শরীর নিয়ে। আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে না।'

অনেক কৌতূহল মনে আসে। যাঁরা কথা বলেন, যোগাযোগ করিয়ে দেন তাঁরা অবশ্যই আত্মা। এক আত্মা দ্বিতীয়বার আসেন না। সবসময় তাঁরা বাংলায় কথা বলেন না। এক রাত্রে এমন একজন আত্মা কথা বললেন যে তার একটি

শব্দও বুঝতে পারেননি কাবেরী। হয়তো আফ্রিকান কোনও ভাষা কিংবা বার্মিজ। কিন্তু ন্যান্সির টেলিফোন এসেছিল এক বিকেলে। 'কাবেরী তুমি যে এতগুলো বছর ধরে অনুশীলন চালিয়েছ তাতে আমি খুব খুশি।'

'আমি এখন প্রশ্ন শুনতে পাই। অদ্ভুত অচেনা ভাষাতেও কথা বলে কেউ কেউ।'

'হ্যাঁ। এর পরে তুমি দেখতে পাবে। তবে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু সেটাই শেষ নয় কাবেরী।'

'সে কী! তুমি তো শুধু শ্রবণ এবং দর্শনের কথা বলেছিলে।'

'ঠিক। এই দুটো স্তরের পরেই তোমার প্রাপ্তি হবে। তুমি নিজের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। আর হ্যাঁ, এসব বিষয় নিয়ে তুমি কারও সঙ্গে আলোচনা করছ না তো? এ ব্যাপারে গোপনীয়তা খুব জরুরি!' ন্যান্সি সতর্ক করল।

'আমি জানি!'

'তুমি সন্ধের পর ইচ্ছে করলে রোজমেরির সঙ্গে কথা বলতে পারো।'

'রোজমেরি?'

'রোজমেরি থাকে সিডনিতে। আমাদের পরিবারের ও সম্পাদিকা।'

কোথায় এই পাহাড় কোথায় সিডনি। হিসেব করে দেখলেন কাবেরী, এখানে যখন সন্ধে সাড়ে ছ'টা তখন সিডনিতে রাত দশটা বেজে যায়।

আজ রাত্রে যখন মাধ্যম আত্মারা প্রশ্ন করল তখন কাবেরী বললেন, 'সিডনির রোজমেরির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

কয়েক সেকেন্ড সব চুপচাপ। তারপর বয়স্কা কণ্ঠ শুনতে পেলেন, 'হ্যালো।'

'হ্যালো! রোজমেরি?'

'ইয়েস। ওঃ, আর ইউ কাবেরী?'

'হ্যাঁ।'

'ওয়েলকাম! ন্যান্সির কাছে নিয়মিত খবর পাই। আমাদের পরিবারের সদস্য হওয়ার পক্ষে তুমি শেষ পর্যায়ে এসে গেছ বলে আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো।'

'আমি, আমি খুব খুশি।'

রোজমেরি বললেন, 'এবার তুমি ভাল করে তোমার স্ফটিক গোলকের দিকে তাকাও।'

'আমি তো ভাল করেই তাকিয়ে আছি।'

রোজমেরি কোনও কথা বললেন না। কাবেরী দু'বার তাঁর নাম ধরে ডাকলেন। কোনও সাড়া নেই। হঠাৎ মনে হল স্ফটিক গোলকের মাঝখানে কিছু নড়ছে। ঠিক ছবি ফুটবার আগে টিভিতে যে কাঁপন হয় তেমনি। তারপর গোলকের ওই অংশের উজ্জ্বল আলো নিষ্প্রভ হয়ে আসতেই একটি মুখের ছবি ভেসে উঠল, এক বৃদ্ধার মুখ। বৃদ্ধা হাসলেন, 'কাবেরী আমি রোজমেরি। আমাদের সংস্থার একশো আট নম্বর সদস্য হিসেবে আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি।'

'আমি, আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি।' উত্তেজিত হলেন কাবেরী।

'শান্ত হও। নিজেকে সংযত করো। আজ তোমার দর্শন পর্ব শুদ্ধ হল। এখন থেকে যে কোনও প্রয়োজনে তুমি আমাদের আর একশো সাতজন সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। তোমার কথা তাঁরা জেনে যাবেন।'

'রোজমেরি, আমাদের পরিবারে মেয়েদের সংখ্যা কত?'

রোজমেরি হাসলেন, 'আমরা সবাই নারী। পুরুষদের এখানে স্থান নেই। তার মানে এই নয় যে আমরা পুরুষবিরোধী। তবে সেই সব পুরুষ যারা নারীদের ওপর অত্যাচার করে তাদের আমরা শত্রু বলে মনে করি। তারা যাতে শাস্তি পায় তার চেষ্টা করি। এসব তুমি ধীরে ধীরে জানতে পারবে। তুমি তো পাহাড়ে থাক। তোমার ওখানে যদি খুব বৃষ্টি হয় তা হলে দর্শনের চেষ্টা করবে না।' বলতে বলতেই ছবি কাঁপতে লাগল। তারপর দপ্ করে জায়গাটা সাদা হয়ে গেল।

আর তখনই পাহাড় কাঁপিয়ে বাজ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মুষল ধারায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। মোমবাতির আলো নিভিয়ে দিয়ে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন কাবেরী।

আজ মন্তামামা অনেকটাই সুস্থ। তবু সতর্কতার জন্যে আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে মুড়ে ব্রেকফাস্টের পর বেরিয়ে এলেন নিজের ঘর থেকে।

'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং। কেমন আছ আজ?'

'একদম ফিট।'

'জোর করে ফিট হয়ো না।'

'নো। নট অ্যাট অল। ও হ্যাঁ, ডাক্তারকে একবার ফোন করা দরকার।'

কাবেরীর খেয়াল হল। বললেন, 'হ্যাঁ। করব।'

'ডক্টর চন্দ্রনাথ মুখার্জি।'

'হ্যাঁ, বলবে, সব ঠিক আছে শুধু রাত্রে দু'ঘণ্টা অন্তর ঘুম ভেঙে যাচ্ছে।' কাবেরী টেলিফোনের কাছে গেলেন। কার্ড বের করে ডায়াল করলেন। একটু পরেই শুনতে পেলেন, 'হ্যালো, বলিয়ে—!'

'ডক্টর মুখার্জি?'

'ডক্টর সাব নেহি হ্যায়। তিনধারিয়ামে গিয়া। আপকি নাম?'

'কাবেরী।' ফোন রেখে দিয়ে মন্তামামার কাছে চলে এলেন কাবেরী। 'তোমার ডাক্তারের পায়ের তলায় সরষে আছে। রোজই বোধ হয় ঘুরে বেড়ান। বাড়িতে নেই।'

'হয়তো কল্-এ গিয়েছেন।'

'কী জানি।' কাবেরী বসলেন বাগানে। মন্তামামা আগেই বসেছিলেন।

'তোমার কাহিনীর অর্ধেকটা কিন্তু শোনা হয়নি।'

'নাথিং নিউ। হরপ্রীতকে বলেছিলাম এইভাবে আর থাকা যায় না একসঙ্গে। ও একমত হল। আমরা ঝগড়াঝাটি না করে ডিভোর্সের অ্যাপ্লিকেশন দিলাম, ওটা হয়েও গেল। কিন্তু বিরোধ লাগল ছেলেমেয়েদের নিয়ে। সে ছেলের দায়িত্ব নিতে চাইল, মেয়ের নয়। আমি বলেছিলাম নিতে হলে দু'জনেরই নিতে হবে। তার বক্তব্য ছিল, মেয়ে আর একটু বড় হলে পুরুষ হিসেবে ও সমস্যায় পড়বে যা ছেলের বেলায় হবে না। কথাটায় যুক্তি ছিল, মেনে নিলাম।

খবরটা মা পেয়ে গিয়েছিলেন। হরপ্রীতই তাঁকে জানিয়েছিল। মা আমাকে ফোন করে জানতে চাইলেন, আমার পরিকল্পনা কী? আমি জানালাম, ওদেশেই থাকব, চাকরি করব, একা থাকব মেয়েকে নিয়ে। কিন্তু মায়ের বক্তব্য সেটা করলে আর যাই হোক মেয়ে মানুষ হবে না। তার চেয়ে আমি যেন ওঁর কাছে চলে যাই। আমার স্বাধীনতায় উনি কোনও বাধা দেবেন না। তবে আমি যেন এমন কিছু না করি যা ওঁকে অসম্মানিত করবে। ন্যান্সিও একই কথা বলল। ওখানে থেকে একা বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করলে আমি নিজের কথা ভাবতেই পারব না। অতএব চলে এলাম কলকাতায়। চ্যাটার্জি হাউসের একটা অংশ আমার জন্যে বরাদ্দ হল। মা অন্য অংশে। সেখানে গিয়ে দেখা করতে হলে টেলিফোন করে যেতে হত। মেয়ের বেলায় অবশ্য বিধিনিষেধ ছিল না। সে দিদিমার নয়নের মণি হয়ে গেল। একেই বলেই কপাল! যাকে মানুষ করতে লেডি চ্যাটার্জি দেশে নিয়ে এলেন সে একটু একটু করে চরম অমানুষ হয়ে উঠল। ব্যাস, এটুকুই।'

'তোমার সঙ্গে লেডি চ্যাটার্জির কোনও ব্রিজ তৈরি হল না?'

'আমার এই শরীরটার জন্যে তিনি কখনওই আমাকে পছন্দ করেন না।'

'অদ্ভুত!'

'না। উনি কর্তব্য করেন। যেহেতু আমি স্যার অমলেশ চ্যাটার্জির মেয়ে এবং ব্যবসাটা তাঁর তাই উনি প্রতিমাসে আমাকে বিশ হাজার টাকা কোম্পানি থেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। অত টাকা এখানে আমার লাগে না।'

ফোন বাজল। আবদুল কথা বলে রিসিভার নিয়ে এল। সেটা নিয়ে কানে চেপে কাবেরী বললেন, 'হ্যালো!'

'মন্তাদা কেমন আছে?' লেডি চ্যাটার্জির গলা।

'কাল খুব জ্বর হয়েছিল, আজ জ্বরটা নেই।' কাবেরী বললেন।

'আজ কি ওঁর পক্ষে ফ্লাই করা সম্ভব?'

'এক মিনিট। মন্তামামা, মা জিজ্ঞাসা করছেন আজ কি আপনি কলকাতায় যেতে পারবেন? শরীর কি পারমিট করবে?' কাবেরী মন্তামামার দিকে তাকিয়ে বলল।

'নো প্রবলেম। কিন্তু কেন?' মন্তামামা জানতে চাইলেন।

'মন্তামামা জানতে চাইছেন কেন যাবেন!' ফোনে বললেন কাবেরী।

'সেটা এখানে আসার পর বলব। ওঁকে বলো, বিকেল তিনটের সময় ফ্লাইট। এয়ারপোর্টে লোক থাকবে টিকিট নিয়ে।' আদেশ জানিয়ে লাইন কেটে দিলেন লেডি।

কাবেরী হাসল, 'মনে হচ্ছে আমার একাকিত্ব বাড়ল।'

'তার মানে?'

'তোমাকে বোধ হয় এখান থেকে চলেই যেতে হবে।'

'আশ্চর্য! আমি কোথায় যাব সেটা তোমার মা ঠিক করবে?'

'তুমি কিন্তু মায়ের ইচ্ছেতেই এখানে এসেছিলে।'

'হ্যাঁ। তখন প্রথম আলাপ। কিন্তু...। তা ছাড়া কলকাতায় আমার ভাল নাও লাগতে পারে। এই বয়সে ওখানে গিয়ে আমি কী করব?'

'কেন উনি ডেকেছেন তা তুমি গেলে জানতে পারবে।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি। কিন্তু আই উইল কাম ব্যাক।'

বেলা সাড়ে এগারোটায় আবদুল গাড়ি ডেকে নিয়ে এল নীচের বাজার থেকে। মন্তামামা শুধু একটা হালকা স্যুটকেস নিয়ে চলে গেলেন বাগডোগরার দিকে। যাওয়ার আগে কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে আছি কাবেরী।'

বিকেল তিনটে নাগাদ গাড়ির শব্দ থামল বাংলোর সামনে। আবদুল ছুটে এসে জানাল ডাক্তার মুখার্জি এসেছেন। বাইরের ঘরের সোফায় শরীর এলিয়ে সিডনি শেলডন পড়ছিলেন কাবেরী। একবার ধরলে হু হু করে সময় কেটে যায়। খবরটা শুনে উঠে বসলেন। ততক্ষণে ডাক্তার চলে এসেছেন দরজার সামনে।

'মে আই কাম ইন?'

'সিওর।' উঠে দাঁড়ালেন কাবেরী।

'দার্জিলিং-এর বাড়িতে ফোন করে জানলাম আপনি সন্ধান করেছিলেন।'

'হ্যাঁ। আপনার পেশেন্টের খবরটা——।'

'কেমন আছেন তিনি। জ্বর নিশ্চয়ই নেই?'

'না নেই।'

'চলুন, তাঁকে দেখে আসি একবার।'

'জ্বরমুক্ত হওয়ায় তিনি কলকাতার পথে বাগডোগরায় পৌঁছে গেছেন এতক্ষণে!'

'সাবাস। তবে আর একদিন রেস্ট নিলে ভাল হত।' চন্দ্রনাথ বললেন।

'ওর অন্য উপায় ছিল না।'

'ওই খবরটা দেওয়ার জন্যেই আপনি ফোন করেছিলেন?'

'না। তখনও ওঁর যাওয়ার কথা ছিল না। জ্বর নেই তাই আপনাকে জানাতে চেয়েছিলাম।'

'ও কে দেন! চলি!'

'সে কী! বসুন। একটু চা কফি খেয়ে তবে যাবেন।'

'না। এখন চা কফি সইবে না।'

'মানে?'

'সেই সাতসকালে বেরিয়েছি। এম্পটি স্টমাকে ওসব খেলে সমস্যা হতে পারে। দার্জিলিং-এ ফিরে গিয়ে একেবারে রাতের খাওয়া খেয়ে নেব।'

'একজন ডাক্তার এ রকম অনিয়ম করে কেন?'

হাসলেন চন্দ্রনাথ, 'এই পাহাড়ি রাস্তায় যেটা ভাল পাওয়া যায় তা হল মোমো। ওটা খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে গিয়েছে। আর যা পাওয়া যায়, তাতে আমার ভক্তি নেই। ফলে অভুক্তই থাকতে হয়। তবে এরকম অবস্থায় আমি বাড়ি থেকে প্যাকেট খাবার নিয়ে বের হই কিন্তু আজ তাড়াহুড়োয় সেটা আনা হয়নি। চলি।'

'না। যাবেন না। আবদুল!' গলা তুলে ডাকলেন কাবেরী।

আবদুল ছুটে এল। কাবেরী বললেন, 'সাবকে লিয়ে বড়া নাস্তা লাগাও।'

মাথা নেড়ে আবদুল চলে যেতে চন্দ্রনাথ হাসলেন, 'এটা কী হল?'

'আপনি কী ভেবেছেন? আমার বাড়িতে এসে চলে যাচ্ছেন আর আমি জানছি আপনি অভুক্ত এবং জেনে চুপ করে বসে থাকব?'

'এটা টিপিক্যাল বাঙালি মা-মাসির মতো ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না?'

'তা হলে তো তারা রীতিমতো শ্রদ্ধার পাত্রী। তাই না?'

'যা ইচ্ছে করুন। খেয়েই যখন যেতে হবে তখন আমি রিল্যাক্স করে বসি।' চেয়ারে শরীর হেলিয়ে দেন চন্দ্রনাথ। দিয়েই ওপরের দিকে নজর যেতে বলে ওঠেন, 'বাপরে! নাঃ, বসা যাবে না।'

কাবেরী মাথার ওপর তাকালেন। কুচকুচে কালো একটা মেঘ ধীরে ধীরে বাড়ছে পাহাড়ের ওপাশ থেকে। মাথা নাড়লেন তিনি, 'বেশিক্ষণ আয়ু নেই ওর। আপনি বরং ফ্রেশ হয়ে নিন। আসুন।'

ঘড়ি দেখলেন চন্দ্রনাথ। এখন তিনি দ্বিধায়।

কাবেরী উঠে দাঁড়ালেন, 'এখন রওনা হলে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তার চেয়ে এখানে খাওয়া শেষ করে বেরুবেন, বৃষ্টি তার আগেই থেমে যাবে।'

ডাক্তারকে আউট হাউসে নিয়ে গেলেন কাবেরী। মন্তামামা চলে যাওয়ার পর আবদুল সবকিছু সুন্দর ভাবে সাজিয়ে ফেলেছে। বাথরুম, টয়লেট দেখিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় ঘরের বিছানাটার কাছে এসে বললেন, 'ইচ্ছে করলে এখানে রেস্ট নিতেও পারেন। ঠিক আছে? আমি একটু আসছি। আপনি তৈরি হয়ে নিন।'

চন্দ্রনাথ হাসলেন।

'হাসির কী হল?' কাবেরীর কপালে ভাঁজ।'

'আমি যদি ডাক্তার না হয়ে ব্যবসাদার হতাম তা হলে মাত্র দু'দিনের আলাপে আপনি এত যত্ন নিতেন না। এটুকুই লাভ।'

কাবেরী জবাব না দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

গেস্ট হাউসের ডাইনিং টেবিলে যখন খাবার দিল আবদুল তখনও বৃষ্টি নামেনি। আলো কমে এসেছে। একটুও বাতাস বইছে না।

কাবেরী টেবিলের এপাশে বসেছিলেন।

স্নান করে আসা চন্দ্রনাথকে এখন বেশ তাজা দেখাচ্ছিল। খাবার দেখে চন্দ্রনাথ আঁতকে উঠলেন, 'একী? এত? আপনার আবদুল বোধ হয় ম্যাজিক

জানে, কিন্তু এই অবেলায় এত খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুলতে বলুন।'

আবদুল চায়ের পট নিয়ে এল টিকোজিতে ঢেকে। সঙ্গে দুটো কাপ, ডিস, চিনি দুধ। দিয়ে চলে গেল। কাবেরী বললেন, 'যা পারেন খান। খান তো!'

খাওয়া শুরু করলেন চন্দ্রনাথ, 'নিশ্চয়ই আপনার লাঞ্চ হয়ে গেছে।'

'তা তো হবেই। এখন আপনার সঙ্গে চা খাব।'

'এই পাহাড়ে একা থাকার জীবনটা বেশ উপভোগ করছেন আপনি, না?'

'হ্যাঁ। আমার ভালই লাগছে।'

'আমার একটাই মুশকিল। কথা না বলে থাকতে পারি না। অবশ্য ডাক্তার হওয়ার সুবাদে কথা বলার লোক পেতে অসুবিধে হয় না।'

হাসলেন কাবেরী, 'আপনি ভাগ্যবান।' তারপর উঠে আলো জ্বালিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার ঢের আগে, বাইরে অন্ধকার নেমে গেছে। এবং তখনই গর্জন শুরু হল।

চন্দ্রনাথ বললেন, 'শুনতে পাচ্ছেন?'

'ভালই তো, যত গর্জায় তত বর্ষায় না।'

বৃষ্টি নামল। সেই সঙ্গে মেঘের গর্জন। হঠাৎ পৃথিবী কাঁপিয়ে বাজ পড়ল কাছাকাছি, পর পর দু'বার। চন্দ্রনাথ উঠে দরজার কাছে গেলেন। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। ওপরে ছাদ থাকা সত্ত্বেও বারান্দাটা জলে ভেসে যাচ্ছে। বাইরের ঘুটঘুটে অন্ধকার চিরে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠছে মাঝে মাঝে। সেদিকে তাকিয়ে চন্দ্রনাথ গুনগুন করলেন, 'সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণধারা... অন্ধ বিভাবরী সঙ্গ পরশ হারা।'

ভেতরের ঘরে বসে কাবেরী মুখ তুললেন। আজ অবধি কোনও পুরুষকণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শোনার সুযোগ তাঁর হয়নি, এভাবে এত কাছে বসে। বস্তুত বাংলা গানের প্রতি লেডি চ্যাটার্জির কোনও অনুরাগ না থাকায় ছেলেবেলা থেকেই এই রসে বঞ্চিত ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রসংগীতের কথা শুনেছেন অনেক পরে। চন্দ্রনাথের ভরাট গলায় গাওয়া গানের সুর এবং শব্দগুলো তাঁকে মুগ্ধ করল। চন্দ্রনাথ যখন গাইলেন, 'অশত্থপল্লবে বৃষ্টি ঝরিয়া, মর্মরশব্দ নিশীথের অনিদ্রা দেয় যে ভরিয়া...' তখন মনে হল এ রকমটা কখনও তিনি শোনেননি অথচ ছবিটা খুব পরিচিত কিন্তু মানেটা বদলে গেল।

গান শেষ হলে কাবেরী হাততালি দিলেন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রনাথ বললেন, 'দূর! আজকাল আর গাইতে পারি না। গলা নষ্ট হয়ে গেছে।'

‘তাতেও খুব ভাল লাগল। বিদেশেও চর্চা রেখেছিলেন?’

‘গীতবিতান আমার সব সময়ের সঙ্গী। কত গান এক সময় মুখস্থ ছিল। গীতবিতানের কোন পাতায় কী গান আছে তাও বলে দিতে পারতাম। কিন্তু মশাই, এখন কী উপায়? যাব কী করে? ছ'টা বেজে এল।’

ছটা? চমকে উঠলেন কাবেরী। হ্যাঁ, আর পাঁচ মিনিট বাকি। এখনই তাঁকে ভেতরের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু চন্দ্রনাথকে এভাবে এখানে রেখে যাওয়ার কথাও তো ভাবা যায় না। ন্যান্সির কথা মনে এল, ওকে পেতে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। রোজমেরি বলেছিলেন আকাশে মেঘ জমলে বা বৃষ্টি হলে যোগাযোগ করার চেষ্টা না করতে। তা ছাড়া সন্ধে ছ'টাতেই যে বসতে হবে তার কোনও মানে নেই।

বহু বছর পরে ঘড়ির কাঁটা ছ'টা পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কাবেরী আউট হাউসের চেয়ারেই বসে রইলেন। অস্বস্তি হচ্ছিল খুব কিন্তু নিজেকে বোঝাচ্ছিলেন, এই বৃষ্টি না কমা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

চন্দ্রনাথ বললেন, ‘অবস্থা ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে না।’

কাবেরী একটু বিব্রত হলেন, ‘পাহাড়ে বৃষ্টি তো বেশিক্ষণ হয় না।’

চন্দ্রনাথ মাথা নাড়লেন, ‘আমার জন্যে আপনি আটকে আছেন।’

‘ওমা! আপনাকে আমি তখন যেতে দিলাম না, আটকে আছেন তো আপনি।’

‘আমি দিব্যি আছি। পেট ভর্তি খাবার, বাইরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে, মাথার ওপর চমৎকার ছাদ আর আপনার মতো একজন শ্রোতার কান ঝালাপালা করে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি, এর চেয়ে আরাম কী আছে বলুন।’

গল্প করতে করতে রাত আটটা বেজে গেল। এই সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকবার ঘড়ি দেখেছেন কাবেরী। সেটা লক্ষ করেই চন্দ্রনাথ বললেন, ‘নাঃ এবার আমার যাওয়া উচিত। আবদুলকে বলুন একটা ছাতা নিয়ে আমাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে।’

প্রতিবাদ করলেন কাবেরী, ‘আপনি এই দুর্যোগের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে যাবেন?’

‘চলে যাব। কোনও সমস্যা হবে না।’

‘না। বৃষ্টি না থামলে আপনি যাবেন না।’

‘বেশ। তা হলে আপনি আপনার ঘরে যান। নিজের কাজগুলো শেষ করুন। তা হলে আমি স্বস্তি পাব।’ খোলাখুলি বললেন চন্দ্রনাথ।

'তার মানে আমার সঙ্গে গল্প করতে আপনার ভাল লাগছে না।'

'না না। আমার মনে হচ্ছে আপনি বাধ্য হয়েছেন এখানে আটকে থাকতে।'

'না। বাধ্য হইনি।' কাবেরী উঠলেন, 'আপনি এখানে ডিনার করে যাবেন।'

'ডিনার? নাঃ। আমি পানের পর কিছু খাই না। ওই সঙ্গে যা পাই। সেটা বাড়িতে পৌঁছেই শেষ করা যাবে।'

'কেন? এখানে কী অসুবিধে?' কাবেরী হাসলেন, 'বসুন।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাবেরী চিৎকার করে ডাকলেন, 'আবদুল! আবদুল!'

বৃষ্টির শব্দে বোধ হয় ডাকটা আবদুলের কানে গেল না। বাধ্য হয়ে ভেতরে চলে এলেন কাবেরী। তারপর আউট হাউসের সেলার থেকে একটা বিদেশি হুইস্কি বের করে টেবিলে রাখলেন, 'আপনাকে আইস দিতে পারব না! বৃষ্টির আওয়াজে আবদুলের কানে আমার ডাক পৌঁছাচ্ছে না।'

'আপনি সরুন। কাজটা আমাকেই করতে দিন ।' এগোলেন চন্দ্রনাথ।

দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে বললেন, 'দেখুন, কতটা জল দেব?'

'না না। আমাকে দেবেন না!'

তাকালেন চন্দ্রনাথ, 'আপনি সিওর?'

'হ্যাঁ।'

জোর করলেন না চন্দ্রনাথ। সেটা ভাল লাগল কাবেরীর।

দশটা নাগাদ বৃষ্টি কমে এল। এতক্ষণে মাত্র দুটো পেগ খেয়েছেন চন্দ্রনাথ, আবদুল দুটো ছাতা নিয়ে এল। কাবেরী বললেন, 'কী আর বলব। সাবধানে চালাবেন। আর পৌঁছেই ফোন করে জানাবেন।'

'আপনার ফোন নাম্বার আমি যে জানি না।'

কাবেরী লজ্জিত হলেন। দ্রুত নাম্বারটা বললেন।

'খুব ভাল কাটল আজকের বিকেল সন্ধে। এলাম।'

'আবার দেখা হবে।' কাবেরী বললেন। ওরা ছাতা মাথায় টর্চ জ্বেলে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। দ্রুত নিজের ঘরে চলে এলেন কাবেরী।

মিনিট তিনেকের মধ্যে আবদুলের গলা কানে এল, 'মেমসাব! মেমসাব!'

পোশাক পালটাতে যাচ্ছিলেন কাবেরী, বিরক্ত হলেন, 'কী হয়েছে?'

আবদুল যা জানাল তাতে স্তম্ভিত হলেন কাবেরী। চন্দ্রনাথের গাড়ির ওপর বাজ পড়েছে। আগুন ধরেনি কিন্তু দুটো চাকা পুড়ে গিয়েছে, ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না।

'ডাক্তারবাবু কোথায়?'

'গাড়ির কাছে।'

আর একটা ছাতা নিয়ে আবদুলের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন কাবেরী। অন্ধকারে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। টর্চ ডাক্তারের কাছে। তার আলো গেটের কাছে পৌঁছে দেখতে পেলেন।

'কী হয়েছে?' কাবেরী জিজ্ঞাসা করলেন।

'বজ্রপাত। বোধ হয় সরাসরি নয়। ভাবছি, সেসময় যদি গাড়িতে বসে থাকতাম!'

'ইস। আমার জন্যে। যদি তখন আপনাকে না আটকাতাম?'

'তা হলে রাস্তাতেও ঘটনাটা ঘটতে পারত। গাড়ির জন্যে ভাবছি না, টাকাটা ইনসিওরেন্স কোম্পানি থেকে পাওয়া যাবে। এখন আবদুল যদি আমাকে নীচের বাজার পর্যন্ত পৌঁছে দেয় তা হলেই হবে।'

'এত রাত্রে এই দুর্যোগে আপনি ওখানে দার্জিলিং-এ যাওয়ার গাড়ি পাবেন?'

'চেষ্টা করা যেতে পারে। নইলে ওখানে তো চেনাশোনা মানুষ আছেন।'

আবদুল মন্তব্য করল, 'আভি গাড়ি নেহি মিলেগা।'

'চলে আসুন। আউট হাউসেই রাত কাটাবেন। খুব কষ্ট হবে না।'

মন্তামামার কাচা পাজামা পাঞ্জাবি আর শাল বের করে দিলেন কাবেরী। বললেন, 'এগুলো চেঞ্জ করে নিন। ডিনার দিতে বলছি।'

চন্দ্রনাথ বললেন, 'থেকেই যখন যাচ্ছি তখন দুটো উপকার করুন। এক, আমার কাজের লোকটিকে বলুন খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে। নইলে ওর কষ্ট হবে। দুই, ডিনার আবদুল এখানে দিয়ে যাক। ইচ্ছেমতো খেয়ে নেব।'

'বেশ। তাই হবে।'

চন্দ্রনাথ পোশাক পালটালেন। মানিয়েও গেল। আবদুল হটবক্সে খাবার নিয়ে এল। প্লেট গ্লাস জল সাজিয়ে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

গ্লাসে তৃতীয় পেগ ঢাললেন চন্দ্রনাথ। আগের দু' পেগের মৌতাত গাড়ি দেখার পর চলে গেছে। তারপর চুমুক দিয়ে গুন গুন করলেন, 'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে, ঘরের বাঁধন যায় বুঝি আজ টুটে।'

হুইস্কির কল্যাণেই সম্ভবত তাঁর গলা খুলে গেল।

একটার পর একটা গান গেয়ে যাচ্ছিলেন চোখ বন্ধ করে, হঠাৎ আবদুলের গলা কানে এল, 'সাব।'

তাকালেন তিনি। আবদুল বলল, 'আপসে বাত করনে মাংতা।'

কর্ডলেস রিসিভার হাত বাড়িয়ে নিলেন তিনি, 'হ্যালো। কী হয়েছে থাপা? কখন? ঠিক আছে, আমি সকালে ওর বাড়ি হয়ে ফিরব।' ফোন অফ করে রিসিভার ফেরত দিতে যাচ্ছিলেন, আবদুল বলল, 'মেমসাব ফোন আপকো পাস রাখনে বোলা।'

আবদুল চলে যেতেই আবার জোরে বৃষ্টি নামল। সেই সন্ধের মতো মুষল ধারে বৃষ্টি। চন্দ্রনাথ বুঝলেন আজ ধস নামবে পাহাড়ি রাস্তায়। সেন্ট টমাস স্কুলের প্রিন্সিপালকে কাল সকালে দেখতে যেতে হবে। দু'বার খোঁজ করেছেন। চতুর্থ পেগ নিলেন তিনি। কালকের কথা কাল দেখা যাবে। আজকের রাতটাকে উপভোগ করা যাক।

এখন এখানে ঠান্ডা অনেক কমে যায়। কিন্তু বৃষ্টিটা ঠান্ডা ডেকে আনল। শাল জড়িয়ে নিলেন চন্দ্রনাথ। ঠিক করলেন আর একটা গ্লাস পেটে চালান দিয়ে খাবারে হাত দেবেন। আবার মেঘের হম্বিতম্বি শুরু হয়ে গেছে।

ঠিক তখনই টেলিফোনের রিং শুরু হল। রিসিভারের দিকে তাকালেন চন্দ্রনাথ। তিনবার রিং হল। কাবেরী কি ঘুমিয়ে পড়েছেন? এত রাতে লোকে অত্যন্ত দরকার না হলে ফোন করে না। ইতস্তত করে রিসিভার অন করলেন চন্দ্রনাথ।

'হ্যালো!'

'সরি। রং নাম্বার হয়ে গেছে।' লাইন কেটে গেল। অবাক হলেন চন্দ্রনাথ। অল্পবয়সি মেয়ের গলা। কথা বলার ধরন বলে দিচ্ছে ইংরেজি মাধ্যমে পড়েছে। কিন্তু যাচাই না করেই বলে দিল রং নাম্বার? অদ্ভুত ব্যাপার।

আবার রিং বাজছে। চন্দ্রনাথ অন করেই বললেন, 'কে বলছেন?'

'হু আর ইউ প্লিজ?' সেই মেয়েটির গলা।'

'আমি ডক্টর চন্দ্রনাথ মুখার্জি। আপনি?'

'ডক্টর? মাই গড। কে অসুস্থ হয়েছে?'

'না। কেউ অসুস্থ হয়নি!'

'বাঃ। সন্ধে ছটার পর কাবেরী চ্যাটার্জি টেলিফোন ধরেন না, ঘরের দরজা বন্ধ করে ধ্যান করেন। তা হলে আপনি কী করছেন ওই বাড়িতে?'

'সরি। এ সব কথা বলার আগে আমাকে জানতে হবে আপনি কে?'

'আমি? ডক্টর আমি জানি না আমি কে। ওখানে তিনি আছেন?'

'কাবেরী রাত দশটার পর নিজের ঘরে চলে গেছেন।'

'তার মানে রাত দশটা পর্যন্ত আপনার সঙ্গে ছিলেন। ওয়েদার কেমন?'

'আমার মনে হচ্ছে আপনি ড্রাঙ্ক, কাল সকালে ফোন করবেন।'

'সরি, সরি ডক্টর। আমি ড্রিঙ্ক করি না। আমি ধোঁয়া খাই। শুকনো নেশা। বাট অবাক হয়ে যাচ্ছি। কাবেরী চ্যাটার্জিকে ফোন করেছিলাম পাব না জেনে। চাকর বলবে মেমসাহেব নেহি হ্যায়। তার বদলে আপনি! হোয়াট এ সারপ্রাইজ! আমি কি ধরে নিতে পারি শেষ পর্যন্ত কাবেরী চ্যাটার্জি একজন বয়ফ্রেন্ড পেয়েছেন।'

'আপনি কে সেই পরিচয় দিচ্ছেন না, কিন্তু জানতে চাইছেন যখন তখন বলছি, উনি আমাকে বয়ফ্রেন্ড ভাবলে আমি সম্মানিত বোধ করব।'

আচমকা ভয়ঙ্কর একটা হাসি শুনলেন চন্দ্রনাথ, হাসতে হাসতে মেয়েটি বলল, 'মাই ডিয়ার ডক্টর, আপনার চেহারা আমি দেখতে পাচ্ছি। ওয়ান অব দ্য আগলি মেন অব দ্য ওর্য়ল্ড। নইলে কাবেরী চ্যাটার্জির বয়ফ্রেন্ড হবেন কী করে। বাট হোয়ার ইজ দ্যাট ওল্ডি? আমি ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। একটু আগে মিস্টার হরপ্রীত সিং-এর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস উনি পান কী করে?'

'এখন এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। উনি ওঁর বাংলোয় ঘুমাচ্ছেন, প্রয়োজন হলে কাল সকালে ফোন করবেন।'

'ওকে! আমি কে জানতে চাইছিলেন ডাক্তার। আমি লেডি কণিকা চ্যাটার্জির নাতনি। এখন এই রাত্রে লেডির ঘুম ভাঙিয়ে জানিয়ে দেব ওঁর একাকিনী মেয়ে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে বৃষ্টির রাত উপভোগ করছেন। গুড নাইট।' লাইন কেটে গেল।

রিসিভার অফ করলেন চন্দ্রনাথ। এই মেয়ে কি কাবেরীর? এত ঘৃণা কেন ওর মনে?

চন্দ্রনাথের ইচ্ছে করছিল না ডিনার করতে। খোলা দরজার ওপাশে তখন বৃষ্টির ধারা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হঠাৎ দেখতে পেলেন সেই ঝলকানিতে, কেউ সম্পূর্ণ ভিজে ছুটে আসছে। ভুল দেখছেন? ততক্ষণে বারান্দায় উঠে এসেছেন কাবেরী। আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছে জলে। থরথর করে কাঁপছেন। চন্দ্রনাথ চাপা গলায় বললেন, 'একী? আপনি?'

'ক্ষমা চাইছি, ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি। আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

'আপনি ক্ষমা চাইবেন কেন? আর এভাবে বৃষ্টিতে ভিজে কেউ আসে? অসুখ করবে যে।'

'করুক। ছি ছি ছি! কী লজ্জা! আমি যদি আপনাকে না আটকাতাম তা হলে ওসব কথা আপনাকে শুনতে হত না।' শীতে অথবা লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছিলেন কাবেরী।

'কাবেরী, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। কিন্তু, আপনি কি প্যারালাল লাইনে ছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমি সন্ধে ছটার পর টেলিফোন তুলি না। আজ এত রাত্রে দু'-দু'বার ফোনটা এল বলে কৌতূহল হল। তখনই ওর গলা শুনতে পেলাম। এমন অসাড় হয়ে গেলাম যে কথা বলতে পারছিলাম না। অথচ আমারই উচিত ছিল ধমক দিয়ে ওকে থামাতে। আই অ্যাম সরি।' ঠোঁট কামড়ালেন কাবেরী।

'আপনার মেয়ে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন কাবেরী, 'আমার শরীরে জন্মেছিল।'

'আপনি এ নিয়ে বিব্রত হবেন না। প্লিজ চেঞ্জ করুন, অসুখ বাঁধাবেন না। কিন্তু, ফিরে যেতে হলে তো আবার ভিজতে হবে। এখানে—!'

মস্তামামার পাজামা পাঞ্জাবি পাওয়া গেল। তাই দিয়ে জোর করে কাবেরীকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিলেন চন্দ্রনাথ। মিনিট দুয়েক বাদে কাবেরী বেরিয়ে এলেন। তোয়ালেতে চুলের জল নিংড়ে নিয়েছেন। ওঁর লম্বা শরীরে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি চমৎকার মানিয়ে গিয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে নিলেন তিনি।

'টেলিফোনের আওয়াজে কি আপনার ঘুম ভেঙে গেল?' চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

'না। আমি জেগে ছিলাম।'

'এত রাত্রে?'

'আমি ভোরের একটু আগে ঘুমাই। আপনিও তো জেগে আছেন?'

'আমি এই বৃষ্টি এবং হুইস্কি উপভোগ করছিলাম।'

'আমি একটা ফোন করব।' কাবেরী বললেন।

'এত রাত্রে? এখন তো ঘুমোবার সময়।'

'ঘুমোক।' অদ্ভুত জেদি দেখাচ্ছে কাবেরীকে।

'আপনি এখন উত্তেজিত। বরং কাল সকালে—।'

'না। আজ তৃণা কথাগুলো বলার সাহস পেল যার জন্যে তাঁকে কখনও কিছু বলিনি। কিন্তু ওঁর জন্যেই মেয়েটা নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কে তিনি?'

‘লেডি কণিকা চ্যাটার্জি।’ রিসিভারটা তুললেন কাবেরী।

‘না, কাবেরী। প্লিজ! আপনার মায়ের বয়স কত?’

‘আই ডোন্ট কেয়ার! মে বি সেভেন্টি, মে বি মোর।’

অন করে নম্বর টিপতে শুরু করতেই চন্দ্রনাথ জোর করে ওটা কেড়ে নিতে চাইলেন, ‘আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কী করছেন আপনি? তা হলে মেয়ের সঙ্গে আপনার পার্থক্য কোথায় থাকছে?’

কর্ডলেস টেলিফোনটা হাতছাড়া হওয়ামাত্র দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন কাবেরী। কান্নাটা এত ভেতর থেকে উঠে আসছিল যে বাধা মানছিল না। ওঁর দিকে তাকিয়ে মায়া এল মনে; চন্দ্রনাথ কাঁধে হাত রাখলেন, ‘শান্ত হন।’

তীব্রবেগে দু'দিকে মাথা নাড়লেন কাবেরী।

কাবেরী বেশ লম্বা, সদ্য স্নান করায় শরীরের আলতো নরম গন্ধ, চন্দ্রনাথ তাকে জড়িয়ে ধরলেন আচমকা। বললেন, ‘না। আপনি কেন ছোট হবেন?’

আর তখনই কাবেরীর শরীর স্থির হল। দীর্ঘকাল পরে কোনও পুরুষ তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে। চন্দ্রনাথের শরীর থেকে হুইস্কির গন্ধ ক্রমশ সম্মোহনের কাজ করছে। তাঁর এত দিনের জীবনে হরপ্রীত ছাড়া কোনও পুরুষকে তিনি শরীরের কাছাকাছি আসতে দেননি। এই বৃষ্টির রাত, এই অপমান, এই নিঃসঙ্গ জীবন একাকার হয়ে গেল এই মুহূর্তে। তিনি চন্দ্রনাথের বুকে মাথা রাখলেন। হয়তো ত্রিশ সেকেন্ড, হয়তো বা চল্লিশ, তার পরেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন কাবেরী, ‘ঠিক আছে।’

‘কাবেরী, মাত্র দু'দিনের আলাপ, তবু আমাকে বন্ধু ভাবতে পারেন।’

‘বন্ধু?’

‘হ্যাঁ।’

‘ডক্টর, আমার সঙ্গে সবাই বন্ধুত্ব করতে আসত, কারণ আমি লেডি চ্যাটার্জির মেয়ে। কোটি কোটি টাকার মালকিন তিনি। আমার গায়ের রং তারা অন্ধ হয়ে দেখত। যাকে বিয়ে করেছিলাম ভেবেছিলাম সে নির্লোভ। একদিন তার সত্যিকারের চেহারাটা বেরিয়ে এল। কাল সকালে অ্যালকোহলের প্রভাব কেটে গেলে আপনি আফসোস করবেন।’

‘কোনও তর্ক করব না। শুধু জানাই, টাকা খরচ করতেই এই পাহাড়ে এসেছি, উপার্জন করতে নয়। আর আমি মদ ততক্ষণ খাই যতক্ষণ উপভোগ করি, মদ আমাকে খাবে এমন সুযোগ দিই না। আসুন।’

'কোথায়?'

'শুয়ে পড়বেন।'

প্রায় জোর করেই আউটহাউসের বিছানায় নিয়ে এসে শুইয়ে দিলেন কাবেরীকে। গায়ের ওপর কম্বল টেনে দিয়ে বললেন, 'এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

আলো নিভিয়ে বাইরের ঘরের চেয়ারে গিয়ে বসতেই বৃষ্টিটা থামল। থামা মাত্র অদ্ভুত শব্দ আশেপাশের পাথরের খাঁজ অথবা জঙ্গল থেকে বের হতে লাগল। এটা কি আর্তনাদ না উল্লাস বোঝা যাচ্ছিল না।

মিনিট পাঁচেক বাদে কাবেরী বেরিয়ে এলেন, 'নাঃ, সম্ভব হল না। আমি আরাম করে ঘুমাব আর আপনি চেয়ারে বসে থাকবেন সেটা মানতে পারছি না।'

আবার গ্লাসে হুইস্কি ঢালছিলেন চন্দ্রনাথ। না তাকিয়ে বললেন, 'বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। স্বচ্ছন্দে নিজের বিছানায় চলে যেতে পারেন।'

'ওখানেও ঘুম আসবে না।'

'তা হলে বসে থাকুন।'

'আমাকে একটা হুইস্কি বানিয়ে দিন।' আচমকা বললেন কাবেরী।

'আপনি তো এসব খান না।'

'এখন খেতে ইচ্ছে করছে।'

'আজ আপনার নার্ভের যা কন্ডিশন তাতে অল্পেই মাতাল হয়ে যাবেন।'

'দেখি না। মাতাল হলে কেমন লাগে দেখতে চাই।'

চন্দ্রনাথ ঢেলে দিলেন। একটা বড় চুমুক দিয়ে কাবেরী বললেন, 'নট ব্যাড। এবার একটা গান করুন।'

'সরি, এখন মুড নেই।'

'আপনি খুব জেদি মানুষ।' দ্বিতীয় চুমুকে গ্লাসের অর্ধেকটা খালি হল।

'হবে হয়তো।'

'স্ত্রী চলে যাওয়ার পর বিয়ে করেননি কেন?'

'ইচ্ছে হয়নি।'

'আমার মতো কত মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছেন?'

শব্দ করে হেসে ফেললেন চন্দ্রনাথ, 'হিসেব করতে হবে।'

'ভাবছেন এই বলে এড়িয়ে যাবেন? আপনার মতো সুদর্শন, ওয়েলবিহেভড পুরুষকে মেয়েরা ছেড়ে দিয়েছে এটা ভাবার মতো বোকা আমি নই।'

'বেশ তো, ভাববেন না।'

'আমার কোনও পুরুষবন্ধু চাই না।' গ্লাস শেষ করলেন কাবেরী, 'আর একটা।'

'না। আর নয়!'

'ধ্যুৎ!' বলে চন্দ্রনাথের পূর্ণ গ্লাস তুলে নিলেন, 'আপনি এখনও খাননি। ভালই হল, আমি খেয়ে নিচ্ছি।' লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, 'গরম লাগছে, তাই না?' এবার তাঁর গলার স্বর জড়িয়ে গেল।

মিনিট দশেক বাদে কাবেরীকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন চন্দ্রনাথ। কাবেরীর শরীর শিথিল, চৈতন্য লুপ্ত।

ঘুম ভাঙল এগারোটা নাগাদ। চোখ মেলেই বুঝলেন মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। সমস্ত শরীরে অস্বস্তি। উঠে বসলেন। তখনই চন্দ্রনাথের কথা মনে এল। বাইরের ঘরে এসে দেখলেন সেখানে কেউ নেই। টেবিলে একটা কাগজ চাপা দেওয়া। তার পাশে চারটে ট্যাবলেট। কাগজটা খুললেন, 'ঘুম ভাঙলে মাথার যন্ত্রণা হয়তো হতে পারে। তাই ওষুধ দিয়ে গেলাম। এখনই দুটো জলে গুলে খেয়ে নিন। গাড়িতে ব্যাগটা থাকলেও বাজের আক্রমণ থেকে বেঁচে গেছে বলে ওষুধটা রাখতে পারলাম। শান্ত থাকুন। চন্দ্রনাথ।'

পাঞ্জাবির দিকে তাকালেন। সব ঠিক আছে। লোকটা কোনও সুযোগ নেয়নি। ওষুধ খেয়ে নিজের ঘরে চলে এলেন। স্নান করলেন। ধীরে ধীরে মাথা পরিষ্কার হয়ে এলে ব্রেকফাস্ট করলেন।

কাল রাত্রে স্ফটিকগোলকের সামনে বসা হয়নি। অবশ্য বসলেও তো লাভ হত না। মেঘ জমলে, বৃষ্টি পড়লে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবু অস্বস্তি হচ্ছিল। এই সময় ফোন বাজতেই চমকে উঠলেন। নিশ্চয়ই তৃণা। কাল রাত্রে তো চন্দ্রনাথকে বলেছিল আজ ফোন করবে। সোজা এগিয়ে গেলেন রিসিভার তুলতে। আজ যা হবার তাই হবে।

'হ্যালো।' কাবেরী দাঁতে দাঁত রাখলেন।

'গুড মর্নিং। ঘুমাচ্ছিলেন বলে জানিয়ে আসতে পারিনি।'

'ও, আপনি! গুড মর্নিং। কীভাবে গেলেন?'

'নীচে নেমেই ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। দুপুরে ইনস্যুরেন্সের লোকজন গিয়ে গাড়ি দেখবে, নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, আপনার শরীর কেমন আছে এখন?'

'খুব মাথা ধরেছিল, ওষুধ খেয়ে ভাল লাগছে।'

'গুড। আমাকে আজ কলকাতা যেতে হচ্ছে।'

'কলকাতা? কই, কাল বলেননি তো!'

'আজ সকালে একজন পেশেন্টকে দেখে মনে হল ওঁর রিপোর্ট নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। জরুরি। একটু পরেই বেরুব। যদি পারি কালই ফিরে আসব।'

'টিকিট হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। মানে টেলিফোনে বলেছি। এয়ারপোর্টে গিয়ে নেব।'

'তা হলে আর একবার ফোন করবেন, প্লিজ!'

'কেন বলুন তো?' অবাক হলেন চন্দ্রনাথ।

'একটার বদলে দুটো টিকিট বলুন। আমি কলকাতায় যেতে চাই।'

অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে তৃণা দেখল দীপ ঘরে নেই। এই অবাঙালি পাড়ায় ওর আড্ডা মারার জায়গা নেই। একসঙ্গে থাকার পর দীপ কখনওই একা আড্ডা মারতে কোথাও যায় না। ইদানীং ওর কথা শুনলে মেজাজ খারাপ হচ্ছে তৃণার। দীপের কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। এই কারণে সে তৃণার ধমক খেয়েছে কয়েকবার। তারপর থেকে ওর আচরণে পরিবর্তন এসেছে। এখন যেন তৃণাকে বেশ সমীহ করে চলে।

তৃণা তৈরি হয়ে নিতেই দীপ ফিরে এল, 'একটা ফ্ল্যাটের খবর পেলাম।'

'ফ্ল্যাট?' তৃণা অবাক।

'এখন আর এই ছোট্ট ঘরে থাকার কোনও মানে হয় না। টু বেডরুম ফ্ল্যাট, দুটো টয়লেট, কিচেন। চার হাজার ভাড়া, তিন মাসের অ্যাডভান্স। খুব সস্তা।'

'সেই ফ্ল্যাটে যে আমরা যাব তা তোকে কে বলল?'

'এখন একটু আরামে থাকবি না?'

'মাত্র এই কয়েক লাখ পেয়েই তুই আরামের কথা ভাবছিস? আমি অনেক আরাম ছেড়ে এই ঘরে এসেছিলাম। আসিনি?'

'তা তো ঠিকই। আমি ভাবলাম—!'

'তারপর দুটো বেডরুম কেন? আমাদের কোনও গেস্ট নেই। তুই কি আলাদা ঘরে থাকবি?'

'না না।'

'তৈরি হয়ে নে। খিদে পেয়েছে।'

মাঝারি রেস্টুরেন্টে ওরা যা খেল তা লাঞ্চই বলা যায়!

খাওয়া শেষ করে দীপ বলল, 'কাল অত রাত্রে টেলিফোনে কাকে না কাকে তুই ও সব বললি! কেন যে হঠাৎ রেগে গেলি?'

'বেশ করেছি। ওই মহিলাকে আমি টলারেট করতে পারি না।'

'বাট, আফটার অল শি ইজ ইওর মাদার।'

'অ্যাকসিডেন্টালি।' সোজা হল তৃণা, 'এই, আমার পারিবারিক ব্যাপারে তুই কোনও কমেন্ট করবি না। চল।'

'কোথায়?'

'গাড়ি কিনব।'

'গাড়ি? কী হবে? গাড়ির দাম কত জানিস? কিনে রাখবি কোথায়?'

'দেখা যাবে। একটা চমৎকার আইডিয়া মাথায় এসেছে।'

'কী সেটা?'

'পরে জানবি।'

ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ওরা শহরের এক প্রান্তের বিরাট শো রুমে চলে এল। ঝাঁ চকচকে শো রুম, প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কাচের হলঘরে। দীপকে নিয়ে ঢুকল তৃণা। ঘুরে ঘুরে গাড়ি দেখতে লাগল ওরা। মারুতি থাউজেন্ড, জেন, ওয়াগনার। দারুণ দেখতে সব। এই সময় একটি তরুণ, যার বুকে পরিচিতি লেখা প্ল্যাস্টিক আটকানো, এগিয়ে এল, 'এক্সকিউজ মি। আমি কি আপনাদের সাহায্য করতে পারি?'

'ও সিওর।' মাথা নাড়ল তৃণা, 'আমরা গাড়ি কিনতে চাই।'

'আপনারা?' ছেলেটি ওদের আবার দেখল, 'প্লিজ, অফিসে আসুন।'

ওদের নিয়ে দোতলায় অফিস ঘরে গিয়ে ছেলেটি একটি সুন্দরীর টেবিলের পাশে দাঁড়াল, 'কাস্টমার। প্লিজ, বসুন।' ছেলেটি চলে গেল।

মহিলা বললেন, 'বলুন, কী গাড়ি কিনবেন?'

'বর্ষা।' তৃণা বলল।

'কেউ কি ফিনান্স করবে?'

'না না।'

'চেকে দেবেন?'

'না। ক্যাশ পেমেন্ট।'

'কার নামে হবে?'

'ওর নামে। আমার হাজব্যান্ড।'

'ও।'

'কোনও সমস্যা নেই। তবে এই মুহূর্তে আমাদের কাছে একটাই গাড়ি আছে—!'

'নীচে যে ব্লু ব্ল্যাক গাড়িটাকে দেখলাম?'

'হ্যাঁ।'

'না না। ওই রং আমার পছন্দ নয়।'

মহিলা হাসলেন, 'তা হলে তো দিন দুয়েক অপেক্ষা করতে হবে নেক্সট লটের জন্যে।'

'নো প্রবলেম।'

'কী রং চাইছেন?'

'সাদা।'

'এক মিনিট।' ভদ্রমহিলা উঠে পাশের দেরাজ থেকে একটা ফাইল বের করে দেখলেন কিছু। তারপর সেটাকে রেখে দিয়ে ফিরে এলেন, 'আপনি পেয়ে যাবেন। এই লটে একটা সাদা বর্ষা আসছে।'

'তা হলে—!'

'আপনাদের ফোন নাম্বার দিয়ে যান, এলেই জানিয়ে দেব।'

তৃণা দীপের দিকে তাকাল। 'তোমাকে বলেছি কমপ্লেন করলেই আজকাল কাজ হয় না। রিকোয়েস্ট করে বাড়িতে ধরে আনতে হয়। অথচ তুমি সময়ই পাচ্ছ না।'

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

'দেখুন না, আমাদের ল্যান্ড লাইনটা আজ দু'দিন ডেড। কবে যে ঠিক হবে তা ওরাই জানেন। বলছে কেব্‌ল ফল্ট হয়েছে।' তৃণা বলল।

একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন মহিলা, 'তা হলে পরশু আমাকে ফোন করবেন। আর এই নিন, এখানে ইনস্যুরেন্স, মোটর ভেহিক্‌লস সমেত কত টাকা লাগবে তার ডিটেলস আছে। টাকাটা যদি ড্রাফট করিয়ে আনেন তা হলে খুব ভাল হয়।'

'নো প্রবলেম।' কার্ড, কাগজটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল তৃণা।

বাইরে বেরিয়ে এসে দীপ বলল, 'কিছুই মাথায় ঢুকল না।'

'আমরা তিন লাখ টাকা রোজগার করতে যাচ্ছি।'

হাঁ হয়ে গেল দীপ, 'কী ভাবে?'

'যা ভেবেছি তা যদি ঠিকঠাক হয় তা হলে—, না, এখন বলব না।'

'কোনও বিপদ হবে না তো রে।'

'টাকা হাতের মোয়া? না? বিপদ তো থাকবেই। সেটা ম্যানেজ না করলে

টাকা আসবে কী করে? চল, অনেক দিন পার্কে গিয়ে কফি খাইনি।' ট্যাক্সি দাঁড় করাল তৃণা।

চল্লিশ মিনিট পরে কফিতে চুমুক দিয়ে তৃণা বলল, 'আঃ। মন ভরে গেল।'

দীপ বলল, 'কফিহাউসের কফিও বেশ ভাল।'

'দূর। কী রকম মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত গন্ধ।'

দীপ অবাক হয়ে তাকাল, তৃণা কথা বাড়াল না।

কফি শেষ করে তৃণা ব্যাগ খুলে সিগারেট বের করতেই দীপ বলল, 'এই, এখানে না।'

'কেন না?'

'গন্ধে লোকে টের পেয়ে যাবে।'

'দুটো টান দিয়েই নিভিয়ে দেব।' তৃণা চারপাশে তাকাল। ওরা যেখানে বসেছে তার কাছাকাছি একটি বছর তিরিশের যুবক সমবয়সি সঙ্গিনীর সঙ্গে বসে কলকাতার রোড ম্যাপ দেখছিল। একটুও দ্বিধা না করে সিগারেট ধরাল তৃণা। দীপের মুখচোখ থমথমে। ত্রস্ত চোখে চারপাশে তাকাচ্ছে। হঠাৎ যুবক ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। মুখে লালচে দাড়ি, চোখ নীল।

তৃণা হাসল, মাথা নাড়ল।

যুবক জিজ্ঞাসা করল, 'ক্যান উই জয়েন ইউ?'

ঘাড় নাড়ল তৃণা, আবার। এবার ওরা উঠে এল ওদের টেবিলে।

'হাউ অ্যাবাউট এ পাফ্?'

তৃণা সিগারেট এগিয়ে দিতে যুবক সেটা নিয়ে টানল, 'গুড স্টাফ।'

দীপ বলল, 'নো মোর প্লিজ, দিস প্লেস ইজ নট সেফ!'

'ও!' যুবতী চোখ বড় করল, 'লেটস গো টু আওয়ার রুম।'

একটুও আপত্তি না করে তৃণা উঠে দাঁড়াল। লিফটে চেপে তিনতলায় উঠে যুবক ঘরের দরজা খুলে বলল, 'আমি নিক, আমার বান্ধবী ক্যাথরিন, আমরা হিথরো এয়ারপোর্টে মিট করি। তারপর থেকে একসঙ্গে ঘুরছি।'

তৃণা বলল, 'আমি টিনা, ও সন্দীপ।'

চারজন পরস্পরের হাত ধরল একমুহূর্তের জন্যে। দীপ বুঝতে পারল না কেন তৃণা ভুল নাম বলল। তৃণাকে ক্রমশ রহস্যময়ী মনে হচ্ছে তার।

তৃণার দুটো গাঁজাভরা সিগারেট ওরা মহানন্দে টানতে লাগল। শেষ পর্যন্ত নিক বলল, 'জিনিসটা কোথায় পাওয়া যায়?'

'কটা সিগারেট চাই?'

'আমার দু'প্যাকেট, তোমার?'

ক্যাথরিন বলল, 'আমারও দুই!'

দীপ বলল, 'খিদিরপুরে একজন বিক্রি করে!'

নিক বলল, 'আমরা সেখানে যেতে পারি?'

দীপ বলল, 'তোমরা গেলে পুলিশের সন্দেহ হতে পারে।'

নিক বলল, 'সিগারেটের মধ্যে ভরে নিয়ে গেলে এয়ারপোর্ট কাস্টমস বুঝতে পারবে না। তোমাদের তো চিনি না, তাই রিকোয়েস্ট করতে লজ্জা লাগছে।'

'না, না। তোমরা এখানে কত দিন আছ?' তৃণা জিজ্ঞাসা করল।

'কাল সকাল এগারোটায় ঢাকা যাব।'

'তুমি পেয়ে যাবে।'

'ধন্যবাদ। তুমি এমন ভাবে বলছ যে আমি যদি বলি এক কুইন্টাল মাল চাই তাও দিতে পারবে!' নিক হাসল।

'এক কুইন্টল পারব না, কুড়ি কেজি পারতে পারি।'

'সত্যি?' সোজা হয়ে বসল নিক।

'চেষ্টা করব।

'কীভাবে? আমি তো কালই চলে যাব।'

'কোথায় চাই?'

'কোপেনহেগেনে।'

'দেখি, ভেবে দেখি।'

ক্যাথরিন বলল, 'কিন্তু তার তো অনেক দাম।'

নিক বলল, 'আমরা প্রচুর প্রফিট করতে পারি। আমি কিছু লোককে চিনি যারা ক্যাশ টাকা দিয়ে সমস্ত লট কিনে নেবে। কিন্তু পৌঁছবার দায়িত্ব কে নেবে?'

'জিনিসের দাম, পৌঁছবার দায়িত্বের দাম আগে ঠিক করা যাক—!'

'তোমার ই-মেল অ্যাড্রেস দাও। আমি চারদিনের মধ্যে তোমাকে জানাব।'

'টিনা, টি আই এন এ, অ্যাট রেডিফ মেল ডট কম্।'

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে তৃণাকে দিল নিক, 'আমার ঠিকানা। ওয়েল টিনা, আমি জানি না কেন তোমাকে বিশ্বাস করছি, লেটস ওয়ার্ক টুগেদার।'

'কিন্তু টাকাটার পরিমাণ ভেবে এগিয়ো।'

'ওঃ নো। কুড়ি কেজি কত হবে? এক লক্ষ ইউ এস ডলার। নাথিং।'

'গিয়ে খোঁজ নিয়ে দ্যাখো। কিন্তু মালটা কিনতে আমার অ্যাডভান্স চাই।'

'সিওর!' তৃণা তাকাল দীপের দিকে, 'সন্দীপ, তুই দু' প্যাকেট নিয়ে আয়।'

ক্যাথরিন জিজ্ঞাসা করল, 'কত টাকা দেব?'

তৃণা বলল, 'নাথিং। ধরে নাও এটা তোমাদের গিফট দিচ্ছি।'

সন্ধেবেলায় ঘরে ফিরে এসে দীপ প্রায় বিদ্রোহ করে বসল, 'এসব কী করছিস?'

'কী করছি?'

'স্মাগলিং-এর ব্যবসায় নামছিস?'

'আফটার অল ব্যবসা। পাটপাতা রফতানি করলে আপত্তি নেই, তামাক পাতার গাছ বলে গোপনে করতে হবে। এক লক্ষ ডলার মানে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা। কুড়ি কেজির দাম কত হয় খবর নিতে হবে। শুনেছি হিমাচল প্রদেশে সস্তায় পাওয়া যায়। যদি দেখি কুড়ি লাখ টাকার মতো লাভ হচ্ছে তা হলে সুযোগটা ছাড়ব না দীপ।'

'কিন্তু এটা বেআইনি।'

'টাকাটা ব্যাঙ্কে ঢোকার পর আর তা মনে হবে না।'

'তুই কী রিস্ক নিচ্ছিস ভেবে দ্যাখ।'

'দেখছি।'

'তা ছাড়া তুই কোপেনহেগেনে নিয়ে যাবি কী করে? এয়ারপোর্টেই ধরা পড়ে যাবি। কত বছর জেলে থাকতে হবে জানিস?'

'আমি যদি কাজটা নিই তা হলে ধরা পড়ব না।'

'তৃণা প্লিজ। আমার সঙ্গে সম্পর্ক করেছিস বলে তোর দিদিমা খেপে গিয়েছেন। তুই বরং সম্পর্ক ভেঙে দে, উনি আবার অ্যাকসেপ্ট করে নেবেন। তোর দিদিমা মরে গেলে কোটি কোটি টাকার মালিক আইনসম্মতভাবে হয়ে যাবি।'

'তারপর?'

'তারপর যদি চাস আমি তো আছি।'

'তোর জন্যে দিদিমা আমাকে ত্যাগ করেননি। আমার মিথ্যে কথা উনি মেনে নিতে পারেননি। আমি টাকা রোজগার করে ওঁকে দেখাতে চাই আমিও

কম নই। তুই আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলিস না। খুব বিরক্ত লাগছে।' সিগারেট ধরাল তৃণা।

কার্শিয়াং পেরোতে না পেরোতে বৃষ্টি নামল। ঠিক আগের রাতের মতো। কুয়াশা ভেদ করে যে ড্রাইভার গাড়ি চালাতে ওস্তাদ সে রাস্তার একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিতে চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল? কিছু দেখতে পাচ্ছ না?'

'নেহি সাব। রিস্ক হো যায়েগা।'

চন্দ্রনাথ তাকালেন কাবেরীর দিকে, 'প্রার্থনা করুন।'

'হাতে তো সময় আছে।'

'তা আছে। এখনও আড়াই ঘন্টা। দু'ঘন্টার মধ্যে বাগডোগরায় পৌঁছে গেলে প্লেন ধরা যাবে। আমার লোক বোর্ডিং কার্ড নিয়ে অপেক্ষা করবে।' চন্দ্রনাথ বললেন।

কিন্তু গাড়ি চলল পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে। বৃষ্টি থামেনি, স্পিড যেটুকু নেওয়া পাহাড়ি পথে সম্ভব তাও নেওয়া যাচ্ছে না।

প্লেন যে সময়ে ছাড়ার কথা সে সময়েও বাগডোগরায় বৃষ্টি পড়ছে সমানে। ওঁরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে শুনলেন কলকাতার প্লেন আসেনি। কলকাতা থেকে ছাড়ছে খবর পেলে বোর্ডিং কার্ড দেওয়া হবে। এই বৃষ্টি না কমলে এখানে প্লেন নামতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত সাড়ে তিনটের সময় ঘোষণা করা হল কলকাতা থেকে প্লেন ছাড়ছে, বোর্ডিং কার্ড দেওয়া হবে। লাইনে দাঁড়িয়ে সে দুটো সংগ্রহ করে গাড়ি ছেড়ে দিলেন চন্দ্রনাথ। তাঁর পরিচিত লোকটি সেই গাড়িতে চলে গেল শিলিগুড়ি।

আধঘন্টা বাদে আকাশ কালো করে আবার বৃষ্টি এল। সেইসঙ্গে প্রবল হাওয়া। ওঁরা দেখলেন কলকাতা থেকে যাত্রী নিয়ে আসা প্লেন কয়েকবার বাগডোগরার ওপর পাক খেয়ে অন্য দিকে উড়ে গেল। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন, অপর্যাপ্ত আলো এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্যে আজকের কলকাতাগামী যাত্রীদের জন্যে প্লেন নামতে পারল না। তাদের হোটেল সিনক্লেয়ারে থাকার ব্যবস্থা করছে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স। যাঁরা টিকিটের দাম ফেরত চান তারা নিতে পারেন।

চন্দ্রনাথ বললেন, 'কলকাতা যখন যেতেই হবে তখন আজকে হোটেলে থাকাই ভাল। কিছু তো করার নেই।'

'ট্রেনে যাওয়া যায় না? ট্রেন তো সন্ধেবেলায়।' কাবেরী উদ্বিগ্ন।

'হ্যাঁ। দার্জিলিং মেল ছাড়ে সাতটার পরে। কিন্তু টিকিট কি পাওয়া যাবে? টিকিটের দাম নিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দেখলাম সেখানেও টিকিট নেই। সেক্ষেত্রে কী করবেন? তা ছাড়া ট্রেন তো পৌঁছবে কাল সকালে।'

'এসি ফার্স্ট ক্লাস তো প্লেনের সমান ভাড়া। একবার ফোন করে দেখুন না।' কাবেরী অনুরোধ করল।

চন্দ্রনাথ চলে গেলেন খোঁজখবর নিতে। কাবেরীর ইচ্ছে হচ্ছিল না মিছিমিছি একটা রাত শিলিগুড়ির হোটেলে কাটাতে। তার চেয়ে ট্রেনের কামরায় থাকা ঢের ভাল। মনে হবে কলকাতা এগিয়ে আসছে।

মিনিট পনেরো বাদে ফিরে এলেন চন্দ্রনাথ, 'আমার এজেন্টকে ফোন করেছিলাম শিলিগুড়িতে। ওরা বলছে এসি ফার্স্টক্লাস পাওয়া যাবে। ট্রাভেল এজেন্টের টিকিট বলে এরা টাকা এখানে ফেরত দেবে না। বোধ হয় এজেন্ট ক্রেডিটে টিকিট পায়। আমি স্ট্যাম্প মারিয়ে এনেছি। চলুন।'

'স্টেশনে যাব?'

'এত তাড়াতাড়ি ওখানে গিয়ে কী করবেন? চলুন, ওদের বাস ছাড়ছে। ওতে সিনক্লেয়ারে গিয়ে চা কফি খাই। তারপর স্টেশনে যাওয়া যাবে।'

এয়ারলাইন্সের বাসে উঠলেন ওঁরা স্যুটকেস নিয়ে।

দার্জিলিং মেলে আজ যাত্রী তেমন হয়নি। বৃষ্টির কারণেই অর্ধেক খালি যাচ্ছে। এসি ফার্স্টক্লাসে উঠে চন্দ্রনাথ বললেন, 'খামোকা ভয় পেলাম যে জায়গা পাব না। এসি টু টিয়ার তো বটেই এসি থ্রি টিয়ার পর্যন্ত খালি যাচ্ছে।'

'প্লেনের ভাড়া তো এ রকমই।' এসি ফার্স্ট ক্লাসে গুছিয়ে বসে বললেন কাবেরী।

'তা অবশ্য।'

টিকিট চেকার এসে টিকিট দেখে বললেন, 'আপনারা আজ আনডিস্টার্বড যাবেন।'

'মানে?' কাবেরী জিজ্ঞাসা করলেন।

'এসি ফার্স্টক্লাস ফাঁকাই বলতে পারেন।'

'সেকী! ডাকাতি হবে তো তা হলে।'

'না না। লালু সাহেব আসার পরে সশস্ত্র প্রহরী থাকে এখানে।'

চেকার চলে গেলে কাবেরী বললেন, 'সাবধানের মার নেই, দরজাটা বন্ধ করে দিলে হয় না?'

'হয়। তবে ঘুমাবার আগে করাই বোধ হয় ভাল।' চন্দ্রনাথ বললেন।

'রাত্রে কী খাবেন?'

'চিকেন স্যান্ডুইচ, চিকেন কাটলেট, স্যালাড আর রসগোল্লা।'

'সর্বনাশ। এসব কোথায় পেলেন?'

'সিনক্লেয়ার থেকে এনেছি। আপনি টের পাননি।' ব্যাগ থেকে ডিনার প্যাকেট বের করে দিলেন চন্দ্রনাথ।

'সত্যি, আপনি খুব প্রাকটিক্যাল।'

'এটা প্রশংসা না গালাগাল?'

'আশ্চর্য। সব কথায় খুঁত খোঁজেন কেন বলুন তো?'

'যার জীবনে জুত নেই সে তো খুঁত খুঁজবেই।'

'আপনার সঙ্গে কথায় পারব না।'

'কিন্তু ম্যাডাম, আমি অন্য কথা ভাবছি।'

'কী কথা?'

'প্লেনে প্রচুর যাত্রীর সঙ্গে আপনার পাশের সিটে বসে গেলে লোকের চোখে শোভন ঠেকত। এসি ফার্স্টক্লাসের এই ছোট্ট খোপে দু'জনে রাত কাটিয়েছি জানলে তো অনেকেই ফণা তুলবে।' হাসলেন চন্দ্রনাথ।

'আমি কেয়ার করি না। আপনি করলে পাশের কুপেতে যেতে পারেন। চেকার তো বলল, খালি আছে।'

'যাক। ভরসা পেলাম। তা হলে আমি এবার আহ্নিক শুরু করতে পারি?' চন্দ্রনাথ অনুমতি চাইবার জন্যে হাত উঁচু করল।

'আহ্নিক? আপনি দীক্ষা নিয়েছেন নাকি?'

'না না। সেই সৌভাগ্য হয়নি,' ব্যাগ থেকে গ্লাস আর হুইস্কির বোতল বের করলেন চন্দ্রনাথ। তারপর স্টেশনে কেনা বোতল থেকে জল ঢাললেন। প্রথম চুমুক দিয়ে বললেন, 'উল্লাস।'

কাবেরী হাসলেন, 'চিয়ার্সের বাংলাটি চমৎকার। তবে উল্লসিত হচ্ছেন আপনি, আমি নই।'

'গন্ধে তো অর্ধভোজন হয়!'

'আমি অর্ধেকে বিশ্বাস করি না।'

'ওরে ব্বাবা। কাল যা ফর্ম দেখিয়েছেন তাতে আমার চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে

গিয়েছিল। তবে আজ আমার কথা শুনলে দিতে পারি।'

কাবেরী হাসলেন, 'বেশ। তাই হবে।'

চন্দ্রনাথ মাথা নাড়লেন, 'কিন্তু আর তো গ্লাস নেই।'

'আমি জানি না।'

নিজের গ্লাস শেষ করে তাতে হাফ পেগ ঢেলে জল মিশিয়ে এগিয়ে দিলেন চন্দ্রনাথ, 'আপনি শেষ করলে আবার আমি নেব।'

'আমি যদি শেষ না করি?'

'সর্বনাশ।'

কাবেরী সঙ্গে আনা ব্যাগ থেকে একটা সুদৃশ্য গ্লাস বের করে বললেন, 'এটা আপনার জন্যে।'

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। দরজায় শব্দ হল। অ্যাটেন্ডেন্ট কম্বল আর বালিশ দিয়ে গেল। যাওয়ার আগে গ্লাস দুটো দেখে গেল।

কাবেরী আজ খুব ধীরে খাচ্ছিলেন, 'একটা গল্প বলুন।'

'গল্প? মনে পড়ছে না।'

'তবু?'

চন্দ্রনাথ চোখ বন্ধ করলেন। একটু ভাবলেন, 'একজন নাবিক জাহাজ থেকে অচেনা শহরে নেমে হাঁটতে হাঁটতে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে একটি বিশেষ সামুদ্রিক পাখির মাংস খেতে চাইছিল। তাকে এক প্লেট সেই পাখির মাংস এনে দেওয়া হল। এক টুকরো খেয়ে নাবিক বলল, 'এটা ওই সামুদ্রিক পাখির মাংস নয়। কিন্তু ওয়েটার থেকে ম্যানেজার এমন কী কুক পর্যন্ত হলফ করে বলল তারা ভুল মাংস দেয়নি। তখন নাবিক কোমর থেকে পিস্তল বের করে নিজের মাথায় গুলি করে মরে গেল। প্রশ্ন হল, কেন নাবিক এমন কাণ্ড করল?'

'নাবিক আগে নিশ্চয়ই ওই পাখির মাংস খেয়েছিল। বোধ হয় যারা এর আগে ওকে খাইয়েছিল তারা অন্য মাংস খাইয়ে মিথ্যে বলেছিল। এখানে সত্যি শোনার পর ওর মনে গ্লানি জন্মেছিল, তাই আত্মহত্যা করেছিল।' কাবেরী বললেন।

'গল্পটা আপনি জানতেন?' অবাক হলেন চন্দ্রনাথ।

মাথা নেড়ে হাসলেন কাবেরী।

আজ দু'পাত্রের বেশি পান করলেন না চন্দ্রনাথ। কাবেরীও আর চাননি। তারপর ডিনার সেরে কাবেরীর বিছানা ঠিক করে দিয়ে চন্দ্রনাথ বললেন, 'শুয়ে পড়ুন।'

'আমি তো প্রথম রাতে ঘুমোই না। এখন কি ঘুম আসবে!'

'ট্রেনের দুলুনিতে শৈশবের মজা পাওয়া যায়। সেটা অনুভব করতে পারলে দেখবেন ঘুম এসে যাবে।' চন্দ্রনাথ নিজের আসনে বসলেন।

বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন কাবেরী, 'আমি ভাবতেই পারছি না।'

'সেটা কী?'

'এই প্রথম এরকম একটা কুপেতে একজন পুরুষমানুষের সঙ্গে যাচ্ছি যাঁকে কদিন আগেও চিনতাম না। যাচ্ছি কিন্তু কোনওরকম অস্বস্তি হচ্ছে না। কেন বলুন তো?'

'আপনিই বলুন।'

'ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, আমি কালো, কেউ আমাকে দেখে আকর্ষণ বোধ করবে না। মায়ের টাকা আছে বলে বিয়ে হয়ে যাবে কিন্তু সম্মানিত হব না। যদি কেউ আকর্ষণ বোধ না করে তা হলে তার কাছ থেকে বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই। দুই, আপনি অত্যন্ত ভদ্রলোক। ওই ভদ্রতাবোধটাকে এমন ভাবে লালন করেছেন যে তার মুখোশটাই আপনার মুখ হয়ে গেছে।'

হাসলেন চন্দ্রনাথ, 'আপনি ঘুমোন।'

'আপনি এমনভাব করছেন যেন আমি বাচ্চা মেয়ে। জানেন, আমার চারপাশের কেউ, একমাত্র লেডি কণিকা চ্যাটার্জি ছাড়া, আমার মুখের ওপর কথা বলতে সাহস পায় না!'

'আপনার ব্যক্তিত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

'ছাই করেন। তা হলে বলুন, আমার ব্যাখ্যাটা ভুল?'

'সভয়ে বলব না নির্ভয়ে?'

'আমাকে ভয় পাওয়ার কি কোনও কারণ আছে?'

'বেশ। বলছি। প্রথম বয়সে একটি আমেরিকান ছবি দেখেছিলাম যার নায়িকা স্প্যানিশ হওয়া সত্ত্বেও গায়ের রং ছিল কালো। কিন্তু মুখ চোখ শরীর দুর্দান্ত ছিল। পোস্টারে লেখা ছিল ব্ল্যাক ফ্লেম। আজ অবধি সেই ছবিটাকে ভুলতে পারিনি। বিদেশে থেকেছি বহু দিন। কালো মেয়েদের সুন্দর ফিগারের ছবি দেখেছি অনেক। কিন্তু তাদের মুখের এমন একটা ভোঁতা ভোঁতা গড়ন যা আমার দেখা ছবির সঙ্গে কিছুতেই মেলেনি। আপনি অবিকল তাই।' চন্দ্রনাথ বললেন।

মুখ ফিরিয়ে নিলেন কাবেরী।

'আলো নিভিয়ে দিই? তা হলে ঘুম আসবে।'

কাবেরী কোনও জবাব দিলেন না। মনে হচ্ছিল কথা বলতে গেলে ধরা পড়ে যাবেন।

লেডি কণিকা চ্যাটার্জি তাঁর বসার ঘরে বসে সেক্রেটারির তৈরি করে দেওয়া ভ্রমণসূচির ওপর চোখ রাখছিলেন। ইদানীং প্লেনে দীর্ঘ সময় বসে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বলেই বিদেশি ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে সেক্রেটারিদেরই পাঠান। তেমন প্রয়োজন হলে ওঁদের অনুরোধ করেন ভারতে আসতে। দীর্ঘকালের সম্পর্কে ওঁরা তাঁকে জানে বলেই কিছু মনে করে না। কিন্তু ইউরোপের দুটি দেশে যাঁরা ওঁর ক্লায়েন্ট ছিলেন তাঁরা এক বছরের মধ্যে দেহ রেখেছেন এবং তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না বলে এখন অসুবিধে হচ্ছে। যত অসুবিধে হোক একবার ঘুরে আসা উচিত। এ ব্যাপারে কথা বলার জন্যে তিনি এই সন্ধেবেলায় কাপুরকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কাপুর সঙ্গে গেলে কিছু ব্যাপারে তাঁর খুব সুবিধে হয়।

ঘড়ি দেখলেন লেডি চ্যাটার্জি আর তখনই তাঁর ব্যক্তিগত ফোন বেজে উঠল।

সি এল আই দেখে নাম্বার বুঝতে পারলেন না তিনি, সাড়া দিলেন তাই, 'হ্যালো।'

'দিদু!' কান্না জড়ানো গলা।

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেলেন লেডি। ভাবলেন রিসিভার নামিয়ে রাখবেন।

'প্লিজ দিদু, লাইন কেটে দিয়ো না।'

'আমি আর নতুন মিথ্যে শুনতে রাজি নই। ও কে!'

'মিথ্যে নয় দিদু। সত্যি। খুব সত্যি!'

'কিন্তু সেই সত্যি শুনতে আমি আগ্রহী নই।'

'আমি তা হলে কাকে বলব? কাল রাত্রে মাকে বলতে গিয়েছিলাম—!'

'আবার মিথ্যে? তুমি জানো না, সন্ধের পর তোমার মা ফোন ধরে না?'

'জানি। তবু চান্স নিয়েছিলাম। মায়ের বয়ফ্রেন্ড ফোন ধরেছিল, লাইন দেয়নি।'

'বয়ফ্রেন্ড?'

'হ্যাঁ। তখন অনেক রাত। আমি নিজের পরিচয় দিলাম। তবু বলল, ওঁরা নাকি খুব ব্যস্ত আছে, কাল সকালে টেলিফোন করতে। আমি দুঃখে আজ আর করিনি।'

'তুমি এক মিনিট ফোনটা ধরো।'

দ্বিতীয় টেলিফোন টেনে নিয়ে ডায়াল করলেন লেডি। রিং হচ্ছে। এখন কাবেরী টেলিফোন ধরে না, বেয়ারার কাছে শোনা যাবে। সাড়া পাওয়া গেল।

'লেডি চ্যাটার্জি।'

'নমস্তে মেমসাব।' আবদুল বলল, 'হামারা মেমসাব বাংলোমে নেহি হ্যায়।'

অবাক হলেন লেডি, 'কোথায় গিয়েছে?'

'কলকাত্তা। ফ্লাইট মে গিয়া।'

'আচ্ছা! একা এসেছে?'

'নেহি মেমসাব। ডাকদার সাহেব ভি থা।'

'কোথাকার ডাক্তার?'

'দার্জিলিং।'

'কাল ডক্টর সাব রাত্রে এসেছিল?'

'জি। বহুৎ বারিশ হুয়া...।'

লাইনটা কেটে দিলেন লেডি। একটা বেয়ারাকে এ রকম প্রশ্ন করতে তাঁর আত্মসম্মানে লাগছিল। কিন্তু কাবেরী কলকাতায় এসেছে অথচ তিনি জানেন না! ওই ডক্টর লোকটা কাল রাত্রে ওর কাছে ছিল? ইদানীং তাঁর মনে কাবেরী সম্পর্কে একটা অপরাধবোধ তৈরি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সারাটা জীবন তিনি মেয়ের ওপর সুবিচার করেননি। ওর রঙের জন্যেই যে তাঁর মন বিরূপ হয়েছে একথা কাউকে বললে তিনি নিজেই ছোট হয়ে যাবেন এটা তিনি জানেন। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর মেয়ের সঙ্গে দূরত্ব দূর করেননি পুরনো অভ্যেসে। কিন্তু কথা বলেছেন প্রয়োজনে। কিন্তু এই বয়সে এসে ছেলেবন্ধুর সঙ্গে রাত কাটানোটা যে ওর চরিত্রবিরোধী তা বুঝতে পেরেও মানতে পারছেন না।

'কী বলছিলে যেন?' প্রথম ফোনটা তুললেন।

'তুমি ছাড়া আর কেউ নেই যাকে বলতে পারি দিদু।' আবার গলায় কাঁপুনি।

'কেন? সে কোথায়?'

'নেই।'

'নেই মানে?' কপালে ভাঁজ পড়ল লেডি চ্যাটার্জির।

'আমি টেলিফোনে বলতে পারব না। আমাকে তোমার কাছে যাওয়ার অনুমতি দাও। অন্তত একবার।' কান্নাটার জোর বাড়ল।

'ঠিক আছে, ভেবে দেখব।'

'না না দিদু। আমি দশ মিনিটের সময় চাই। আজই। তারপর তুমি সব শুনে না বললে আমি মেট্রো রেলে ঝাঁপিয়ে পড়ব। লাস্ট ট্রেন দশটায় যায়।'

'মেট্রো রেল?'

'হ্যাঁ। প্ল্যাটফর্ম থেকে লাফিয়ে পড়লে কোনও টের পাওয়া যায় না।'

'ননসেন্স, ঠিক আছে। বাড়িতে এসো। বাট নট মোর দ্যান টেন মিনিটস।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে চোখ বন্ধ করলেন লেডি চ্যাটার্জি। কাবেরী যদি ভাল বন্ধু পায় তা হলে খারাপ কি! মেয়েটার একাকিত্ব দূর হবে। হঠাৎ শরীরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। জল খেলেন তিনি। আজকাল মাঝেমাঝেই শরীর জানান দিচ্ছে, ডক্টর দত্তগুপ্ত বলেছেন, 'বেশি পরিশ্রম করছেন। এই বয়সে অনেকটা বিশ্রাম দরকার।'

নীচ থেকে ইন্টারকমে জানাল কাপুর এসেছেন।

রুমালে চশমা মুছে নিলেন লেডি চ্যাটার্জি।

'গুড ইভনিং ম্যাডাম।' কাপুর ঢুকলেন।

'গুড ইভনিং। কাপুর, সামনের সপ্তাহে আমাকে ইউরোপে যেতে হচ্ছে। জাস্ট পাঁচ দিনের ট্রিপ। আমার এক দাদা এয়ারফোর্সে ছিলেন। রিটায়ার্ড। এতদিন কাবেরীর কাছে ছিলেন। ভেবেছিলাম ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যাব। কিন্তু ওঁর শরীর ভাল নয়। পাহাড়ে থাকতে জ্বর হয়েছিল। কাল এখানে এসেই হার্টের প্রবলেম হয়। এখন নার্সিংহোমে আছেন। আমার মনে হয় তুমি সঙ্গে থাকলে একটু কমফর্টাবেল ফিল করব।'

'আপনি যেমন চাইবেন হবে।'

'তোমার শরীর?'

'ঠিক আছি।'

'তুমি এই ফাইলটা চেক করো। কোনও সাজেশন থাকলে বলো।'

'ও কে ম্যাডাম!'

'এবার ব্যক্তিগত কথা। তৃণার সঙ্গে যে ছেলেটি, হ্যাঁ দীপ, তার খবর জানো?'

'না ম্যাডাম। ওরা একসঙ্গে আমার ফ্ল্যাট থেকে চলে গিয়েছিল।'

'রিলেশন কেমন ছিল?'

'ভাল। বেশি ভাল।'

'কী করে বুঝলে?'

' প্লিজ, আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না।'

'ও। তা হলে কি এটাও আর একটা মিথ্যে?'

কাপুর তাকালেন। লেডি চ্যাটার্জি বললেন, 'সে নাকি নেই। তৃণা আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। দশ মিনিট সময় দিয়েছি। ওর মায়ের ব্যাপারে একটা কথা বলল যা আমি জানতাম না। ভেরিফাই করে জানলাম কথাটা অ্যাকসিডেন্টলি সত্যি। তাই মনে হল, হয়তো ও সত্যি কথা বলতে আরম্ভ করেছে।'

কাপুর কিছু বললেন না।

'আঃ। তোমাকে পাথরের মূর্তি হয়ে বসে থাকতে কে বলেছে?'

'ম্যাডাম। আমি যা বলব তা আপনার হয়তো ভাল লাগবে না।'

'তুমি আমাকে জীবনের সেরা খারাপ লাগা দিয়েছ, আর কী দেবে!'

'আমি? ম্যাডাম? কী বলছেন?'

'হ্যাঁ। থাক সে কথা। কী বলছিলে?'

'ম্যাডাম, আপনার বয়স হয়েছে। বেশি দিন সক্রিয় থাকা সম্ভব হবে না। এই এত বড় ব্যবসার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার কাউকে না কাউকে দিতে হবে। তিনজন আপনার সামনে রয়েছে। হরপ্রীতের ছেলে, তৃণা আর কাবেরী। কাবেরী ইন্টারেস্টেড নয়। ওর পক্ষে ব্যবসা বোঝাও সম্ভব হবে না। আপনার নাতিকে আপনি মেনে নিতে পারবেন কিনা জানি না। রইল তৃণা। আমার ধারণা সে দ্রুত নিজেকে নষ্ট করছে। কয়েক দিন আগে ওদের রেসকোর্সে দেখা গিয়েছে। শুনলাম কয়েক লাখ টাকা জিতেছে। কিন্তু যে টাকা ওরা খেলেছিল তা ওর হাতে গেল কী করে তা বুঝতে পারছি না। ও যদি ঠিক থাকত তা হলে স্বচ্ছন্দে ওকেই দায়িত্ব দেওয়া যেত। তা হলে?' কাপুর সমস্যাটা তুলে ধরলেন।

'চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জি লিমিটেড কোম্পানি। আমার শেয়ার বিক্রি করতে চাইলেই প্রচুর লোক এগিয়ে আসবে। তারাই চালাবে। হ্যাঁ, বলতে পার, স্যার অমলেশের পরিবারে থাকছে না। কী করা যাবে।' লেডির কথা শেষ হতেই নীচ থেকে জানাল, 'তৃণা দেখা করতে চায়!' লেডি বললেন, 'পাঠিয়ে দাও।'

কাপুর বললেন, 'আমি তা হলে উঠি!'

'না। পাশের ঘরে গিয়ে খোঁজ নাও তো বাগডোগরা থেকে ফ্লাইট কখন কলকাতায় ল্যান্ড করেছে। দেন, কাম ব্যাক হিয়ার।'

কাপুর চলে গেলেন পাশের ঘরে। ওপাশের দরজা দিয়ে ঢুকল তৃণা। পরনে লম্বা ঝুলের স্কার্ট। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'দিদু, আসব?'

'এসো। বসো। কী বলবে বলো?'

চেয়ারে বসে ফ্যাঁচ করে কেঁদে উঠল তৃণা।

'নাটক কোরো না।'

'আমি খুব খারাপ জানি।'

'সেটা জানাতে আসার দরকার ছিল না।'

এই সময় কাপুর ফিরে এলেন, 'ম্যাডাম, ডিউ টু ব্যাড ওয়েদার ওখান থেকে কোনও প্লেন আজ এখানে আসেনি।'

'তাই বলো। বসো।'

ঝট করে তাকাল তৃণা। লেডি চ্যাটার্জি বললেন, 'কাপুর তোমার সব জানে।'

'ওয়েল! ও আমাকে অপমান করছিল বলে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।'

'অপমান করছিল?'

'হ্যাঁ। তোমার কাছ থেকে টাকা চাইতে বলছিল। গালাগাল করত খুব। বাড়ি থেকে টাকা চুরি করে আমাকে রেসকোর্সে নিয়ে গিয়েছিল। রেস খেলেছে। তারপর বলেছিল ওর বন্ধুদের সঙ্গে দিঘায় বেড়াতে যেতে। আমি রাজি হইনি। ও বাবা মায়ের কাছে ফিরে গেছে।'

'তোমাদের বিয়েটা?'

'ও বলেছে মিউচুয়াল ডিভোর্সে রাজি আছে।'

লেডি কাপুরের দিকে তাকালেন। কাপুর হাসলেন, 'কথাগুলো যদি সত্যি হয় তা হলে খুবই আনন্দের কথা। ডিভোর্সের ব্যবস্থা করা যাবে।'

'কিন্তু তোমাদের সম্পর্ক খারাপ হল কবে থেকে?'

'কিছু দিন থেকেই হচ্ছিল। ওই পুলিশের ব্যাপারটা ঘটার পর থেকে—।'

'মিথ্যে কথা।'

'না। মিথ্যে বলছি না।'

'কাপুর। তুমি আমাকে বলতে পারনি। বলেছিলে ওদের সম্পর্ক বেশ ভাল। আমি চাই তুমি ওর সামনে ওটা এক্সপ্লেন করবে!'

কাপুর মুখ খোলার আগেই তৃণা বলল, 'ওঃ। সেই ব্যাপারটা? ওকে গুন্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলে ও খুব খেপে গিয়েছিল আমার ওপর। ও জানতে পেরেছিল সেটা কাপুর আঙ্কলই করিয়েছে। তাই কাপুর আঙ্কলকে টিজ করার জন্যে ওঁকে দেখিয়ে আমাকে চুমু খাচ্ছিল। কাপুর আঙ্কল চলে যেতেই সেটা বন্ধ করে।'

'হতে পারে ম্যাডাম?'

'তুমি কী চাও?' নাতনিকে প্রশ্ন করলেন লেডি চ্যাটার্জি।

'আমি ভাল হতে চাই।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

'কোরো না। কিন্তু শেষবার সুযোগ দাও।'

'লুক তৃণা। আমার ব্যবসা, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির এক কণাও তুমি পাবে না। আজ যা বলছ তা যদি সত্যি হয় তা হলে ব্যাপারটা আমি নতুন করে ভেবে দেখব। কিন্তু তুমি কীভাবে নতুন জীবন শুরু করতে চাও?'

'আমি আবার কলেজে যাব।'

'সেখানে গেলে তো আবার সেই ছেলের সঙ্গে দেখা হবে।'

'দিস টাইম আই উইল বি ডিফারেন্ট।'

'ঠিক আছে। তুমি চ্যাটার্জি হাউসে থাকতে পারো। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে একটা কিছু জানতে পারলেই এখান থেকে চিরকালের জন্যে বেরিয়ে যেতে হবে। রাজি?'

'রাজি!'

'এ বাড়ি থেকে কোথাও যেতে হলে গাড়িতে যাবে আসবে। কলেজ ছাড়া কোথাও তুমি যাও আমি চাই না। তোমার কোনও বন্ধুকে এ বাড়িতে আনা চলবে না। তোমার ঘরে কোনও টেলিফোন থাকবে না। আপত্তি আছে?'

'না। শুধু একটা কম্প্যুটার, পড়াশুনায় খুব প্রয়োজন—।'

'ইউ উইল গেট দ্যাট। তোমার জিনিসপত্র?'

'স্যুটকেস। নীচে রেখে এসেছি।'

'কাপুর, ওকে নিয়ে যাও। আমার ফ্লোরের এক্সট্রিম কর্নারের ঘরটা ওকে দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দাও। আশা করি তোমার সুমতি হবে।'

নিজের ঘর পাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে লাফিয়ে উঠল তৃণা। ওল্ড লেডিকে কাত করা গেছে। মনে হচ্ছে সে যদি অ্যাকটিং করতে চাইত তা হলে হিরোইন হতে পারত। একটাও টাকা দেবে না ওকে। বুড়ি মরবে নিশ্চয়ই ওইরকম উইল করে। মরুক। কে চায় ওর টাকা। দরজায় নক হল।

দরজা খুলল তৃণা। কাপুর দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পেছনে তিনটি লোক। তারা ঘরে ঢুকে কম্প্যুটার বসিয়ে গেল। এ বাড়ির অফিস ঘরে এ রকম কয়েকটা পড়ে আছে।

লোকগুলো চলে গেলে কাপুর বললেন, 'তৃণা। ইটস ইওর লাস্ট চান্স।'

'আই নো।'

'একটু ভাল ভাবে চলো। উনি মন পালটাবেন।'

'ঠিক আছে।'

'অ্যাট লিস্ট ইউরোপ ট্যুর থেকে ফিরে এসে উনি যেন তোমার বিরুদ্ধে কিছু না শোনেন।' কাপুর বললেন।

'ইউরোপ ট্যুর?'

'হ্যাঁ। ব্যবসার কাজে যাচ্ছেন সামনের সপ্তাহে। আমিও যাচ্ছি।'

'বাঃ। কী ভাল!'

'সত্যি কি দীপের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক শেষ হয়েছে?'

'কী বলতে চাও?'

'ওকে!'

'ওর বাড়িতে ফোন করে দ্যাখো।'

কাপুর মাথা নাড়লেন। তারপর গুডনাইট বলে চলে গেলেন।

দরজা বন্ধ করে ছুটে গেল তৃণা কম্প্যুটারের কাছে। পরীক্ষা করে দেখল ইন্টারনেট সিস্টেম চালু আছে যন্ত্রটায়।

প্রথমেই সে 'দীপ রেডিফ মেল ডট কম' খুলল। দ্রুত টাইপ করল। 'আই অ্যাম ফাইন। মাই ফার্স্ট এনকাউন্টার ইজ সেন্ট পার্সেন্ট সাকসেসফুল।' মেলটা পাঠিয়ে ইরেজ করে দিল সে। প্রতি রাত্রে দীপ আর সে মেল চেক করবে বলে ঠিক করেছিল। তার পক্ষে কম্প্যুটার পাওয়া নিয়ে সমস্যা হতে পারে বলে মনে হয়েছিল কিন্তু সেটা যে এত দ্রুত সম্ভব হবে ভাবতে পারেনি। আজ বিকেলে সাইবার কাফেতে গিয়ে ওঁরা দু'জন মেল আইডেন্টিটি তৈরি করেছিল। খুব ভাল লাগছিল তৃণার। হঠাৎ খেয়াল হল। নিজের মেল বক্স খুলল সে। অবাক হয়ে দেখল একটা মেসেজ এসেছে।

মেসেজটা পড়ল সে। 'গেট রেডি। আই অ্যাম লিভিং ফর স্টকহোম টু নাইট। ওয়েট টিল ইউ হিয়ার ফ্রম মি, নিক।'

কাবেরীর ঘুম ভাঙল বর্ধমানের একটু আগে। ঘুম ভাঙল কিন্তু চোখ খুললেন না। মনে হচ্ছিল এত আরাম অনেক দিন পাননি তিনি। অনেক অনেক দিনের পর রাত না জেগে কাটল। ট্রেনের এই চলন্ত কুপেতে প্রায় অজানা একটা পুরুষের সঙ্গে থেকেও এত স্বস্তিতে ঘুমানো যায় তা আগে বিশ্বাস করতেন না। ডক্টর চন্দ্রনাথ তো তাঁর অজানাই। মাত্র দু'দিন দেখেছেন। আচ্ছা,

ঠিক কত দিন দেখলে একটি মানুষকে সঠিক জানা যায়? হরপ্রীতকে তো অনেক বছর দেখেও জানতে পারেননি। ট্রেন থামল। কানে এল মিহিদানা সীতাভোগের আহ্বান। চোখ খুলে পাশ ফিরলে দেখতে পেলেন চন্দ্রনাথ নেই। ওঁর জিনিসপত্র আছে দেখে শান্ত হলেন।

চন্দ্রনাথ ফিরে এলেন কাগজ নিয়ে।

'গুড মর্নিং ম্যাডাম। ঘুম ভাল হয়েছে তো?'

'হুঁ। আসছি।' তোয়ালে নিয়ে টয়লেটে চলে গেলেন কাবেরী।

ফিরে এসে দেখলেন চন্দ্রনাথ মন দিয়ে কাগজ পড়ছেন। কাবেরী বললেন, 'একটা অনুরোধ করব। আমার নাম কাবেরী, ম্যাডাম না বলে নাম ধরে ডাকবেন।'

'বাঃ। খুব ভাল। চা বলে দিয়েছি, আসছে।'

'কলকাতায় কোথায় উঠবেন?'

'একটা চেনা হোটেল আছে সদর স্ট্রিটে, লিটন হোটেল।'

'কালই ফিরবেন?'

'উপায় থাকলে আজই।'

'ফেরাটা খুব জরুরি?'

'হ্যাঁ। আপনাকে একজন পেশেন্টের কথা বলেছিলাম।'

'ও।'

'আপনার কত দিনের প্রোগ্রাম?'

'জানি না। গিয়ে কথা বলি, তারপর ঠিক করব।'

'লেডি চ্যাটার্জির সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে আমার কথা যদি শোনেন তা হলে বলব, সংঘাতে না যাওয়াই ভাল।' চন্দ্রনাথ তাকালেন।

বেয়ারা ট্রেতে চায়ের পট সাজিয়ে নিয়ে আসতেই ওঁরা কথা বন্ধ করলেন।

যেহেতু লেডি চ্যাটার্জির সঙ্গে একই ফ্লোরে থাকার সুযোগ হয়েছে তাই তৃণার পক্ষে ওঁর ঘরে যাওয়ার সুযোগ এসেছে। তৃণা জানে বুড়ি এটা পছন্দ করবে না। ওঁর কানে খবরটা তুলে দেওয়ার লোকের অভাব নেই।

আজ রবিবার। ক্লাস নেই। তৃণা ঘর থেকে বেরিয়ে লেডি চ্যাটার্জির ঘরের

দরজায় চলে এল। দরজা খোলা। এক বৃদ্ধ পরিচারক রয়েছে পাহারায়, 'দিদু আছে?'

'বসুন।' লোকটি চলে গেল ভেতরে।

অন্তত গোটা পাঁচেক ঘর নিয়ে লেডি থাকেন। বুড়ির অতগুলো ঘরের কী দরকার? টেলিফোন বাজল। চট করে রিসিভার তুলল তৃণা, 'হ্যালো!'

'কাল থেকে এক ভদ্রমহিলা আপনাকে ফোনে চাইছেন। কী করব?'

যথাসম্ভব বয়স গলায় এনে তৃণা বলল, 'কী নাম?'

'মিসেস সেন। অঞ্জনের মা।'

'দাও।'

চকিতে চারপাশে তাকাল তৃণা। শেষ পর্যন্ত ওরা ধরতে পেরেছে বলেই এখানে ফোন করেছে। কী করবে সে এখন?

'হ্যালো?' মহিলার গলা।

'বলুন। লেডি চ্যাটার্জি বলছি।' গলাটা বয়স্ক ঠেকল নিজের কানেই।

'ওঃ। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব ভাবতেই পারিনি।'

'আপনি?'

'আমার ছেলে আর আপনার নাতনি একই কলেজে পড়ে।'

'ও।'

'আমার বাড়িতে এসে বেচারা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, এখন কেমন আছে?'

'ভাল, ভাল আছে।' তৃণা শ্বাস বন্ধ করল, 'আর কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ। ও যেদিন এসেছিল সেদিনই আমার বাড়ি থেকে একটা বড় ডায়মন্ডের নেকলেস মিসিং। ও কি টয়লেটে নেকলেসটাকে দেখতে পেয়েছিল, যদি জিজ্ঞাসা করেন।'

'হ্যাঁ। পেয়েছিল। সে কথা আমাকে বলেছে। বলেছে ভদ্রমহিলার উচিত নয় ওখানে গয়না ফেলে রাখা, কিন্তু বাই এনি চান্স আপনি কি ওকে সন্দেহ করছেন?'

'না না। ছি। আপনার নাতনি!'

'পুলিশকে জানিয়েছেন?'

'না। জানালে তো ওরা আপনার নাতনিকে প্রশ্ন করবে। তাই—!'

'আই ডোন্ট মাইন্ড। আমি আমার নাতনিকে চিনি।'

'তা হলে কাকে যে সন্দেহ করি। দোষ আমারই।'

'ও কে! রাখছি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখতেই বৃদ্ধ কাজের লোকটি ঘরে এল, 'উনি এখন বাথরুমে। কী দরকার জিজ্ঞাসা করেছেন।'

'কিছু না। এমনি দেখা করতে এসেছিলাম।' তৃণা হাসল।

ঘরে ফিরে খুব জোরে শ্বাস নিল সে। একেই বলে অ্যাকসিডেন্ট। কিন্তু অ্যাকসিডেন্টটা তার উপকার করল। ভাগ্যিস ওই সময় বুড়ি বাথরুমে এবং সে ওই ঘরে ছিল। নিশ্চয়ই ভেতরে প্যারালাল লাইন আছে, বাথরুমে থাকায় বুড়ি ধরতে পারেনি।

সে যে-গলায় কথা বলেছে তা অঞ্জনের মা বুঝতে পারেনি। অপারেটার প্রশ্ন করে লাইন দিয়েছে বলে আগেই বিশ্বাস করে ফেলেছে। এরপর কি মহিলা পুলিশের কাছে যাবে? এমন তো হতে পারে ওটা কালো টাকায় কেনা ছিল। পুলিশকে জানালে নিজেরাই বিপদে পড়বে। যাই হোক, খুব বড় ফাঁড়া কেটে গেল।

বিছানায় শুয়ে পড়ল তৃণা।

দীপকে বলে এসেছে খোঁজখবর নিতে। কোথায় কুড়ি কেজি ভাল গাঁজা পাওয়া যায়! এক সঙ্গে এক জায়গা থেকে না পেলে কয়েক জায়গা থেকে যদি পাওয়া যায়। কাজের দায়িত্বটা নেওয়ার সময় তার মনে কোনও ধারণাই ছিল না কীভাবে ওটা করবে। স্রেফ জেদের বশে হ্যাঁ বলেছে কারণ কাজটায় প্রচুর টাকা আছে।

নিক যদি নিয়ে যেতে বলে—। সঙ্গে সঙ্গে কাপুর আঙ্কলের কথা মনে এল। বুড়ির সঙ্গে কাপুর আঙ্কল ইউরোপ যাচ্ছে ব্যবসার কাজে। লেডি কণিকা চ্যাটার্জি ভি ভি আই পি ক্যাটাগরির যাত্রী। দমদম এয়ারপোর্টে তাঁর জিনিসপত্র ছোঁয়ার ক্ষমতা কারও হবে না। যে দেশেই যাবেন সে-দেশের কাস্টমস নিশ্চয়ই তাঁর গুরুত্ব সম্পর্কে আগেভাগেই ওয়াকিবহাল থাকবে। অতএব গাঁজার প্যাকেট যদি ওঁর লাগেজের ভেতর দেওয়া যায় তা হলে স্বচ্ছন্দে ভারত থেকে বেরিয়ে যাবে। সেটা কীভাবে সম্ভব ভাবতে হবে।

হাসল তৃণা। দীপটা একটা গাধা। সব সময় ভয়ে কুঁকড়ে থাকে।

রবিবার হলেও ঠিক সকাল সাড়ে ন'টায় চ্যাটার্জি হাউসের অফিসের চেয়ারে বসবেন লেডি চ্যাটার্জি। স্নান করার আগে ডাক্তার এসেছিল। বলেছে প্রেসারটা একটু বাড়তির দিকে। ওষুধ ছাড়াও এখন বিশ্রাম দরকার। কথাটা যে

ঠিক আজকাল বুঝতে পারেন তিনি। একটু একটু করে শরীরের অনেক কিছুই চেহারা বদলাচ্ছে। চামড়ায় যে সব রেখা সরু হয়েছিল তা এখন গভীর হয়েছে। দ্রুত হাঁটতে গেলেই মাথা ঘোরে। এবার এই ইউরোপ ট্যুরে যাওয়াও ঠিক হচ্ছে না। না। এই শেষবার। তারপর ফিরে এসে বোর্ড মিটিং ডাকবেন।

বিদেশি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কী কী ব্যাপারে চুক্তি করা যেতে পারে তার ফাইল দেখছিলেন লেডি। আজকালকার লোকজন এসব কম্প্যুটারের সামনে বসে দ্যাখে। কিন্তু চেষ্টা করে হাল ছেড়েছেন তিনি। বড্ড চোখে লাগে।

ফোন বাজল। কাবেরীর গলা। 'তুমি কি খুব ব্যস্ত।'

'হ্যাঁ, তবে তুমি আসতে পারো।'

রিসিভার রেখে ঘড়ি দেখলেন তিনি। এখন কোনও প্লেনের আসার কথা নয়। তা হলে ট্রেনে এসেছে মেয়ে। খুব জরুরি না হলে নিশ্চয়ই আসত না। ফাইলটা বন্ধ করে এক পাশে সরিয়ে রাখলেন তিনি।

ভেজানো দরজা খুলে কাবেরী ভেতরে ঢুকলে মেয়ের দিকে তাকালেন লেডি চ্যাটার্জি। আজ যেন অন্য রকম লাগল। ত্বকের রং বদলায়নি, কথাও নয়, শরীর বেশ ছিপছিপে হয়েছে। বললেন, 'বসো।'

কাবেরী বসলেন। লেডি চ্যাটার্জি বললেন, 'বুঝতে পারছি ট্রেনে এসেছ। হঠাৎ?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে।' বলে কাবেরী যোগ করলেন, 'কাল ওখানে প্লেন নামেনি।'

'ট্রেনের টিকিট সহজেই পেয়ে গেলে?'

'হ্যাঁ। এসি ফার্স্ট ক্লাসে সাধারণত ভিড় হয় না।'

'তোমার তো একা ট্রেনে ট্র্যাভেল করার অভিজ্ঞতা নেই।'

মায়ের মুখের দিকে তাকালেন কাবেরী। ভদ্রমহিলাকে কখনওই মা বলে মনে হয় না।

'আমার সঙ্গে পরিচিত এক ভদ্রলোক এসেছেন। উনি মন্তামামার ডাক্তার।'

'আই সি। ও হ্যাঁ। তোমার মন্তামামা নার্সিংহোমে আছেন। অবশ্য নাথিং সিরিয়াস।'

'জ্বর কমামাত্র ওঁর চলে আসা ঠিক হয়নি।'

'না এলেই পারতেন। ওঁর শরীরের অসুবিধের কথা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।' লেডি বললেন, 'সুস্থ হলে আবার ফিরে যেতে পারেন ইচ্ছে করলে।'

'আপনার সঙ্গে তৃণার কেমন সম্পর্ক?' সরাসরি প্রসঙ্গে এলেন কাবেরী।

'কেন?'

'ওর ব্যাপারেই কথা বলতে চাই।'

'ওয়েল, এখন পর্যন্ত আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সে নেই। এত দিন বাইরে বোহেমিয়ান জীবন কাটাচ্ছিল। কাল রাত্রে এসে সারেন্ডার করেছে। বলছে সেই ছেলেটি ওকে ডিচ্ করেছে। ওর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবে না। মিউচুয়াল ডিভোর্স করবে। ওকে আমি শেষবার সুযোগ দিয়েছি। এই বাড়িতেই আছে। কিন্তু রেস্ট্রিকশনে থাকতে হবে। সেটা না থাকতে পারলে এখানকার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।' লেডি বললেন।

'ও কি পরশু রাত্রে এখানে ছিল?'

'পরশু? না। কাল রাত্রে এসেছে।'

'পরশু মাঝরাত্রে—।'

'আমি জানি কাবেরী, তোমাকে ও ফোন করেছিল।'

'আপনাকে বলেছে ও?' কাবেরী বিস্মিত।

'হ্যাঁ। তুমি তোমার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে এত ব্যস্ত ছিলে যে ফোন ধরতে চাওনি।'

'মিথ্যে কথা। ওকে, ওকে গুলি করে মারা উচিত।'

অবাক হলেন লেডি চ্যাটার্জি। কাবেরী গড়গড় করে যা তৃণা টেলিফোনে বলেছিল তা উগরে দিল।

লেডি চুপচাপ শুনলেন, 'তোমার সঙ্গে কথা হয়নি তার?'

'না। ডক্টর মুখার্জি ফোন ধরেছিলেন। ভদ্রলোক প্রচণ্ড বৃষ্টিতে আটকে যাওয়ায় আমাদের আউট হাউসে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। লজ্জায় আমি কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না, কিছু মনে কোরো না, সেই ছেলেবেলা থেকে তোমার প্রশ্রয় পেয়ে আজ ও মাত্রাছাড়া হয়ে গেছে। ছেলেবেলায় যখন একের পর এক মিথ্যে বলে আমার কাছে ধরা পড়ে যেত তখন তুমি সেটা উপেক্ষা করতে। কারণ তোমার কাছে ও তার আগেই চলে যেত অন্য গল্প নিয়ে। তুমি সেটাই বিশ্বাস করতে কারণ আমাকে অবিশ্বাস করলে তোমার মন খুশি হত। কিন্তু এখন কিছু করা দরকার। হরপ্রীত ফোন করেছিল এত দিন পরে। কারণ তৃণা ওকে রিকোয়েস্ট করেছে যার সঙ্গে থাকে তাকে স্টেট্সে যাওয়ার জন্যে স্পনসর করতে। আমি ওর মধ্যে থাকতে চাইনি। কিন্তু এই ফোনের পর মনে হচ্ছে ওদের চলে যাওয়া উচিত।' কাবেরী বললেন।

‘কিন্তু সেই ছেলেটির সঙ্গে ওর নাকি আর সম্পর্ক নেই।’

‘আমি বিশ্বাস করি না।’

রিসিভার তুলে লেডি বললেন, ‘তৃণাকে এখানে আসতে বলো।’

রিসিভার নামিয়ে রাখতেই কাবেরী বললেন, ‘ওকে ডাকলে কেন? আমার পক্ষে ওকে সহ্য করা মুশকিল হবে।’

‘যত দিন বেঁচে থাকবে তত দিন তুমি তৃণার মা হয়েই থাকবে। এটা তো কিছুতেই মুছে ফেলতে পারবে না। নিজেকে সংযত করো।’

‘ও এত দিন কোথায় ছিল?’

‘যেটুকু জানি, একটা নিম্নবিত্ত অবাঙালি পাড়ায়।’

‘ভাবো। ওই ছেলেটার সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছ?’

‘ছেলেটি ভদ্র, নরম প্রকৃতির। পরিবারটিও রক্ষণশীল।’

‘তার মানে যা ঘটছে তা তৃণাই ঘটাচ্ছে?’

‘ও বলছে আর কখনও ওই জীবনে ফিরে যাবে না।’

দরজায় শব্দ হল, তৃণা ঢুকল। ঢুকেই কাবেরীকে দেখে হাসল, ‘কখন এলে?’

লেডি বললেন, ‘বসো।’

তৃণা বসল। লেডি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার মাকে যখন পরশু ফোন করেছিলে তখন তোমার মায়ের বয়ফ্রেন্ড কথা বলতে দেয়নি বলেছিলে। ঠিক কি না?’

‘হ্যাঁ। বলেছিলাম।’ গলার স্বর নামাল তৃণা, ‘মিথ্যে বলেছিলাম।’

‘তুমি-তুমি—!’

‘না বললে তুমি দেখা করতে না। কিন্তু সেটা তো আমার আগের জীবনের কথা।’

‘তার মানে?’

‘তুমি আমাকে শর্ত দেওয়ার পর নিজেকে বদলে ফেলেছি। তারপর থেকে কি আমি একটাও মিথ্যে বলেছি, বলো?’

‘এই জীবনের আয়ু এখনও চব্বিশ ঘণ্টা হয়নি।’

‘এই নতুন জীবনটাই আমার সব।’ কাবেরীর দিকে তাকাল তৃণা, ‘মা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি খুব অন্যায় করেছি। এর জন্যে ওই ভদ্রলোকের কাছেও ক্ষমা চাইতে পারি। আর কখনও এমন হবে না।’

‘দয়া করে আর নাটক করতে হবে না।’ কাবেরী মুখ ফেরালেন।

লেডি চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডক্টর মুখার্জি কি তোমার সঙ্গে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়লেন কাবেরী, 'কলকাতায় ওঁর জরুরি কাজ আছে।'

'কোথায় উঠেছেন?'

'সদর স্ট্রিটের লিটন হোটেল।'

'এই ভদ্রলোক একজন ডক্টর। তোমার মন্তামামার মুখে প্রশংসাও শুনেছি। তার ওপর উনি নিশ্চয়ই তোমার ওয়েলউইশার। তৃণা তাঁকে অপমান করেছে। আমি মনে করি ওর উচিত ক্ষমা চাওয়া। এটা আমাদের পরিবারের সম্মানের জন্যেই করা উচিত।' লেডি চ্যাটার্জি বললেন।

'আশ্চর্য! আপনি এখনও ওকে আমাদের পরিবারের একজন বলে ভাবছেন?'

'না চাইলেও ভাবতে হচ্ছে। ওকে শেষ সুযোগ দিয়েছি। সেটুকু অবধি অপেক্ষা তো করতেই হবে। তৃণা, তুমি স্টেটসে যেতে চাও?'

'না দিদু।'

'তুমি তোমার বাবাকে ফোন করেছিলে—!'

'সেটা তো আগের জীবনে। তখন ও ছিল।'

'সামনের সপ্তাহে আমি ইউরোপ যাচ্ছি কয়েক দিনের জন্য। স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় যে-কোনও ইউনিভার্সিটিতে তুমি পড়তে পারো। তোমার মা চাইছেন না তুমি এখানে থাকো।'

'তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না দিদু।'

লেডি চ্যাটার্জি হাসলেন, 'আমার কাছে থেকে কী লাভ হবে। যতক্ষণ না তুমি প্রমাণ করছ যে তুমি বিশ্বাসযোগ্য, শিক্ষিত, ততক্ষণ আমার সম্পত্তির এক কণাও পাবে না।'

'আমি কি এখানে থেকে সেটা প্রমাণ করতে পারি না?'

'দ্যাখো, এত কাল তোমাকে বিশ্বাস করেছি এবং তুমি তার চমৎকার সুযোগ নিয়েছ। এবার তোমার মায়ের ইচ্ছেকে সম্মান দেব আমি।'

'আমি কী বলব। তোমরা আমার গুরুজন। যা বলবে তাই মেনে নেব।'

'তোমার পাশপোর্ট কোথায়?'

'মায়ের কাছে।'

'তুমি যেতে পারো।'

তৃণা চলে গেলে কাবেরী বললেন, 'তুমি কি ওকে ইউরোপের কলেজে ভর্তি

করতে চাইছ। ওর বাবার কাছে গেলেই তো ভাল হত।'

'তাতে আরও সর্বনাশ হত। কোপেনহেগেনে অত্যন্ত ডিসিপ্লিন্‌ড এবং খুব বিখ্যাত একটি কলেজের কথা আমি জানি। ওটা রেসিডেন্সিয়াল। ওখানে যদি ও জায়গা পায় তা হলে বাধ্য হবে ভাল রেজাল্ট করে বেরুতে। কাবেরী, আমার একজন প্রকৃত উত্তরাধিকারী তৈরি করার জন্যে এটাই শেষ চেষ্টা ধরে নিতে পারো।'

'দ্যাখো।' কাবেরী উঠে দাঁড়ালেন।

'তুমি কি কিছুদিন এখানে থাকছ?'

'না। আজকালের মধ্যে ফিরে যাব।'

'তোমার মন্তামামার সঙ্গে দেখা কোরো।'

'করব।'

'আর একটা কথা। যদিও তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তোমার কি মনে হয় এত দিন বাদে ঠিকঠাক বন্ধু খুঁজে পেয়েছ?'

'আমি মনে করলেও তিনি করছেন কি না জানা নেই।'

'ও। আমি কি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করব।' ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কাবেরী। খুব ইচ্ছে করছিল লেডি চ্যাটার্জির মুখের ওপর না বলতে। অনেক দিনের ইচ্ছে। আজও বলতে পারলেন না।

ডক্টর চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি লিটন হোটেলে বিকেল চারটের সময় থাকবেন। লেডি চ্যাটার্জির পি এ তৃণাকে জানিয়ে দিয়েছিল, পৌনে চারটের সময় গাড়ি তৈরি থাকবে। মায়ের বয়ফ্রেন্ড মানে একটা শুড্ডা লোক। তবে পাহাড়ের লোকরা একটু শক্ত হয়। তৃণা যখন গাড়িতে উঠে বসল তখন তার কাঁধে একটা ব্যাগ, পরনে সালোয়ার কামিজ। গাড়িতে উঠেই সে যুবক ড্রাইভারকে বলল, 'বাঃ, আপনাকে ঠিক আমির খানের মতো দেখতে।'

লোকটি হকচকিয়ে গেল, 'কী যে বলেন ম্যাডাম।'

তৃণা বুঝল এখন থেকে লোকটি তার সব কথা শুনবে।

লিটন হোটেলে ঢুকে রিসেপশনে জিজ্ঞাসা করে জানল ডক্টর মুখার্জি তাঁর ঘরেই আছেন। সে লেডিস টয়লেটে গিয়ে পোশাক পালটে নিল। এখন তার পরনে মিনি স্কার্ট। উরু সন্ধির দুই ইঞ্চি নীচে এসে থেমে গেছে স্কার্টের প্রান্ত।

একশো তিন নম্বর ঘরের দরজায় নক করল সে।

'কাম ইন প্লিজ।' ভেতর থেকে পরিশীলিত গলা ভেসে এল।

দরজা ঠেলল তৃণা। একজন সুদর্শন মধ্যবয়সী পুরুষ সোফায় বসে আছেন। তৃণা জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি ডক্টর মুখার্জির—!'

'ইয়েস।'

'আমি তৃণা।'

'ও! এসো। বসো।'

সোফায় বসল তৃণা। বসামাত্র তার শরীরের হাঁটুর ওপরের অনেকটা অংশ স্কার্টের আড়ালে থাকতে পারল না। চট করে সেখান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে চন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমার মা ফোন করেছিলেন। আমি বলেছিলাম এত সামান্য কারণে তোমার আসার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমার দিদিমা নাকি ইনসিস্ট করেছেন।'

'দিদু তো বলেইছে, আমিও ফিল করেছি।'

হাসলেন চন্দ্রনাথ, 'বাঃ। খুব ভাল।'

'আমার মাথায় যে মাঝে মাঝে কী হয় নিজেই বুঝতে পারি না।' তৃণা বলল।

'তুমি প্রেসিডেন্সিতে পড়ো?'

'হ্যাঁ। পায়ের ওপর পা তুলে বসতেই স্কার্টে টান লাগল, 'আমি আপনার কাছে ফ্রম হার্ট ক্ষমা চাইছি।'

'দূর! ক্ষমা চাইবে কেন? তুমি যে রিয়েলাইজ করেছ দ্যাটস এনাফ।' কথা বলতে বলতে শক্ত হয়ে গেলেন চন্দ্রনাথ। তাঁর মনে হল এই মেয়েটি বোধ হয় স্কার্টের নীচে কিছু পরেনি। তিনি বললেন, 'তুমি খুব বাচ্চা মেয়ে। এবং সুন্দর।'

'আমি সুন্দর?' হেসে ফেলল তৃণা।

'কেন? এ কথা আগে শোননি!'

'কেউ সুন্দর হলে সবাই তার দিকে তাকায়। আপনি তো সমানে অন্য দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন। বলুন, বলছেন না?' বলতে বলতে সে লক্ষ করল ডক্টরের মুখ লাল হচ্ছে।

'না না। ঠিক আছে তৃণা। আমি এখন একটু বের হব।' চন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। অতএব তৃণাকেও উঠতে হল। চন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি খুব ভাল।'

'তাই?'

'বাই!'

লেডিস টয়লেটে আবার পোশাক বদলে নিল সে। তারপর বাইরে এসে গাড়িতে উঠে বলল, 'এই যে আমির খান, আমার না একটু ঘুরতে ইচ্ছে করছে।'

'বলুন কোথায় যাবেন?'

'না বাবা। দিদু জানলে খুব রাগ করবে।'

'আধঘণ্টা বেড়ালে কোনও অসুবিধে হবে না।'

'তাই? তা হলে চলো। আমার এক গরিব বান্ধবীকে দেখে আসি। আমার সঙ্গে পড়ে।' যে এলাকাটার নাম বলল তৃণা তা ড্রাইভারের কাছে অদ্ভুত শোনাল। লেডি চ্যাটার্জির নাতনি ওই এলাকায় যাচ্ছেন এ কথা সে আগে শুনলে বিশ্বাস করত না।

দীপ আর একটি ছেলের সঙ্গে আড্ডা মারছিল তাদের ঘরে, তৃণাকে দেখে অবাক হল, 'কীরে, আজই চলে এলি?'

'চান্স পেলাম।'

'এর নাম সেলিম। খুব ভাল ছেলে। ও বলছে একসঙ্গে বিশ কেজি কিনতে চাইলে লোকে সন্দেহ করবে, পুলিশের কাছে খবর চলে যাবে।' দীপ বলল।

'তা হলে?' তৃণা সেলিমের দিকে তাকাল।

সেলিম বলল, 'দু কেজি চাইলেই ওটা খবর হয়ে যাবে। কলকাতায় সাত আটজন মেন সাপ্লায়ার আছে। তারা ভাববে তাদের বাইপাশ করে মাল এক্সপোর্ট হচ্ছে।'

'ওরা কোত্থেকে মাল পায়?' তৃণা জিজ্ঞাসা করল।

'নেপাল থেকে ইউ পি হয়ে আসে।'

'সেখানে যাওয়া যায় না?'

'মাল পাবেন না। ভাববে পুলিশের লোক। তবে ডেইলি পাঁচশো গ্রাম করে নিতে পারেন। সন্দেহ হলেও কিছু বলবে না। বলতে হবে হোস্টেলে সাপ্লাই হবে।'

তৃণা তাকাল দীপের দিকে, 'তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।'

সেলিম উঠে দাঁড়াল, 'দোস্ত, সামনের চায়ের দোকানে আছি।'

ছেলেটা চলে গেলে তৃণা জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে বলিসনি তো কোথায় মালটা যাবে। চট করে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।'

'দূর। কেন বলব?'

'শোন। সামনের সপ্তাহে দিদু ইউরোপে যাবে। তার আগে ওটা দরকার?'

'আর একবার ভেবে দ্যাখ তৃণা, ধরা পড়লে—।'

'তুই ভেবে দ্যাখ, আমার সঙ্গে থাকবি কি না?'

'কী বলছিস তুই?' চমকে ওঠে দীপ।

'তোর মধ্যবিত্ত মন যদি ভয় পায় তা হলে সরে দাঁড়াতে পারিস।'

'আর কী বলবি বল?'

ব্যাগ থেকে চেক বই বের করে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক লিখে সই করল তৃণা, 'টাকাটা তুলবি মাল কেনার জন্যে। আমি রোজ কলেজে যাব। চাইলেই চেক পাবি। তবে কলেজে আমাকে এড়িয়ে থাকবি।'

চেক নিল দীপ, 'মাল পেলে কোথায় রাখব?'

'এই ঘরের টয়লেটে। ভাল করে প্ল্যাস্টিক প্যাক করবি। আর ওর কাছে জেনে নিবি কুড়ি কেজির জন্যে কত দিতে হবে।'

'আমি তোকে খুব মিস করছি তৃণা। দীপ বলল।

'আমিও।' বলে দরজা বন্ধ করে এল তৃণা। তারপর পোশাক খুলতে খুলতে বলল, 'তাড়াতাড়ি, টাইম বেশি নেই। আধঘণ্টা হয়ে এল।'

ডক্টর চন্দ্রনাথ মুখার্জির সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল লেডি কণিকা চ্যাটার্জির। ভদ্রলোককে বেশ মার্জিত, ভদ্র, শিক্ষিত বলেই মনে হল তাঁর।

বললেন, 'আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। যে মেয়ে তার সারাজীবনে যার সঙ্গে প্রেম করেছিল তাকেই বিয়ে করেছে, অন্য পুরুষের ছায়া মাড়ায়নি, সে কী করে আপনাকে রাত্রে বাংলোয় থাকতে দিয়েছে এটা বুঝতে পারিনি।'

'আসলে সেই দিন হঠাৎই ওয়েদার এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে উনি আশ্রয় না দিলে গাড়িতে বসে থাকতে হত।'

কাবেরী চমকে উঠলেন, 'গাড়িতে? গাড়িতে তো বাজ পড়েছিল।'

চন্দ্রনাথ হাসলেন।

'আপনারা কালই চলে যাচ্ছেন?' লেডি চ্যাটার্জি জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ।' চন্দ্রনাথ মাথা নাড়লেন, 'আমি যাচ্ছি। উনি—।'

'আমি আর এখানে থেকে কী করব। ওখানে থেকে এমন হয়েছে যে কলকাতায় ভিড় দেখলেই বুকে হাঁফ ধরে।' কাবেরী বললেন।

'আমি সামনের শনিবারে ইউরোপ যাচ্ছি। শরীরের যা অবস্থা তাতে না যাওয়াই ভাল ছিল। কিন্তু এটাকেই শেষ ট্যুর হিসেবে নিতে হবে।'

'আপনি নিশ্চয়ই হেলথ-চেক্ করিয়ে নিয়েছেন।' চন্দ্রনাথ বললেন।

'সে তো লেগেই আছে। আমার ডাক্তারকে বললাম, চলো আমার সঙ্গে কিন্তু তাঁর এখানে এত কমিটমেন্ট যে যেতে পারছে না।' লেডি চ্যাটার্জি বললেন।

'আপনার কত দিনের ট্যুর?'

'কয়েক দিন মাত্র।'

'কোথায় কোথায় যাচ্ছেন?'

'স্টকহোম, অসলো, কোপেনহেগেন।'

'স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো সবসময় আমাকে আকর্ষণ করে।' চন্দ্রনাথ বললেন।

কাবেরী বললেন, 'তা হলে মায়ের সঙ্গে ঘুরে আসুন না। সঙ্গে ডাক্তার থাকলে মাও নিশ্চিন্ত হতে পারেন।'

'শনিবার দেরি আছে। দেখা যাক।' চন্দ্রনাথ বললেন।

'আমি ঠিক করেছি তৃণাকেও নিয়ে যাব। আপনি সঙ্গে থাকলে ভালই হবে। কাবেরী, তুমিও চলো। অনেক দিন কোথাও যাওনি। এই ট্যুরটা স্যার অমলেশের ফ্যামিলির প্রথম এবং শেষ ভ্রমণ হোক।' হাসলেন লেডি কণিকা চ্যাটার্জি।

'তৃণার সঙ্গে—' কাবেরী মাথা নাড়লেন।

'ওঃ। আমরা প্রথমে কোপেনহেগেনে যাব। ওকে কলেজে ভর্তি করে আমি কাজগুলো করব। দিনের বেলায় আমি যখন ব্যস্ত থাকব তখন তোমরা ঘুরতে পারবে। হ্যাঁ, ডক্টর, তৃণা আজ বিকেলে আপনার কাছে গিয়েছিল। ওকে কেমন লাগল?'

ইতস্তত করলেন চন্দ্রনাথ, 'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'সেকী? ক্ষমা চায়নি ও?'

'হ্যাঁ। তা চেয়েছে কিন্তু সরি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওর পোশাক আমার ভাল লাগেনি। আবার এমন হতে পারে আমি হয়তো ঠিক বুঝিনি। যাই হোক, আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি খুব খুশি হয়েছি। ফিরে গিয়েই সব দেখে নিয়ে আপনাকে জানাব।'

'ওঁরা বেরিয়ে যাওয়ার পর লেডি চ্যাটার্জি তাঁর বৃদ্ধ পরিচারককে ডেকে বললেন, 'তৃণার ওখানে যে মহিলা দেখাশোনা করে তাকে জিজ্ঞাসা করে এসো আজ বিকেলে তৃণা কী পোশাক পরে বেরিয়েছিল?'

কম্প্যুটারের দিকে তাকিয়ে তৃণার মনে হল অর্ধেকটা পাহাড় মাথার ওপর থেকে নেমে গেল। নিক জানিয়েছে প্রথমবার পাঁচ কেজির বেশি শরীর থেকে কমানোর দরকার নেই। পাঁচ কেজি কীরকম রিঅ্যাকশন তৈরি করে তা দেখে ভবিষ্যতে কী করা হবে তা সে জানাবে। নিজের টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে নিক। ও জানতে চাইছে কীভাবে শরীর থেকে ওজন কমাবে।

মানে বুঝতে অসুবিধে হল না। কুড়ির জায়গায় পাঁচ কেজি জোগাড় করতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না। ইতিমধ্যে দীপের মাধ্যমে সে দু' কেজি বাড়িতে এনে রেখেছে। শরীর থেকে ওজন কমানোর পদ্ধতি হল, কীভাবে মালটা ওখানে পৌঁছাবে তা জানতে চাইছে নিক। কুড়ির বদলে পাঁচ হওয়ায় লাভের টাকা কমে যাচ্ছে বটে কিন্তু এটাও তো ঠিক জিনিসটার মান যাচাই না করে ওরাই বা নেবে কেন? লাভ কম হোক, কিন্তু ভবিষ্যতের দরজা তো খুলে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে কলেজ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট চেয়ে নিতে বলেছেন লেডি চ্যাটার্জি। সেটা ইচ্ছে করেই দেরি করছে তৃণা। ওটা নিয়ে নিলে দীপের সঙ্গে আর দেখা হবে না। দীপকে সে এখনই বলেনি তাকে কোপেনহেগেনের কলেজে গিয়ে পড়তে হবে। শুনলে খুব কষ্ট পাবে, ভেঙে পড়বে। বলেছে দিদু তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যেতে চাইছেন। আর এই সুযোগটাকে কাজে লাগাবে সে।

পাঁচ কেজি গাঁজা কিনতেই সঞ্চয় তলানিতে পৌঁছে গেল। কিন্তু এখনও নিক তাকে জানায়নি কী দামে কিনবে। টেনশন হচ্ছিল খুব। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সে ই-মেল করল, 'পাঁচ কেজি ওজন কমাতে তোমাদের দেশে কত খরচ হয়?'

নিক জবাব দিল, 'এটা নির্ভর করে কোত্থেকে তুমি করাচ্ছ তার ওপর। ধরে নাও, ইন্ডিয়ান টাকায় দশ-এর কাছাকাছি। এ নিয়ে চিন্তা কোরো না।'

মন্দ না। মনে মনে ভাবল তৃণা। তারপর কম্প্যুটার থেকে সব কটা মেল মুছে দিল সে। প্রমাণ রাখা ঠিক নয়।

শুক্রবারে এই বাড়িতে কাবেরীকে দেখে সে অবাক হল। কাবেরীও যে সঙ্গে যাচ্ছেন সে জানত না। জানা মাত্র মনে অস্বস্তি এল। তারপর শুনতে পেল দলে ডক্টর চন্দ্রনাথ মুখার্জিও আছেন। খুব খেপে গেল সে। ওরা নিশ্চয়ই বিয়ের আগে হনিমুন করতে ইউরোপে যাচ্ছে। যদি ওই দায়িত্বটা না থাকত তা হলে ওদের যাওয়া বন্ধ করতে অনেক কিছু করতে পারত সে, কিন্তু তৃণা নিজেকে

সংযত করল। না। তাকে ভাল মেয়ে হয়ে থাকতে হবে এখন।

গতকালই দীপের সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে। দীপের ওই এক কথা, খুব ভয় করছে তার। তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে তৃণা। লেডি চ্যাটার্জির লাগেজে থাকলে ভয়ের কিছু নেই।

যাওয়ার আগের রাত্রে ফোনটা এল। তখন লেডি চ্যাটার্জির ঘরে বসে ছিল সবাই। যাওয়ার ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে লেডি বললেন, 'ডক্টর মুখার্জি, আপনি এত দিন বিদেশে ছিলেন কিন্তু মনে মনে এখনও প্রাচীন হয়ে আছেন।'

'কী রকম?'

'তৃণা এর আগের বার আপনার হোটেলে গিয়েছিল সালোয়ার কামিজ পরে, সেটা আপনার পছন্দ হয়নি।'

চমকে তৃণার দিকে তাকিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। তৃণা নিরীহ মুখ করে বসে আছে। চন্দ্রনাথ বললেন, 'ওই পোশাকটাকে সালোয়ার কামিজ বলে?'

'হ্যাঁ। আমার বেয়ারা, গাড়ির ড্রাইভার পোশাকটার নাম জানে।'

লেডির কথা শেষ হওয়ামাত্র ফোনটা বাজল। লেডি রিসিভার তুলে শোনার পর বললেন, 'দাও।' তারপর ওপাশ থেকে সাড়া পেয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার মিস্টার সরকার? আমি খুব ব্যস্ত, কাল বিদেশে যাচ্ছি।' একটু শুনলেন, 'কী যা তা বলছেন? আমি বম্বে থেকে কোনও হিরের নেকলেস কয়েক বছরের মধ্যে কিনিনি যে তার কাগজ রাখব। আমাকে বিরক্ত করবেন না।' টেলিফোন রেখে দিলেন লেডি চ্যাটার্জি।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তৃণার। মনে হচ্ছিল মরে যাবে। লোকটা কথার খেলাপ করেছে। লেডিকে কিছু জানানো হবে না বলে ঠিক হয়েছিল। লেডি চ্যাটার্জি রিসিভার নামিয়ে রাখলেও বুকের আওয়াজটা কমছিল না।

'তোর কী হয়েছে?' তীক্ষ্ণ গলায় কাবেরী জিজ্ঞাসা করলেন।

'কই, কী হবে? কিছু হয়নি তো!'

'স্পষ্ট দেখতে পেলাম তোর মুখের চেহারা বদলে গেল। এখনও নর্মাল হয়নি।'

'কী যে বলছ!' মুখ অন্য দিকে ফেরাল তৃণা।

'ওর কিছু হওয়ার ঘটনা তো এখানে ঘটেনি!' লেডি চ্যাটার্জি বললেন।

'দ্যাখো না দিদু, মা অদ্ভুত।'

'টেলিফোনটা আসার পরই তোর চেহারা বদলে গেল।'

লেডি চ্যাটার্জি নাতনির দিকে তাকালেন, 'না না। ওর তো আইডিয়াই নেই কে আমাকে ফোন করেছে। আচ্ছা, এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমরা প্রথমে যাব কোপেনহেগেনে। সেখানে কথা বলেছি, তৃণাকে কলেজে ভর্তি করে দিয়ে আমি আর কাপুর যাব স্টকহোমে। তোমরা ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে আসতে পারো, অথবা ডেনমার্ক ঘুরে দেখতে পারো।'

চন্দ্রনাথ বললেন, 'আমরা আপনার সঙ্গেই যাব। তবে কাবেরী বলছিলেন উনি ওয়াই ক্লাশে যেতে চান। বেশি খরচ করার পক্ষপাতী উনি নন।'

লেডি চ্যাটার্জি মেয়ের দিকে তাকালেন, 'দিস টাইম ইউ আর ট্রাভেলিং উইথ মি। স্যার অমলেশ চ্যাটার্জি এবং লেডি চ্যাটার্জির মেয়ে ফার্স্ট ক্লাসেই ট্রাভেল করবে। এবং এবার তোমরা আমার গেস্ট।'

তৃণা বলল, 'দিদু, একটা কথা বলব?'

'ইয়েস!'

'প্রথমেই স্টকহোমে গেলে অসুবিধে হবে? আমি তোমার সঙ্গে বিদেশে কখনও যাইনি। ওখানে ক'দিন থেকে না হয় কোপেনহেগেনে গিয়ে কলেজে ভর্তি হব।'

চন্দ্রনাথ বললেন, 'আমার মনে হয় এটুকু আপনি কনসিডার করতে পারেন।'

তৃণা ওঁর দিকে তাকিয়ে হাসল, 'থ্যাঙ্কু!'

'ঠিক আছে। তাই হোক। কাপুর, তুমি টিকিটটা ওইভাবে চেঞ্জ করে নাও।'

কাপুর মাথা নাড়লেন। মিটিং শেষ হয়ে গেল।

ঘরের দরজা বন্ধ করে ইন্টারনেট খুলল তৃণা। দুটো মেল এসেছে। প্রথমটা নিকের। 'কোপেনহেগেনের বদলে স্টকহোমের হেলথ সেন্টারে কি আসতে পারবে? কোপেনহেগেনের হেলথ সেন্টার নিয়ে অনেক ঝামেলার কথা শোনা যাচ্ছে। জানাও।'

আনন্দের সঙ্গে তৃণা জানিয়ে দিল, রবিবার দুপুরে সে স্টকহোমে পৌঁছে ফোন করবে। দ্বিতীয় মেলটি দীপের। মেল খুলে সে হতবাক। বোকার মতো খোলাখুলি লিখেছে দীপ। 'আন্ডারওয়ার্ল্ডের কেউ কেউ জেনে গেছে আমরা জিনিসটা কিনেছি। ভয়ে আমি নতুন ঘর ছেড়েছি। তুই আমাকে তোর অ্যাকাউন্টের টাকার একটা অংশ না দিলে বিপদে পড়ব। কাল রাত্রে এয়ারপোর্টে যাব। তখন যেমন করে হোক বিশ ত্রিশ হাজারের একটা বেয়ারার

চেক আমাকে দিবি। তুই ফিরে না আসা পর্যন্ত গা ঢাকা দিতে টাকাটার প্রয়োজন হবে। ফ্লাইটের সময় জানাও।'

সর্বনাশ। মনে মনে শব্দটা উচ্চারণ করল তৃণা। হ্যাঁ, এটা ঠিক দীপের হাতে বেশি টাকা নেই। তাই বলে ও যদি এয়ারপোর্টে আসে তা হলে তো বিপদে পড়ে যেতে হবে। কিন্তু ও এখন কোথায় আছে জানায়নি। কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছিল না সে। আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোকজন কি খবর পেয়েছে? ওরা কি দীপের খোঁজে নতুন ঘরে গিয়েছিল?

দ্রুত দীপের পাঠানো মেল মুছে দিল তৃণা।

দু'দুটো স্যুটকেসে যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে। তাকে থাকতে হবে কোপেনহেগেনের একটা বোর্ডিং হাউসে। যারা কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার জন্যে বিখ্যাত বা কুখ্যাত। হাসল তৃণা। দিদু স্বপ্ন দেখছে। স্টকহোম থেকেই হাওয়া হয়ে যাবে সে। নিক যা ডলার দেবে তাতে আমেরিকান পাসপোর্টে কোথাও যেতে অসুবিধে হবে না।

দুটো স্যুটকেস সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে, কাপুর আঙ্কল বলেছেন। জামাকাপড়, শীতবস্ত্র প্যাক করতেই সেগুলোর পেট মোটা হয়ে গেল। টয়লেট থেকে প্ল্যাস্টিক মোড়া প্যাকেট পাঁচটা বের করল তৃণা। খুব ইচ্ছে করছিল একটা প্যাকেট খুলে টেস্ট করতে। কিন্তু নিজেকে সামলাল সে। প্রথমে ভেবেছিল প্যাকেটগুলো স্যুটকেসের তলায় ভরে নেবে। কিন্তু তাতে ওজন আরও বাড়বে। স্যুটকেস তো চেক ইন করার সময় হাতছাড়া হয়ে যাবে। এয়ারলাইন্স ট্যাগ লাগিয়ে প্লেনের পেটে পাঠিয়ে দেবে। ডেলিভারি পাওয়া যাবে একেবারে স্টকহোম এয়ারপোর্টে গিয়ে। এর মধ্যে যদি কোথাও পরীক্ষা-টরীক্ষা করে তা হলে সে জানতেও পারবে না। আবার হ্যান্ডব্যাগে যদি নেয় তা হলে সিকিউরিটি চেকিং-এর সময় এক্সরে করবে ব্যাগ। সন্দেহ হলেই খুলতে হবে। একমাত্র রাস্তা হচ্ছে লেডি চ্যাটার্জির লাগেজের সঙ্গে এটাকে পাঠানো। এর আগে উনি যত বার বাইরে গিয়েছেন ভি আই পি ট্রিটমেন্ট পেয়েছেন। তাঁর লাগেজের ওপর ভি আই পি স্ট্যাম্প মারা থাকে। কিন্তু লেডির লাগেজে সে কী করে এগুলো পাচার করবে?

বড় কার্বন পেপারে একটা একটা করে প্যাকেটগুলো মুড়ল তৃণা। তারপর কার্বনের ওপর হালকা বিস্কুট পর পর এমন ভাবে সাজিয়ে আবার পাতলা সেলফিনে প্যাক করে ফেলল। এখন এক্সরে করলে ওরা শুধু বিস্কুট দেখতে পাবে। গন্ধশোঁকা কুকুর নাক ঠেকালে বিস্কুটের গন্ধ পাবে।

হাসল তৃণা। যদি লেডি চ্যাটার্জির লাগেজ না পাওয়া যায় তা হলে দুটো রাস্তার কথা সে ভেবে রেখেছে। এক, তার জ্যাকেটের ভেতরে সেলাই করে প্যাকেটগুলো বেঁধে নেবে। এতে ওজনটা একটু বেশি বইতে হবে। নিশ্চয়ই কোনও মহিলাকে ওরা জ্যাকেট খুলতে বলবে না। দুই, ক্লাস টেনের রেজাল্ট ভাল হওয়ায় লেডি চ্যাটার্জি তাকে একটা বড় হ্যান্ডিক্যাম দিয়েছিলেন। ওই মডেলটা এখন বাতিল হয়ে গেছে। এখন অনেক হালকা, ছোট কিন্তু শক্তিশালী ক্যামেরা বেরিয়ে গেছে। কিন্তু ওই হ্যান্ডিক্যামের ভেতর থেকে মালপত্র বের করে পাঁচটা প্যাকেট স্বচ্ছন্দে ভরে নেওয়া যায়। শুধু কথায় কথায় তাকে ছবি তোলার ভান করে যেতে হবে।

হ্যাঁ, এবার দীপকে নিয়ে একটা কিছু ভাবতে হবে। ও যদি এয়ারপোর্টে এসে চেক চায় তা হলে ওর মতো মূর্খ কেউ নেই। সঙ্গে সঙ্গে কাবেরী চ্যাটার্জির চোখ কপালে উঠবে। লেডি চ্যাটার্জিকে তিনি জানিয়ে দেবেন যে তৃণা মিথ্যে বলেছে। দীপের সঙ্গে এখনও ওর সম্পর্ক আছে। নইলে সি-অফ্ করতে এয়ারপোর্টে আসবে কেন? অবশ্য একবার ইন্টারন্যাশন্যাল প্যাসেঞ্জার এনক্লোজারে ঢুকে গেলে দীপ তাকে বিরক্ত করতে পারবে না। আজ তৃণার মনে হল, দীপ খুব ছেলেমানুষ। একেবারে ম্যাচিওরিটি নেই। তা ছাড়া খুব ভিতু। এ রকম ছেলের সঙ্গে বেশি দিন থাকলে ওকে বহন করে যেতে হবে, দীপ থাক কলকাতায়। ভাল ছেলের মতো বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যাক। পড়াশুনা শেষ করে চাকরি করুক, ইচ্ছে করলে বিয়েও করতে পারে। সে কিছু মনে করবে না। তবে হ্যাঁ, দীপের কাছে সে প্রথম শরীরের স্বাদ পেয়েছে। ওই মুহূর্তগুলো কোনও দিন ভুলতে পারবে না সে।

সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন কাপুর। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে সিট ছিল। কিন্তু ওই ফ্লাইট ছাড়ে ভোরবেলায়। মাঝরাত্রে ঘুম থেকে উঠে তিনটের মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হয় বলে লেডির পক্ষে এই বয়সে খুবই কষ্টকর। ঠিক ছিল সন্ধেবেলায় ডোমেস্টিক ফ্লাইট ধরে দিল্লি গিয়ে সরাসরি চলে যাবেন কোপেনহেগেন। গন্তব্যস্থল পালটে যাওয়ায় জর্ডন এয়ারলাইন্সই পছন্দসই হল। কলকাতা থেকে আম্মান, আম্মান থেকে স্টকহোম। বেশি সময়ও লাগবে না।

ফলে সর্বত্র টেলিফোন এবং মেল করে জানাতে হল। লেডি কণিকা চ্যাটার্জি বিদেশে জর্ডন এয়ারলাইন্সের বিমানে যাচ্ছেন তা এয়ারপোর্টকেও জানিয়ে দিলেন তিনি। কোপেনহেগেন কলেজের প্রিন্সিপাল একটু বিরক্ত

হলেন যখন শুনলেন স্টকহোম থেকে তৃণার পৌঁছবার তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে। তিনি তৃণাকে কলেজে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাবার আদেশ ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছিলেন।

বিকেলবেলায় কাপুরের মনে হল, এবারের বিদেশযাত্রায় তিনি একটুও আকর্ষণ বোধ করছেন না। বয়স তাঁকে যে ক্লান্ত করছে সেটা ভাল বুঝতে পারছেন। এই শেষবার। লর্ড অমলেশ চ্যাটার্জির প্রতি শ্রদ্ধাবশত এতকাল লেডিকে তিনি বিশ্বস্ততা দিয়ে এসেছেন। চাকরি ছেড়ে দেবেন যেমন ভেবেছেন, লেডি তাঁকে ছাড়িয়েও দিয়েছেন। কিন্তু দু'জনের কেউ সেটাকে ধরে রাখতে পারেননি। কাপুর জানেন, এই বৃদ্ধা যত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হন না কেন, ভেতরে ভেতরে বেশ অসহায়। বয়স যত বাড়ছে তত এটা বোঝা যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে তৈরি হবেন বলে যখন উঠতে যাবেন তখন টেলিফোন বাজল।

'মিস্টার কাপুর!'

'ইয়েস।'

'আমি কলকাতা পুলিশের একজন অফিসার।'

'ডেজিগনেশন এবং নাম বলুন, প্লিজ!'

ভদ্রলোক সেটা জানালেন। জানিয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার আগেও দেখা হয়েছে।'

'হ্যাঁ। মনে পড়ছে। বলুন, কী করতে পারি?'

'লেডি চ্যাটার্জি কি বিদেশে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কত দিনের ট্যুর?'

'দিন সাতেক।'

'তা হলে সাতদিন অপেক্ষা করতে পারি।'

'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'একটা হিরের নেকলেস নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যে জুয়েলার বেআইনি ভাবে বিক্রি করেছে সে ক্লেম করছে ওটা নাকি লেডি চ্যাটার্জির। তিনি বম্বে থেকে কিনেছিলেন। আমরা লেডিকে জিনিসটা দেখিয়ে কনফার্ম করতে চাই।'

'লেডির নেকলেস সেই জুয়েলার কী করে পেলেন?'

'লেডি যাকে গিফট করেছিলেন সে বিক্রি করেছে জুয়েলারের কাছে। অবশ্যই খুব কম দামে কারণ ওর কাছে পেপার ছিল না। লেডির কাছেই নাকি পেপার থেকে গেছে।'

'হু ইজ হি?'

'হি নয়। শি। লেডির নাতনি।'

'মাই গড!'

'আমরা আজই চ্যাটার্জি হাউসে গিয়ে মেয়েটিকে জেরা করে জানতে চাইতাম জুয়েলার সত্যি বলছে কি না। কিন্তু লেডির স্ট্যাটাস, বয়স, বিদেশযাত্রার কথা ভেবে সেটা আজই না করে সাতদিন অপেক্ষা করব। আপনি লেডিকে একসময় জানিয়ে দেবেন।'

অফিসার ফোন ছেড়ে দেওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন কাপুর। লেডি চ্যাটার্জির কেনা নেকলেস তৃণা বিক্রি করে দিয়েছে কম টাকায়? লেডি ওকে গিফ্‌ট দিয়েছিলেন যেটা সেটাকে মেয়েটা বিক্রি করে দিতে পারল? তাঁর মনে পড়ল গত সন্ধেবেলায় লেডির সঙ্গে মিটিং-এর সময় এ রকম একটা ফোন এসেছিল। সেটা শুনেই তৃণার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল। সেটা কাবেরীও বলেছিলেন। লেডি তা গ্রাহ্য করেননি। বলেছিলেন যে ফোন করেছিল তার সম্পর্কে তৃণার কোনও আইডিয়াই নেই। কিন্তু লেডি স্পষ্ট বলেছিলেন লোকটাকে, যে তিনি বম্বে থেকে কোনও হিরের নেকলেস কয়েক বছরের মধ্যে কেনেননি। তাই যদি হয় এর পেছনে অন্য গল্প আছে। লেডিকে ব্যাপারটা জানাতে টেলিফোন তুললেন। ডায়াল করলেন। লেডি এখন চ্যাটার্জি হাউসে। সম্ভবত যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। অপারেটার লাইন দিল। ওপাশে যে হ্যালো বলল তার গলা শুনে কাপুর অবাক।

'কে? কাপুর আঙ্কল? দিদু এখন বাথরুমে। কিছু বলতে হবে?' তৃণা জিজ্ঞাসা করল।

উত্তর না দিয়ে কাপুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এখন ওখানে?'

'দিদুর কাছে এসেছি। ওঁর তো বয়স হয়েছে, যদি কোনও দরকার লাগে!' তৃণা বলল।

'ঠিক আছে।'

'কিছু বলবে?'

'না। ওকে!' ফোন কেটে দিলেন কাপুর।

ব্যাপারটা এত সহজে হয়ে যাবে ভাবেনি তৃণা। বিকেলে বাড়ি ফিরে তৃণাকে ডাকিয়ে ঘরে এনে অনেক উপদেশ দিয়েছেন লেডি চ্যাটার্জি। সে যেন মন দিয়ে পড়াশুনা করে। স্যার অমলেশের কথা না ভুলে যায়। আজ অবধি

যেসব ভুল করেছে তা যেন ভুলে যায়। মাথা নিচু করে সব শুনে কথা দিয়েছে তৃণা, আর সে ভুল করবে না। লেডি চ্যাটার্জি খুশি হয়েছিলেন। তৃণা লক্ষ করেছিল লেডির স্যুটকেস প্যাক করা হয়ে গেছে। শুধু ওঁর হান্ডব্যাগ বাইরে রয়েছে।

'ওমা, তোমার হ্যান্ডব্যাগে জায়গা আছে?'

'কেন?'

'আমার এক ফোঁটাও জায়গা নেই। ভাবছিলাম তোমার দেওয়া হ্যান্ডিকামটা নিয়ে যাব। ছবি তুলব। তোমার হ্যান্ডব্যাগে ওটা দিয়ে দেব?'

'দুর। ওটা পুরনো হয়ে গেছে। তেমন ইচ্ছে হলে ডিউটি ফ্রি থেকে নতুন কিনে নিস।' লেডি হাসলেন।

'না না। পুরনো হোক, খুব ভাল ছবি ওঠে। ওটার ওপর মায়া পড়ে গেছে আমার। ওটাকে অপারেট করতে ভাল লাগে আমার।'

'ঠিক আছে। দিয়ে দিস। কিন্তু ওটা বেশ ভারী। এই ব্যাগ আমি বইব কী করে?'

'তোমাকে বইতে হবে না। আমি কী জন্যে আছি।'

তৃণা ঠিক করল ঠিক বেরুনোর মুখে ক্যামেরাটা লেডির ব্যাগে ঢুকিয়ে দেবে। নইলে বুড়ি যদি আবার চালিয়ে দেখতে চায়।

লেডি টয়লেটে গেলে সে নিজের ঘরের দিকে যখন যাচ্ছিল তখনই কাপুরের ফোন এল। কথা বলে রিসিভার রাখার সময় মনে খটকা লাগল। কাপুর আঙ্কলের গলার স্বর তার একদম ভাল লাগছিল না। এই বুড়োটা যেন সবসময় সন্দেহ ছাড়া আর কিছু করতে জানে না। কাবেরী চ্যাটার্জির ওপর বুড়োর বেশি আস্থা। যাক গে, আর ক'দিন, তারপর তো বুড়োটার মুখ দেখতে হবে না।

ঠিক বেরুবার আগে ক্যামেরাটা লেডির হ্যান্ডব্যাগে তোয়ালে জড়িয়ে ঢুকিয়ে দিল তৃণা। দিয়ে ওর ওপর লেডির টুকিটাকি জিনিস চাপিয়ে দিল। লেডি দেখছিলেন।

ব্যাগটা তুলে বললেন, 'উঃ, কী ভারী।'

কাবেরী এগিয়ে এলেন, 'আমি নিচ্ছি।'

লেডি বললেন, 'তুমি এখন কেন বইবে। ওরা আছে কী জন্যে!'

পরিচারকরা লাগেজগুলো নিয়ে নীচে চলল।

নেতাজি সুভাষ বসু বিমানবন্দরের বহির্গমন বিল্ডিং-এর সামনে বেশ ভিড়। আজ কোনও কারণে সি-অফ্ করতে আসা মানুষদের কাছে ভেতরের লাউঞ্জে ঢোকার টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে না। শুধু যাঁদের বিদেশে যাওয়ার বিমান টিকিট আছে তাঁদের ভেতরে যেতে দেওয়া হচ্ছে। চন্দ্রনাথ এবং কাবেরী ট্রলি নিয়ে এলেন। এইসময় বুকে প্ল্যাস্টিকের ব্যাচ লাগানো এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে লেডি চ্যাটার্জিকে নমস্কার জানালেন, 'আসুন ম্যাডাম!'

'আপনি?'

'আমি জর্ডন এয়ারলাইন্সে আছি। আপনি আমাদের প্লেন ব্যবহার করছেন বলে আমরা খুব খুশি। আসুন।'

তৃণা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। এই ভিড়ের মধ্যে নিশ্চয়ই দীপ দাঁড়িয়ে আছে। তাকালেই ইশারা করবে ওর কাছে যেতে। এই বোকামিটা সে কখনওই করবে না। ট্রলিতে মালপত্র তোলা হলে লেডি চ্যাটার্জি হাত বাড়ালেন, 'আমার হ্যান্ডব্যাগ?'

'কাপুর বললেন, 'এটা খুব ভারী। নিতে পারবেন? আমার কাছেই থাক।'

'একজনের জন্যে কটা হ্যান্ডব্যাগেজ এয়ারলাইন অ্যালাউ করে?'

জর্ডন এয়ারলাইন্সের ভদ্রলোক বললেন, 'এসব নিয়ে চিন্তা করবেন না ম্যাডাম।'

তৃণা আড়চোখে হ্যান্ডব্যাগটাকে দেখল। কাপুরের হাতে দুটো ব্যাগ।

টিকিট দেখিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় কি দীপের গলা শুনতে পেল তৃণা? দীপ কি তার নাম ধরে ডাকল? যে বিশাল লাউঞ্জে যাত্রীদের বন্ধু আত্মীয়রা আগে ঢুকতে পারত সেখানে পৌঁছে অফিসার বললেন, 'আজই এটা হয়েছে। দিল্লি থেকে নির্দেশ এসেছে। সম্ভবত সন্ত্রাসবাদীদের জন্যেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।'

এবার বাঁ দিকের প্যাসেজ দিয়ে ঢোকার সময় আবার টিকিট দেখাতে হল। কাপুরই দেখাচ্ছিলেন। এই অংশে যাত্রীরা ছাড়া কেউ ঢুকতে অনুমতি পায় না। স্বস্তির শ্বাস ফেলল তৃণা, দীপ আর সমস্যা তৈরি করতে পারবে না।

অফিসার বললেন, 'ম্যাডাম, আপনি যদি আমাদের লাউঞ্জে গিয়ে বিশ্রাম করেন তা হলে আমরা ফর্মালিটিগুলো শেষ করতে পারি।'

'ফর্মালিটিস?'

'বোর্ডিং কার্ড নেওয়া। কিছু ফর্ম ভর্তি করা—।'

'ওকে!'

স্যুটকেসগুলো এক্সরে করিয়ে নেওয়া হল। ওগুলো চলে যাবে প্লেনের পেটে। অফিসার ওঁদের নিয়ে গেলেন সুদৃশ্য একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে। জিজ্ঞাসা করলেন কেউ কিছু পান করবেন কি না। লেডি না বলার পর কাপুর বললেন, 'টিকিট আমার কাছে আছে, চলুন।'

ওঁরা বেরিয়ে গেলেন।

চন্দ্রনাথ বললেন, 'ম্যাডাম, আপনার জন্যেই আমরা আলাদা খাতির পাচ্ছি।'

'কী রকম?'

'এত বছর ধরে ওড়াওড়ি করছি, কখনও আমাকে আলাদা করে ডেকে স্পেশ্যাল লাউঞ্জে কেউ বসায়নি। ফার্স্ট ক্লাশ বা ক্লাব ক্লাশের টিকিট থাকলে তার জোরে নিজেই গিয়ে বসতাম।'

লেডি বললেন, 'আমার কোনও কৃতিত্ব নেই। সবই লর্ড অমলেশ চ্যাটার্জির দান। তিনি স্যার উপাধি না পেলে আমাকে কেউ লেডি বলত না।' হাসলেন লেডি কণিকা চ্যাটার্জি।

তৃণা বলল, 'আমি একটু বাইরে যাব?'

কাবেরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

'এমনই। কীভাবে বোর্ডিং কার্ড নেয় কখনও দেখিনি।'

'দেখেছ। স্টেটস থেকে ফেরার সময় আমার সঙ্গে ছিলে।'

চন্দ্রনাথ বললেন, 'তখন কত ছোট ছিল, মনে থাকার কথা নয়। ওর বড় হওয়ার পর এই প্রথম বিদেশে যাওয়া। কৌতূহল তো হবেই।'

লেডি বললেন, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসো।'

ঘাড় নেড়ে দরজা ঠেলে বের হল তৃণা।

বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের সামনে লাইন পড়েছে যাত্রীদের। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে কোন ফ্লাইট কখন ছাড়বে, কোন দেশে যাবে। যে লাউঞ্জে আজ যাত্রীদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না সেখানে চলে এল সে। ডান দিকের দরজা দিয়ে ঢুকেছিল ওরা। সামনে একটা চওড়া প্যাসেজ চলে গেছে অনেকটা দূরে।

আর তখনই চোখে পড়ল। বিশাল কাচের দেওয়াল যেটা বাইরের জনতা আর এই লাউঞ্জটাকে আড়াল করেছে সেখানে একটি শরীর লেপ্টে আছে, প্রাণপণে চেষ্টা করছে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কিন্তু কোনও শব্দ সেই দেওয়াল ভেদ করে এদিকে আসছে না। তৃণা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। এখন সে দীপের মুখ চোখ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু দীপ কাচের গায়ে চলে এলেই সেটা চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে। হাত নাড়ছে দীপ, বেরিয়ে আসতে বলছে। তৃণা হাত নেড়ে

না বলল। তার কাছে টিকিট নেই, বাইরে গেলে আর ঢুকতে পারবে না। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়ানোর পর সে বিদায় জানাবার জন্যে হাত নেড়ে দ্রুত ফিরে চলল।

প্রত্যেক যাত্রীকে সিকিউরিটি চেকিং-এর জন্যে লাইন দিতে হচ্ছিল। সেই অফিসার কিছু বলতেই সিকিউরিটির কর্তা এগিয়ে এলেন, 'আসুন ম্যাডাম।'

এবার লেডির হ্যান্ডব্যাগ আগে ভাগেই নিয়ে নিয়েছিল তৃণা, লেডিকে ডাকামাত্র সে ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। কাবেরীদের পাশপোর্ট পরীক্ষা করাতে হচ্ছিল। লেডি কণিকা চ্যাটার্জি যখন টুক টুক করে কাস্টমস এনক্লোজারে পৌঁছালেন তখন তৃণাও তার সঙ্গে। অফিসারই যাবতীয় নিয়ম আইন অনুযায়ী পালন করে বললেন, 'এসকালেটরে উঠতে পারবেন তো?'

লেডি মাথা নাড়লেন, 'পারব।'

ওপরে ওঠার সময় লেডিকে ধরল তৃণা। এবার আসল পরীক্ষা। হ্যান্ডব্যাগ এক্সরে করা হবে। দরকার হলে খোলা হবে। শরীর সার্চ করা হবে। তৃণা লেডিকে বলল, 'তোমার ব্যাগটা দু'মিনিট ধরতে পারবে না?'

'দাও।'

ওই অফিসার লেডির পরিচয় দেওয়ায় তাঁর কোনও সিকিউরিটি চেকিং হল না। হাতের ব্যাগও এক্সরে করার কথা খেয়াল হল না ওঁদের। তৃণাকে সেসব পর্ব চুকোতে হল। ভেতরে ঢোকার পর লেডি বললেন, 'তোমার ক্যামেরার ওজন এত বেড়ে গেল কী করে। আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে।'

তৃণা চট করে ব্যাগটা নিয়ে বলল, 'পুরনো ক্যামেরা তো!'

জর্ডন এয়ারলাইন্সের ফার্স্ট ক্লাশ এনক্লোজারের আরামদায়ক আসনে বসার পর তৃণা মনে মনে হাসল। সব কিছু ঠিকঠাক চলছে। হ্যান্ডব্যাগগুলো এয়ার হোস্টেস নিয়ে গেছে ভেতরে। গন্ধযুক্ত গরম তোয়ালে দিয়েছে মুখ মুছতে।

প্লেন ছাড়ল।

তৃণা মনে মনে হেসেই চলেছিল। এক ভদ্রলোকের পকেটে দেশলাই ছিল। তাঁকে সেটা নিতে দেয়নি সিকিউরিটির লোকেরা। একজনের হ্যান্ডব্যাগে ফল কাটার ছুরি ছিল, সেটাও নয়, আর একজনের হ্যান্ডব্যাগ খুলে প্যাকেট বের করেছিল। গড়গড়ায় খাওয়ার জন্যে নরম তামাক। সেটা ঠিক কী এই নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল। ওরা যদি লেডির ব্যাগ এক্সরে করত তা হলে বিস্কুটের প্যাকেট দেখতে পেত। তা হলে কি খুলে সত্যতা যাচাই করত? কে জানে। দীপটার জন্যে তার একটু খারাপ লাগছে। কীরকম অসহায় দেখাচ্ছিল ওকে।

কী করা যাবে! হিমালয় অভিযানের ওপর একটা বই পড়েছিল সে। তাতে লেখা ছিল, বরফের ওপর দিয়ে ওপরে ওঠার সময় কেউ যদি পড়ে যায় তা হলে তার দিকে ফিরে না তাকানোই হল নিয়ম। তাকে সাহায্য করতে গেলে নিজের প্রাণ বিপন্ন হবেই। সেও তো তাই করতে বাধ্য হল। দীপ নিশ্চয়ই ওর মতন ভাল থাকবে।

আম্মান বিমানবন্দরে লেডি চ্যাটার্জিকে একই রকমের খাতির করা হল। এয়ারলাইন্সের অফিসার তাঁদের নিয়ে গেলেন ভি আই পি লাউঞ্জে। জিজ্ঞাসা করলেন, কে কী পান করবেন।

ওখানে সবাই ফ্রেশ হওয়ার সময় পেলেন। লেডি চ্যাটার্জিকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। অত আরামদায়ক উড়ান সত্ত্বেও তিনি ঘুমাতে পারেননি, বললেন, 'এই আমার শেষ ওড়া। ফিরে গিয়ে এসব চিন্তা মাথায় আর আনতে পারব না।'

চা-পানের পর লেডি বললেন, 'হ্যাঁরে, ক্যামেরাটা নিয়ে এলি ছবি তুললি না?'

কাবেরী বললেন, 'হ্যাঁ, ছবি তোলা উচিত।'

চন্দ্রনাথ তাঁর দামি স্টিল ক্যামেরা বের করে ছবি তুললেন।

তৃণা বলল, 'ছবি উঠবে কী করে? আমি তো ভেবেছি ওখানে গিয়ে ফিল্ম কিনব।'

লেডি হাসলেন, 'এখানকার ডিউটি ফ্রি শপগুলোয় দ্যাখ, পেয়ে যাবি। কাপুর, ওকে নিয়ে যাও তো!'

কাপুর বললেন, 'চলো। ক্যামেরাটা কোথায়?'

তৃণা লেডির হ্যান্ডব্যাগ থেকে তোয়ালে মোড়া ক্যামেরা বের করল।

ডিউটি ফ্রির দোকানগুলো এমন উজ্জ্বল আলোয় সাজানো যে মনে হয় স্বপ্নপুরীতে এলাম। হঠাৎ কাপুর দাঁড়ালেন, 'তোমাকে একটা কথা বলতে চাই তৃণা।'

'বলুন, কাপুর আঙ্কল!'

'গতকাল বিকেলে কলকাতা পুলিশের একজন বড় অফিসার আমায় ফোন করেছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন লেডি চ্যাটার্জি বোম্বে থেকে যে হিরের নেকলেস কিনেছেন সেটা তোমাকে গিফট করেছিলেন কি না!'

তৃণা শক্ত হল। দ্রুত সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কী বললেন?'

'উনি তোমাকে কী গিফট দেবেন তা আমার জানার কথা নয়।'

'ও।'

'কিন্তু অফিসার বললেন, সেই নেকলেস তুমি খুব কম দামে বিক্রি করেছ। তোমার কাছে কোনও কাগজ ছিল না।' কাপুর তাকালেন, 'সত্যি?'

'কী করে সত্যি হবে? দিদু তো আমাকে ওরকম কিছু গিফট করেননি।'

'তা হলে অভিযোগটা উঠল কেন?'

'আশ্চর্য! আমি কী করে বলব?'

'বিদেশে যাচ্ছেন বলে পুলিশ কাল লেডিকে জেরা করেনি। কিন্তু ফিরে গেলেই করবে।'

'দিদু জানে?'

'না। ব্যাপারটা এখনই বলে ওঁকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাইনি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কল।'

'তা হলে তুমি নেকলেস বিক্রি করেছ?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল তৃণা।

'কোথায় পেলে ওটা?'

'দীপ, দীপ এনে দিয়েছিল। বোধ হয় ওর মায়ের।'

'মিথ্যে বলেছ কেন? তোমার দিদিমাকে কেন জড়ালে?'

'না হলে লোকটা আমার কাছ থেকে কিনত না।'

'দীপের মা জানেন?'

'আমি জানি না।'

'তোমার ভাগ্য খুব ভাল। দু'দিন আগে যদি পুলিশ জানতে পারত তা হলে তোমার বিদেশে পড়তে যাওয়া সম্ভব হত না।' হাঁটতে শুরু করেই দাঁড়িয়ে গেলেন বৃদ্ধ, 'এই গল্পটা মিথ্যে না তো?'

হাসল তৃণা। ঘাড় নেড়ে না বলল।

ক্যামেরার চেহারা দেখেই সেলসগার্ল মাথা নাড়লেন। এই মডেল এখন বাজারে পাওয়া যায় না। এক ধরনের বিশেষভাবে তৈরি ক্যামেটফিল্মে ওই ক্যামেরায় ছবি তোলা হত যা এখন বিক্রি হয় না। তৃণা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে ভেবে পাচ্ছিল না ওরা যদি ক্যামেরা খুলে দেখতে চায় তো কী করবে! ফিল্ম না পাওয়ায় স্বস্তি হল।

কাপুর বললেন, 'ওটা রেখে লাভ নেই, ফেলে দাও। বরং এখান থেকে একটা নতুন হ্যান্ডিকাম কিনে নাও।'

'না। এটা ফেলব না। এর ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে। দেখি ওখানে গিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় কি না!' তৃণা বলল।

ফিরে এসে কাপুর ব্যাপারটা জানাতেই কাবেরী বললেন, 'ওটা বয়ে নেওয়ার কোনও মানে হয় না।'

তৃণা চুপ করে রইল। এবার তার ভয় হচ্ছিল। যেভাবে সবাই ক্যামেরাটাকে দেখছে তাতে এর ভেতরে প্যাকেটটাকে রাখা নিরাপদ বলে মনে হচ্ছিল না। কথা অন্য প্রসঙ্গে ঘুরে যেতে সে সাময়িক নিষ্কৃতি পেল।

চন্দ্রনাথ এবং কাবেরী গেলেন ডিউটি ফ্রি শপগুলো দেখতে। কাপুর ফোনে কথা বলতে চেষ্টা করছিলেন স্টকহোমের সঙ্গে কিন্তু এই ঘরে ঠিক শোনা যাচ্ছিল না বলে বেরিয়ে গেলেন। লেডি শুয়ে আছেন ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে। তৃণা দ্রুত ক্যামেরা খুলল। ভেতর থেকে প্যাকেট বের করে তোয়ালেতে জড়িয়ে সেটা লেডির হ্যান্ডব্যাগের তলায় ঢুকিয়ে রাখল।

কাবেরীরা ফিরলেন। উড়ানের সময় হয়ে গেছে। চন্দ্রনাথ বললেন, 'দেখি তোমার ক্যামেরাটা।' ওটা তুলে উলটে পালটে দেখে বললেন, 'জিনিসটা কিন্তু ভাল।'

লেডি তাকালেন, দেখলেন, বললেন, 'গায়ে দেখছি খুব জোর।'

'কেন? এটা তো তেমন ভারী নয়।' চন্দ্রনাথ বললেন।

'সেকী? আমার হাত ছিঁড়ে যাচ্ছিল ওটার জন্যে। দেখি!' হাত বাড়িয়ে চন্দ্রনাথের হাত থেকে ক্যামেরা নিয়ে বললেন, 'আরে! এ তো বেশ হালকা!'

তৃণা হাসল, 'তখন তোমার মনের ভুল হয়েছিল দিদু।'

আম্মান থেকে স্টকহোমের প্লেনে ওঠার সময় প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের লাইন দিতে হল না। ডাক পড়ল আগে। লেডির হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল তৃণা। লেডিকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এবার সবাইকে হ্যান্ডব্যাগ এক্সরের জন্যে দিতে হল। লেডির হ্যান্ডব্যাগ তৃণা দিতে বাধ্য হল। এক্সরে মেশিন থেকে বেরুনো মাত্র একজন কাস্টমস অফিসার বললেন, 'এর ভেতরে কী আছে?'

চটপট এগিয়ে গেল তৃণা। জিনিসগুলো বের করে দেখাল। প্যাকেটটার দিকে তাকালেন অফিসার। 'এটা কীসের প্যাকেট?'

'বিস্কুটের। উনি, আমার দিদিমা, লেডি চ্যাটার্জি এই বিস্কুট ছাড়া খেতে পারেন না।'

'ওকে!'

ব্যাগ নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্বাস ফেলল তৃণা। আর একটু হলেই হয়ে যেত!

প্লেনের সিটে বসার পর কাবেরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর ক্যামেরা কোথায়?'

'তোমরা সবাই বললে ফেলে দিতে তাই নিয়ে এলাম না!'

কাবেরী কাঁধ নাচালেন।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাস্টমস অফিসার কী জিজ্ঞাসা করছিল?'

'অতগুলো লিপস্টিক কি এই ট্যুরে ব্যবহার করা যাবে?' তৃণা বলল।

'অনধিকার চর্চা।' কাবেরী বললেন।

প্লেন ছাড়ল।

ঘণ্টা তিনেক পরে ঘোষণা করা হল সবাই যেন সিট বেল্ট বেঁধে নেয়, আবহাওয়া খারাপ। তারপরেই প্লেনটা বিশ্রীভাবে দুলতে শুরু করল। পাইলট প্লেন আরও ওপরে তোলার পর শান্তি ফিরে এল। শেষ পর্যন্ত পাইলট জানালেন, স্টকহোমে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। এখন কোনও অবস্থাতেই সেখানে ল্যান্ড করা সম্ভব হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে আমরা কোপেনহেগেনে নামছি। যেসব যাত্রী আজই স্টকহোমে যেতে চান তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে জর্ডন এয়ারবাস কাউন্টারে যোগাযোগ করতে।'

লেডি চ্যাটার্জি কাপুরকে ইশারা করলেন কাছে আসতে। প্লেন তখন স্থির হয়ে চলছে। কাপুর উঠে এলেন সিট থেকে।

'আমরা কোপেনহেগেন থেকেই শুরু করব। টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো বদলে নাও।' লেডি জানিয়ে দিলেন।

'ঠিক আছে, ম্যাডাম।'

তৃণার মুখ শুকিয়ে গেল।

কাপুরের কৃতিত্বে এই সময়ের মধ্যেই অ্যারাইভাল টার্মিনালে দু'দুটো গাড়ি ওঁদের অপেক্ষায় ছিল। শহরের অন্যতম নামকরা হোটেল, হোটেল টিভোলি থেকে এসেছে ওরা। গাড়িতে ওঠার পর লেডি বললেন, 'হ্যান্ডব্যাগটা দে।'

সেটা নিয়ে ভেতর থেকে কিছু বের করতে গিয়ে তিনি বললেন, 'এটা কী?'

'বিস্কুট।'

'বাব্বা। এত ভারী! তুমি রেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কী বিস্কুট?'

'হরলিক্স।'

'এটা তোমার ব্যাগে রাখো।'

প্যাকেটটা নিয়ে নিল তৃণা। নিয়ে ঠোঁট কামড়াল।

শহরে ঢুকল ওরা। টাউন হল স্কোয়ারের পাশ দিয়ে ভেস্টারব্রগেড স্ট্রিট

দিয়ে টিভোলি পার্ককে ডান দিকে রেখে একটু এগোলেই হোটেলটা এসে গেল।

গাড়িতে বসেই কুকুর দুটোকে দেখতে পেল তৃণা। নিরীহ চেহারার দুটো কুকুরকে চেনে বেঁধে হোটেলের মুখে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন উর্দিপরা কর্মচারী। ওদের পেছনে একটা প্ল্যাকার্ডে লেখা, দিস ইজ ড্রাগ-ফ্রি হোটেল।

হোটেলের লোকজন মালপত্র নামিয়ে নিয়ে গেলে লেডি চ্যাটার্জি মেয়ের হাত ধরে এগিয়ে গেলেন গেটের দিকে। তাঁর পেছনে চন্দ্রনাথ এবং কাপুর। সবার পেছনে তৃণা, ওঁরা ভেতরে ঢোকার সময় কুকুর দুটো নাক টানল কিন্তু কিছু বলল না। কিন্তু তৃণা যেই ওদের কাছাকাছি এল অমনি একটা কুকুর ভুক্ করে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়টা নাক টেনে এগিয়ে আসতে চাইল তৃণার দিকে। ওদের কেয়ারটেকার প্রাণপণে চেষ্টা করছিল শান্ত করতে কিন্তু ওরা হঠাৎ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

তৃণা বুঝল কুকুরদুটো ঘ্রাণ পেয়ে গেছে। যে কোনও মুহূর্তে ওরা কেয়ারটেকারের হাত থেকে চেনের প্রান্ত ছাড়িয়ে নেবে। ভয়ে, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সে দৌড়াতে লাগল। কুকুরদুটোর মধ্যে যেটা তেজি সেটা প্রবল চেষ্টায় চেন ছাড়াতে পারল।

তৃণা দৌড়াচ্ছিল। এত জোরে সে কখনও দৌড়ায়নি। এখন এই রাস্তা তার অচেনা। কোপেনহেগেন শহরে সে কখনও আসেনি এ সব ভাবনা তার মাথায় কাজ করছিল না। কুকুরের ডাকটা এগিয়ে আসছে কাছে। সে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল। দৌড়াতে দৌড়াতে সে দেখতে পেল অদ্ভুত চেহারার কিছু নারী-পুরুষ দুই ফুটপাথের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। তৃণাকে তাদের দিকে ছুটে এগিয়ে আসতে দেখে খুব মজা পেয়ে গেল ওরা। বীভৎস চিৎকার করছিল ওরা যা আফ্রিকার ক্যানিবালরা ছবিতে করে থাকে। এদের এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে দৌড় থামাচ্ছিল না সে। হঠাৎ ফুটপাথে বসা বিশাল চেহারার একজন তার পা বাড়িয়ে দিতেই তৃণা হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ল রাস্তায়। তার হাত থেকে ভারী প্যাকেটটা ছিটকে গেল খানিকটা দূরে। সঙ্গে সঙ্গে একটি বীভৎস চেহারার মহিলাকে সেটা কুড়াতে দেখে তৃণা চিৎকার করে ওঠার চেষ্টা করল। কিস্ মাই অ্যাস বেবি! হাসতে হাসতে বলল মহিলা। সেই সময় পুলিশের গাড়ির সাইরেন দূরে কোথাও বেজে উঠতেই লোকগুলো যেন এক পলকেই উধাও হয়ে গেল। তৃণা যখন কোনওমতে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন কুকুরটাকে দেখতে পেল। শূন্যে লাফিয়েছে জন্তুটা নিঃশব্দে। দু' হাতে

নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করল তৃণা। কিন্তু প্রবল আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না। চৈতন্য হারাবার আগে সে শুনতে পেল পুলিশের গাড়ির সাইরেনের আওয়াজ আরও জোরালো হয়েছে।

তৃণার জ্ঞান ফিরল সন্ধের মুখে। সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা এবং ব্যান্ডেজ, সে শুয়ে আছে যে বিছানায় সেটা হাসপাতালেই দেখা যায়। যে বয়স্কা নার্স ডিউটিতে ছিলেন তিনি এগিয়ে এলেন, 'চিয়ার আপ বেবি। ইউ আর ফাইন, আরন্‌ট ইউ?'

তৃণা কিছু বলল না। তার মুখের অনেকটাই যে ব্যান্ডেজের আড়ালে সেটা বুঝতে পারল। এই সময় কাবেরী এবং চন্দ্রনাথ ঘরে এলেন।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগছে এখন?'

তৃণা চোখ বন্ধ করল।

কাবেরী বললেন, 'খুব জোর বেঁচে গেছিস। কুকুরটা আর একটু হলেই তোর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলত। তুই দৌড়ে পালাতে গেলি কেন?'

'ওরা... লোকগুলো...?' তৃণা কথা বলতে গিয়ে শুনল জড়িয়ে যাচ্ছে।

'ওরা পাঙ্ক।' চন্দ্রনাথ বললেন, 'কাজকর্ম করে না, নেশা করে পড়ে থাকে। ওরা তোমাকে কিছু করেছে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল তৃণা।

চন্দ্রনাথ বললেন, 'ওরা সাধারণত নিজেদের নিয়েই থাকে। তবে ওইসব অ্যান্টিসোস্যালরা যদি কিছু করে থাকে তা হলে কাল সকালে পুলিশ যখন জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসবে তখন বলবে।'

কাবেরী বললেন, 'মা খুব আপসেট। এতই যে ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। প্রেসার খুব বেড়ে গেছে তোর ঘটনাটা শুনে। তৎক্ষণাৎ হোটেল তো চেঞ্জ করলেনই, কাপুর আঙ্কলকে বলেছেন ল-ইয়ারকে বলতে হোটেলের বিরুদ্ধে স্যুট করতে। আচ্ছা, আমাদের কাউকে কিছু বলল না, তোকে কেন কামড়াল কুকুরটা?'

চন্দ্রনাথ বললেন, 'ওকে প্রশ্নটা করে কিছু লাভ আছে? তুমি রেস্ট নাও তৃণা, আমরা কাল আসব।'

ওরা চলে গেলেন। তৃণার চোখের সামনে সেই বীভৎস মেক-আপ নেওয়া মহিলা যে তার প্যাকেটটা তুলে নিয়েছে। এর মধ্যেই ওরা নিশ্চয়ই জেনে গেছে যে, প্যাকেটের মধ্যে কী আছে।

রাত একটায় ঘুম ভাঙল তৃণার। হাসপাতাল শব্দহীন। এই ঘরেও কেউ

নেই। সে অনেক চেষ্টার পর নীচে নামতে পারল। এই চেষ্টা করতে গিয়ে শরীরের অনেক জায়গায় ব্যান্ডেজের নীচে যন্ত্রণা শুরু হল। কয়েক সেকেন্ড সেটা সইয়ে সে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল সন্ধেবেলার নার্সটি একটি চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে। উলটো দিকের দেওয়ালে পর পর টেলিফোন রয়েছে। ওপরে ডেনিস ভাষায় যা লেখা রয়েছে তা পড়ে বুঝতে পারল না সে।

হিপ পকেট থেকে নাম্বার লেখা কাগজটা বের করে এক মুহূর্ত ভাবল সে। ফোন করতে হলে পয়সা ফেলা দরকার। কিন্তু এই টেলিফোনে পয়সা ফেলার কোনও ব্যবস্থা নেই। অতএব ডায়াল করল সে, ওদিকে রিং হচ্ছে।

দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল তৃণার। এই সময় গলা শুনতে পেল, 'হ্যালো?'

'নিক?'

উত্তরে উচ্চারিত বাক্যটির মানে বুঝতে পারল না তৃণা। মরিয়া হয়ে বলল, 'আমি নিকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি তৃণা।'

সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতে বলল লোকটি, 'হোল্ড অন।'

তার পরই নিকের গলা,' হাই। ইজ ইট তৃণা ফ্রম কলকাতা?'

'ইয়েস।'

'আরে! তুমি কোথায়? তোমার কথা ছিল আজই স্টকহোমে পৌঁছে আমাকে ফোন করবে। না করায় মনে হয়েছিল তুমি বিপদে পড়েছ।' নিক বলল।

'হ্যাঁ বিপদে পড়েছি। আমি এখন কোপেনহেগেনের হাসপাতালে।'

'মাই গড! কেন?'

যতটা সংক্ষেপে পারে ঘটনাটা জানাল তৃণা।

'যদিও একটু দেরি হয়ে গেছে তবু ওই পাঙ্কগুলোকে খুঁজে বের করতেই হবে। তুমি কোন হাসপাতালে আছ?'

'আমি জানি না। এখানে যখন আমাকে এনেছিল তখন আমার সেন্স ছিল না। তবে আমাদের হোটেল টিভোলিতে ওঠার কথা ছিল। ওদেরই কুকুর...'

'দ্যাটস অল রাইট। উইশ ইউ এ কুইক রিকভারি।'

নিক লাইন কেটে দিল। রিসিভার রেখে তৃণার মনে হল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই ফোন রেখেছেন যাতে পেশেন্টরা পয়সা না দিয়ে স্বচ্ছন্দে ফোন করতে পারে। কোনও মতে সে বিছানায় ফিরে আসছিল। হঠাৎ দেওয়ালে লাগানো আয়নার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল তৃণা। কী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাকে। প্রায় মমির মতো। বিছানায় শুয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল তৃণা।

বালিশে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন লেডি চ্যাটার্জি। চন্দ্রনাথ তাঁর পালস দেখছিলেন। বললেন, 'আপনার এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।'

'হুম।' একটা শব্দ বেরুল লেডি চ্যাটার্জির মুখ থেকে। তারপর কাপুরের দিকে তাকালেন, 'হোটেল টিভোলির বক্তব্য কী?'

'ওরা আমাদের নোটিসের জবাবে লিখেছে যে প্রতিদিন কত মানুষ হোটেলে যাওয়া-আসা করে তাদের কুকুর দুটো কিছু বলে না। ওরা খুবই ট্রেনড। তা হলে তৃণাকে ওরা কেন টার্গেট হিসেবে বেছে নিল? তৃণা যদি না দৌড়াত তা হলে কুকুর দুটো অত ক্ষিপ্ত হত না। তৃণা কেন দৌড়াল? দৌড়াবার সময় তৃণার হাতে একটা প্যাকেট ছিল। সেটা কীসের প্যাকেট? সেটা কোথায় গেল? পুলিশ যখন ওকে উদ্ধার করেছিল তখন প্যাকেটটাকে পাওয়া যায়নি। ওদের সন্দেহ ওই প্যাকেটে কোনও নিষিদ্ধ বস্তু থাকায় কুকুর দুটো তার গন্ধ পেয়েছিল! এ রকম ক্ষেত্রে তাদের কোনও দায় নেই।' কাপুর বলে গেল।

'তৃণা সম্পর্কে ডাক্তাররা কী বলছেন?' লেডি জিজ্ঞাসা করলেন।

চন্দ্রনাথ বললেন, 'মারাত্মক আহত হয়েছে সে। সেরে উঠতে দিন পনেরো-কুড়ি লাগবে। কিন্তু মুখ বীভৎস হয়ে গেছে। প্লাস্টিক সার্জারির দরকার হবে। অন্তত তিনবার। খুব ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে।'

'এ কথা তৃণা জানে?'

'সবটা না হলেও জানে।'

'পুলিশ?'

'পুলিশ এনকোয়ারি করছে। একজন ডেনিস পুলিশ অফিসার আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন।' কাপুর বললেন।

চন্দ্রনাথ জানালেন, 'এখন ওর কারও সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়।'

লেডি চ্যাটার্জি হাসলেন, 'আই অ্যাম অল রাইট। কাপুর, নিয়ে এসো ওঁকে।'

কাপুর যাঁকে নিয়ে এলেন তিনি মধ্যবয়স্ক, সাদা পোশাকে এসেছেন। ঘরে ঢুকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। ইংরেজি ওঁর মাতৃভাষা না হওয়ায় থেমে থেমে কথা বলছিলেন। লেডির বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন তিনি, 'আমি শুনলাম আপনি খুব অসুস্থ। এ রকম খবরে সেটা খুবই স্বাভাবিক। আমরা আপনাদের সাহায্য করতে চাই। ইতিমধ্যে কুকুর দুটোর কেয়ারটেকারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কুকুর দুটোকে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে ওদের মধ্যে অ্যাবনর্মালিটি আছে কি না।'

'ধন্যবাদ অফিসার।' লেডি চ্যাটার্জি বললেন।

'আপনার পরিবার ইন্ডিয়ায় খুব সম্মানিত। আপনার স্বামী লর্ড ছিলেন। তাই আপনারা যে কোনও ধরনের ড্রাগ ক্যারি করছেন এটা আমরা ভাবতে চাই না। কিন্তু যে মেয়েটি আহত হয়েছে সে একটা প্যাকেট ক্যারি করছিল। আপনারা কি জানেন কী ছিল সেই প্যাকেটে?'

'বিস্কিট।' বললেন লেডি চ্যাটার্জি, 'ও যে বিস্কিট ভালবাসে তাই এনেছিল।'

'আই সি। প্যাকেটটা কি ভারী না হালকা ছিল?'

'ভারী।'

'কীরকম ভারী?'

'বলতে পারব না।'

'একজন পাঙ্ক দৌড়াবার সময় বদমায়েসি করে পা বাড়িয়ে ওকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। মাটিতে পড়বার সময় মেয়েটির হাত থেকে প্যাকেটটা ছিটকে যায়। আর একটি পাঙ্ক মহিলা সেটা কুড়িয়ে নেয়। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলা যায়নি।' অফিসার থামলেন।

এতক্ষণে কাবেরী কথা বললেন, 'কেন?'

'ও মারা গিয়েছে। আজ খুব ভোরে ও খুন হয়েছে।'

'সেকী!' কাবেরী চমকে উঠলেন।

'প্যাকেটটা পাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে মহিলা দল ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সারা দিন এখানকার আর একটি পাঙ্ক গ্রুপের সঙ্গে কাটায়। তারাও ওর হাতে প্যাকেটটাকে দেখেছে। ও নাকি বিশেষ একটি লোকের সঙ্গে দেখা করবে বলে অপেক্ষা করছিল যে কোপেনহেগেনের বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু সেই লোকটি ফিরে আসার আগেই ও খুন হয়ে যায়, প্যাকেটটাকেও পাওয়া যায়নি।' অফিসার বললেন। তারপর তাকালেন কাবেরীর দিকে, 'কী বিস্কুট ছিল ওই প্যাকেটে?'

'হরলিক্স বিস্কুট।' লেডি বললেন।

'কী ভাবে খুন হয়েছে মেয়েটি?' চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

'প্রফেশনাল খুনিরা ছুরি দিয়ে যেভাবে খুন করে। মেয়েটি তখন একটা নির্জন বেঞ্চে ঘুমাচ্ছিল। খুনিকে কেউ দেখতে পায়নি।' অফিসার বললেন।

'সেই লোকটি, যার জন্যে মহিলা অপেক্ষা করছিল...'

'সে আজ এসেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু তথ্য পাইনি। সে জানেই না কেন মহিলা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মুশকিল হল, প্যাকেটে কী ছিল

তা মহিলা দলের কাউকে বলেনি।'

লেডি বললেন, 'অফিসার, আমি চাই ওই মহিলার খুনি শাস্তি পাক।'

'থ্যাঙ্ক ইউ লেডি!' অফিসার উঠে দাঁড়ালেন, 'আপনারা কতদিন এখানে আছেন?'

লেডি জানালেন, 'যত দিন আমার নাতনি সুস্থ না হয়!'

'ধন্যবাদ।' অফিসার চলে গেলেন।

চন্দ্রনাথ বললেন, 'আর কোনও কথা নয়। ওঁর এখন বিশ্রাম দরকার।'

লেডি বললেন, 'কাপুর, যাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম তাঁদের ব্যাপারটা জানিয়ে দাও। অবশ্য তাঁরা যদি কোপেনহেগেনে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান তা হলে স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন। আর হ্যাঁ, বিকেলে একবার দেখা কোরো।'

সকালেই জ্বরটা এসেছিল। তৃণাকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে ডক্টর ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠিক পাঁচ মিনিট কথা বলতে চায় এখানকার পুলিশ। কথা বলতে পারবে?'

তৃণা তাকাল। তারপর চোখ বন্ধ করল।

অফিসার এলেন, 'আই অ্যাম রিয়েলি সরি, আপনি এখন খুব অসুস্থ তবু বিরক্ত করছি। কুকুর দুটোকে দেখে পালালেন কেন?'

'ভয়ে। ওরা আমাকে কামড়াতে চাইছিল।' জড়ানো গলায় বলল তৃণা।

'আর কাউকে তো ওরা ভয় দেখায়নি, আপনাকে কেন?'

মাথা নেড়ে 'জানি না' বলল তৃণা।

'আপনার হাতের প্যাকেটে কী ছিল?'

'বিস্কুট।'

'কত বিস্কুট?'

'অনেক।'

'কী ধরনের বিস্কুট?'

'হরলিক্স বিস্কুট।'

'যে মেয়েটি মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিল প্যাকেটটা তাকে আপনি চিনতে পারবেন?'

ভাবল তৃণা, তার পর মাথা নেড়ে না বলল।

'ওকে কে খুন করতে পারে তা আন্দাজ করতে পারেন?'

'খুন?'

'ইয়েস।' অফিসার বললেন, 'প্যাকেটটা পাওয়া যায়নি।'

একটা বড় শ্বাস বুক কাঁপিয়ে বেরিয়ে এল তৃণার, 'আমি জানব কী করে?'

'আপনি এখানে ভর্তি হওয়ার পর কাউকে টেলিফোন করেছেন?'

'ফোন? এখানে ফোন কোথায়? আমি তো নড়তেই পারছি না।'

ডাক্তার এতক্ষণ শুনছিলেন, এবার বললেন, 'অল রাইট অফিসার। প্লিজ লিভ হার।'

অফিসার উঠলেন। বাইরে বেরিয়ে আসতেই তাঁর নজর পড়ল দেওয়ালে ঝোলানো টেলিফোন। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ কুঁচকে গেল তাঁর।

ফিরে গেলেন অফিসার ডাক্তারের কাছে।

'ডক্টর, ওর পক্ষে কি বিছানা থেকে বাইরের প্যাসেজে যাওয়া সম্ভব?'

মাথা নাড়লেন ডক্টর, 'নো। ইম্পসিবল। কাল রাত্রে নয়, আর আজ সেই চেষ্টা করলে আমাদের চোখে পড়ে যেত।'

অফিসার মাথা নাড়লেন, তারপর চলে গেলেন।

কোপেনহেগেনে থেকে যেসব কাজকর্ম করার কথা ছিল তা শেষ করলেন কাপুর। লেডি অসুস্থ বলে ডেনিস ব্যবসায়ীরা একবারই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। চন্দ্রনাথের পক্ষে এত দিন থাকা সম্ভব নয় বলে তিনি দেশে ফিরে গেলেন সাতদিন বাদে।

দিন দশেক পরে কাপুর কলকাতা থেকে খবর পেলেন। দীপকে কেউ বা কারা খুন করেছে। পুলিশের সন্দেহ দীপ এমন কিছু জানত যা জানার জন্যে সে খুন হয়েছে। দীপের সঙ্গে গাঁজা পাচারকারীদের সম্পর্ক ছিল সেটাও পুলিশ জানতে পেরেছে। সম্ভবত সেই বিষয়েই মতান্তর হওয়ায় দীপকে প্রাণ হারাতে হয়েছে।

খবরটা পাওয়ার পর কাপুরের মন খারাপ হয়ে গেল। হাজার হোক অল্প বয়েসি ছেলে, তৃণা বিয়ে করেছিল ওকে। তার পরেই মনে হল, সত্যি কি বিয়ে করেছিল? ওটাও একটা মিথ্যে নয় তো। খবরটা লেডি বা তৃণাকে দেওয়া ঠিক হবে না বলে মনে হল তাঁর। শেষ পর্যন্ত কাবেরীকে বললেন তিনি। কাবেরী মৃত্যুসংবাদে যতটা না ব্যথিত হল তার চেয়ে আতঙ্কিত হল দীপের সঙ্গে গাঁজা

পাচারকারীদের সম্পর্ক ছিল শুনে। হঠাৎই মনে হল তৃণা যে প্যাকেট নিয়ে এসেছিল সেটার মধ্যে কি সত্যি বিস্কুট ছিল?

কাপুরকে নিয়ে তৃণার ব্যাগ দুটো তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু সন্দেহজনক বস্তু পেলেন না কাবেরী। শেষ পর্যন্ত ডায়েরি পাওয়া গেল। তাতে তৃণার পরিচিতদের নাম্বার, ইমেল নাম্বার লেখা। দীপের নামও রয়েছে। পাশে লেখা দীপ রেডিফ মেল ডট কম। তার পাশে তিনবার টিনা শব্দটি লেখা।

কাপুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'হু ইজ দিস টিনা?'

কাবেরী মাথা নাড়লেন, 'জানি না।'

ল্যাপটপ বের করে কাপুর দীপ রেডিফ মেল ডট কম-এ গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় দেখা গেল কোনও মেল নেই। সব মুছে দেওয়া হয়েছে।

কাপুর তৃণা রেডিফ মেল ডট কম-এ যাওয়ার চেষ্টা করে বুঝলেন ওটা কারও মেল অ্যাড্রেস নয়। একটু চিন্তা করে টাইপ করলেন, টিনা রেডিফ মেল ডট কম। সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় সেটা ভেসে এল। চারটে মেল এসেছে গত বারো দিনে। তিনটে দীপের।

দীপ প্রথম মেলে লিখেছে, 'তুই এত নিষ্ঠুর? কথা না বলে চলে গেলি?'

দ্বিতীয় মেলে লিখেছে, 'জিনিসটা আমরা কোথায় পাঠাচ্ছি তা জানার জন্যে ওরা খুব চাপ দিচ্ছে। আমি এখন কী করব? কোথাও পালাবার মতো টাকাও নেই। তাড়াতাড়ি আমাকে টাকা পাঠা। তুই নিরাপদে পৌঁছেছিস তো?'

তৃতীয় মেল, 'এখনও তোর সাড়া পাচ্ছি না কেন? তুই কি আমাকে বিট্রে করলি?'

চতুর্থ মেলটি এসেছে যেদিন ওঁরা কোপেনহেগেনে পৌঁছেছিলেন। 'তুমি কোথায়?' এটি এসেছে স্টকহোম থেকে। আর কোনও মেল আসেনি।

কাবেরী বিড়বিড় করলেন। 'স্টকহোমে ওর পরিচিত কে আছে?'

কাপুর বললেন, 'দীপ খুন হয়েছে ওই জিনিসটার জন্যে যেটা ওরা কোথাও পাঠাতে চেয়েছে। আমার মনে হচ্ছে ও যে প্যাকেটটা ক্যারি করেছিল দীপ তার কথাই লিখেছে।'

'প্যাকেটে কী ছিল?' কাবেরী তাকাল। তাঁর ভয় করছিল।

'আমি জানি না। নিশ্চয়ই মূল্যবান কিছু। যার জন্যে সমাজবিরোধীরা, গাঁজা পাচারকারীরা—— ' থেমে গেলেন কাপুর, 'গাঁজা ছিল না তো?'

'গাঁজা?' কাবেরী চমকে গেল, 'না না। ওটা থাকলে ধরা পড়ে যেত।'

'প্যাকেটটা সবসময় লেডির ব্যাগে এসেছে। কলকাতায় সম্মান দেখিয়ে

কেউ লেডির ব্যাগ সার্চ করেনি। আম্মানে করতে যাচ্ছিল, লেডির বিস্কুট বলাতে ওরা ছেড়ে দিয়েছে।'

'এখন কী হবে?'

'কিছু না। চুপ করে থাকো। দ্যাখো এখানকার পুলিশ কী করে! তৃণা সুস্থ হয়ে বেরিয়ে আসার পর দেখা যাবে। তোমার মাকে কোনও কথা বলার দরকার নেই।' কাপুর বললেন। তাঁকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তারপর ইন্টারনেটে কলকাতার কাগজগুলো বের করলেন। দু' দিন আগের কাগজে নিউজগুলো ছাপা হয়েছে। প্রিন্ট বের করলেন তিনি।

বারো দিন পরে তৃণা ছাড়া পেল। ডাক্তার তাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে বললেন, 'একটা অনুরোধ করব। এখন তুমি আয়নার সামনে দাঁড়াবে না।'

'কেন?'

'কষ্ট পাবে। কিন্তু প্লাস্টিক সার্জারি হয়ে গেলে তুমি আগের চেয়ে সুন্দরী হয়ে যাবে।'

'আমি এখন দেখতে খুব খারাপ হয়ে গেছি?'

'অ্যাক্সিডেন্টের যেসব স্মৃতি তোমার মুখে, শরীরে আছে সেগুলো মুছে ফেলা সম্ভব।'

কাবেরী এবং কাপুর এসেছিলেন তৃণাকে নিয়ে যেতে। তৃণার শরীর সুস্থ শুনে লেডি চ্যাটার্জি চেয়েছেন পরের দিনই দেশে ফিরে যেতে। গাড়িতে উঠে তৃণা কাবেরীর হাত জড়িয়ে ধরল, 'মা, আমি কি খুব খারাপ দেখতে হয়ে গেছি।'

'একটু তো বটেই। কুকুরটা তোমার মুখে নখ বসিয়েছিল।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তৃণা। দু' হাতে মুখ ঢাকল।

কাবেরী বললেন, 'কেন এত আপসেট হচ্ছ! সার্জারিতে ঠিক হয়ে যাবে।' বলতে বলতে কাবেরীর মনে হল মেয়ের এই মুখবিকৃতিতে তাঁর মোটেই খারাপ লাগছে না।

লেডি কণিকা চ্যাটার্জিকে প্রায় প্রতিদিন কাপুর তৃণার রিপোর্ট দিয়ে এসেছেন। ওর মুখের বর্তমান চেহারা তিনি কল্পনায় বুঝেছিলেন। তৃণাকে নিয়ে যখন ওঁরা ওঁর সামনে এল উনি মুখ তুলে দেখেই চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'ওঃ। নো!'

তৃণা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। নিজেকে সামলে নিয়ে লেডি চ্যাটার্জি বললেন, 'তুমি তোমার শাস্তি পেয়েছ তৃণা।'

'শাস্তি?'

'ডাক্তার পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিয়েছেন, কুকুরটা আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না। সে এখনও পাহারায় আছে এবং কাউকে কামড়াচ্ছে না। হোটেল টিভেলি ক্লেম করছে তোমার হাতে কোনও ড্রাগ ছিল বলে কুকুরটা তেড়ে গিয়েছিল। ও কামড়াত না যদি তুমি দৌড়ে না পালাবার চেষ্টা করতে। আমাদের উকিল বলছে শুধু এই কারণে ওরা কমপেনসেসন দেওয়ার ব্যাপারে কোর্টের সহানুভূতি পাবে। যে মেয়েটি ওই প্যাকেট কুড়িয়ে নিয়েছিল সে খুন হয়েছে। অন্য পাঙ্কদের কাছে মেয়েটি বলেছিল প্যাকেটটা বিক্রি করলে লক্ষ লক্ষ ক্রোনার পেয়ে যাবে সে। তোমার কাছে আমার প্রশ্ন, কী ছিল প্যাকেটে?

'আমি জানতাম বিস্কুট ছিল।'

'তুমি জানতে মানে?'

'আমাকে তাই বলেছিল।'

'কে বলেছিল?'

'দীপ।'

শ্রোতারা সবাই এমন অবাক হয়ে গেল যে কিছুক্ষণ কেউ কথা বলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত কাবেরী বললেন, 'সেকী! তার সঙ্গে তো তোর কোনও সম্পর্ক ছিল না!'

'ছিল না।'

'তা হলে?'

'শেষ যেদিন কলেজে যাই সেদিন ও আমার সামনে এসে বলল, 'তুই তো বিদেশে যাচ্ছিস, কোপেনহেগেনে পড়বি, আমি একটা গিফট একজনকে দেব, নিয়ে যাবি। এটা তোর কাছে আমার শেষ অনুরোধ। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, লোকটা কে? ও বলেছিল, লোকটার নাম নিক। ই-মেল অ্যাড্রেস দিয়েছিল। বলেছিল, ওকে জানিয়ে দিলেই এসে নিয়ে যাবে। সম্পর্ক ছিন্ন করেছি বলে ও খুব মনমরা ছিল, তাই আর কষ্ট দিইনি।'

'একথা আমাদের জানাওনি কেন?' কাপুর জিজ্ঞাসা করলেন।

'জানালে তোমরা রেগে যাবে, তাই।'

'প্যাকেটে কী ছিল খুলে দ্যাখোনি?'

'ও বলেছিল বিস্কুট। তাই খুলিনি।'

কাবেরী মাথা নাড়লেন, 'আমি বিশ্বাস করি না।'

লেডি চ্যাটার্জি হাসলেন, 'এটা অবিশ্বাস করলে আমাদেরই ক্ষতি।'

'কেন?'

'যে কোনও বিমানযাত্রীকে প্রশ্ন করা হয় তিনি নিজে তাঁর লাগেজ প্যাক করেছেন কিনা? অন্য কেউ কিছু দিলে সেটা না চেক করে আনা বেআইনি। তাকে অন্য কেউ কিছু দিয়েছে আর সে তা না দেখে এনেছে এটা পুলিশ জানলেই ওকে অ্যারেস্ট করবে। আর ও যদি জেনে শুনে নিয়ে আসে আর আমরা যখন সঙ্গে ছিলাম তখন আমাদের কাউকে ছাড়বে না। যতক্ষণ পুলিশ প্রমাণ করতে পারছে না প্যাকেটে কী ছিল ততক্ষণ আমরা নিরাপদ। তৃণা কিছু না জেনে এনেছে, বিশ্বাস করাই আমাদের উচিত।' লেডি বললেন, 'অবশ্য তোমরা যাচাই করতে হলে দীপকে ফোন করতে পারো।'

কাপুর বললেন, 'সেটা আর সম্ভব নয়।'

'কেন?' লেডিকে খুব বৃদ্ধা দেখাচ্ছিল আজ।

পকেট থেকে পার্স বের করে তার ভেতর থেকে কাগজের টুকরো টেনে এনে কাপুর লেডির হাত দিলেন। লেডি পড়লেন।

কাপুর বললেন, 'খবরের কাগজের কাটিং। ইন্টারনেট থেকে পেয়েছি।'

লেডি তৃণার দিকে তাকালেন, 'তোমাকে শেষবার বলছি, সত্যি কথা বলো।'

'কী বলব?'

'প্যাকেটে কী ছিল?'

তৃণা তাকাল একবার, তার পর মুখ নিচু করল।

'এটা দ্যাখো।' কাগজটা বাড়িয়ে ধরতে তৃণা নিল। চোখ বোলাল। তারপর চিৎকার করে কেঁদে উঠল। দু' হাতে মুখ ঢেকে সে কেঁদে চলছিল। কাপুর কিংবা কাবেরী ওকে ধরছিলেন না। কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়ল তৃণা।

কাবেরী কথা বললেন, 'দীপ তোকে যে মেল পাঠিয়েছে তা থেকে বোঝা গেছে প্যাকেটে কী ছিল তুই জানিস। ও জিনিস লিখেছে। সেই জিনিসের জন্যে খুন হয়েছে ও।'

বড় বড় শ্বাস নিয়ে একটু সামলে তৃণা বলল, 'আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দাও।'

'তোমাকে নিয়ে কী করব সেটা আমি ঠিক করব।'

'বেশ। হ্যাঁ, ওই প্যাকেটে গাঁজা ছিল। পাঁচ কেজি।'

'সর্বনাশ। তুই গাঁজা নিয়ে এসেছিলি কেন?' কাবেরী চিৎকার করলেন।

'বিক্রি করলে অনেক টাকা পাওয়া যেত।'

'টাকা? তোর টাকার কী দরকার?'

'দিদু আমাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর ঠিক করেছিলাম আমি অনেক টাকার মালিক হয়ে এর জবাব দেব।' তৃণা মুখ তুলছিল না।

'কিন্তু এখানে আসার সময় যদি ধরা পড়ে যেতি? আমাদের সঙ্গে, তোর দিদুর ব্যাগে গাঁজা আছে, তা হলে কী হত বুঝতে পেরেছিলি?'

'না, দিদুকে ধরত না। ধরা তো পড়েনি।' তৃণা মাথা নাড়ল, 'আমার জন্যে দীপ খুন হল, তোমরা পুলিশকে ফোন করো, আমি সত্যি কথা বলব।'

'লেডি চ্যাটার্জির নাতনি গাঁজা স্মাগল করতে গিয়ে কেপেনহেগেনে ধরা পড়েছে। এই খবরটার পর আমার পক্ষে কি বেঁচে থাকা সম্ভব।' লেডি চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী মনে করো তুমি।'

কেউ কোনও কথা বলল না। লেডি বললেন, 'কাপুর, ওই ফাইলটা নিয়ে এসো।'

কাপুর ফাইলটা নিয়ে এলেন টেবিল থেকে। সেটা খুলে সই করলেন লেডি। তারপর বললেন, 'তুমি আর কাবেরী উইটনেস হিসেবে সই করো।'

কাবেরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ওটা?'

'আমার উইল।'

কাবেরী আর দ্বিধা না দেখিয়ে সই করলেন। কাপুরও।

কাপুর বললেন, 'আরও দু'জন সাক্ষী হলে ভাল হত।'

'ম্যানেজারকে ডাকো। সঙ্গে আর কেউ। হ্যাঁ। তোমরা যে যার ঘরে চলে যাও।'

গোটা দুপুর বিছানায় মুখ গুঁজে কেটে গেল তৃণার। মাঝে মাঝেই কান্না আসছে বুক নিংড়ে। হঠাৎই সে আবিষ্কার করল, দীপকে খুব ভালবাসত। নিশ্চয়ই মরার আগে দীপ খুব কষ্ট পেয়েছে। যারা গাঁজা সাপ্লাই দিয়েছিল তারা কি ওকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল? টাকা রোজগারের জন্য এই পথে আসতে বারংবার বাধা দিত দীপ। খুব ভয় পেত। তৃণার মনে হচ্ছিল, এভাবে বেঁচে থেকে কি লাভ। দীপ নেই, এই চেহারা নিয়ে বেঁচে থেকে সে কী পাবে?

কাবেরীও বসেছিল ঘরের দরজা বন্ধ করে। হঠাৎ ঘড়িতে দেখলেন কাঁটা সন্ধে ছ'টার কাছাকাছি। চন্দ্রনাথ চলে যাওয়ার পর তিনি আবার সন্ধের পর স্ফটিক গোলকের সামনে বসছেন কিন্তু কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারছেন না।

দীর্ঘকাল চলার পর এই বিরতিতে যেন সুর কেটে গেছে। আজও বসলেন। রাত দশটায় ন্যান্সির সঙ্গে সংযোগ হল তাঁর। ন্যান্সি বললেন, 'কী হয়েছে তোমার?'

কাবেরী বললেন, 'মেয়েকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছি।'

'সেই সমস্যা তো আগেও ছিল। দীর্ঘকাল তুমি আসনে বসোনি। তোমার মন কি অন্যভাবে শান্তি খোঁজার চেষ্টা করেছে?'

'চেষ্টা করিনি। তবে একজনকে দেখলেই মনে শান্তি আসে।'

'বাঃ। তুমি ভাগ্যবতী। তা হলে এই পথে তুমি এসো না। এই পথ তোমার জন্যে নয়।'

মুহূর্তেই সব মিলিয়ে গেল। হতবাক কাবেরী। ঘোর কাটতে কয়েক মিনিট লাগল। আসন ছেড়ে উঠে পোশাক বদলাবার পর অস্থিরতা বেড়ে গেল। তারপর কী মনে হতে ফোন করলেন।

'হ্যালো।' চন্দ্রনাথের গলা।

'আমি কাবেরী।'

'ও। কেমন আছ? তৃণা কেমন আছে?' চন্দ্রনাথের গলায় উত্তাপ।

সেই উত্তাপে খুব শান্তি পেলেন কাবেরী, 'আই অ্যাম মিসিং ইউ।'

'আমিও।' চন্দ্রনাথ গাঢ় গলায় বললেন।

ভোরবেলায় কাপুর ফোন করে বললেন, 'তাড়াতাড়ি লেডির ঘরে চলে এসো।' প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন কাপুর। কাবেরী তাড়াতাড়ি যেটুকু পারেন তৈরি হয়ে মায়ের ঘরে গিয়ে দেখলেন মা বিছানায় বসে আছে, কাপুর বললেন, 'ওঁর শরীর খুব খারাপ। অ্যাম্বুলেন্স আসছে।'

হাসার চেষ্টা করলেন লেডি চ্যাটার্জি, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তৃণা?'

'ফোন করেছি। আসছে।' কাপুর বললেন।

বলা শেষ হতেই তৃণা এল।

ইশারায় কাছে ডাকলেন লেডি চ্যাটার্জি, 'আই লাইক ইউ তৃণা। তুমি এখানে থাকবে। যে কলেজে ভর্তি হওয়ার ছিল হবে। কিন্তু সারাজীবন তোমাকে মুখের দাগগুলো বয়ে বেড়াতে হবে। যদি কখনও সার্জারির সাহায্যে মুখ ঠিক করে নাও তা হলে তুমি চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জির মালিকানা থেকে বঞ্চিত হবে।'

হাঁ হয়ে গেল তৃণা।

'অবশ্য পুলিশ যদি প্যাকেটটায় কী ছিল প্রমাণসহ আবিষ্কার করে তা হলে আমার কোনও বক্তব্য নেই। তুমি বুদ্ধিমতী, ধূর্ত। বড় বিজনেসম্যান হওয়ার সব যোগ্যতা তোমার আছে। তুমি এখানে এম বি এ করে যদি নিজেকে শুধরাতে পারো তা হলে আমি খুশি হব। কাবেরী কাপুরের কাছে আমার উইল আছে। চন্দ্রনাথকে আমার খুব ভাল লেগেছে। সম্পর্কটা বন্ধুর চেয়ে বেশি করা যায় কিনা ভেবে দ্যাখো।'

কথাগুলো বলে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন লেডি চ্যাটার্জি। এই সময় অ্যাম্বুল্যান্সের ডাক্তার এবং লোকজন নক করে ঘরে এল। স্ট্রেচারে তুলে অক্সিজেনের মাস্ক পরিয়ে দিল ওঁরা লেডির মুখে। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল হাসপাতালে।

ঘণ্টাখানেক পরে ওঁরা জানলেন, ইতিমধ্যে লেডির দু'বার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। তৃতীয়টা হতে পারে বলে ওঁরা প্রস্তুত হয়ে আছেন।

একজন নার্স এসে ঘোষণা করল, 'মিস্টার কাপুর?'

কাপুর উঠলেন। তাঁকে ইশারায় ডেকে ভেতরে নিয়ে গেল নার্স।

লেডি চ্যাটার্জির চোখ বন্ধ। নাকে অক্সিজেনের মাস্ক। হাতে স্যালাইনের নল। ধবধবে সাদা বিছানায় তিনি অসাড় হয়ে শুয়ে আছেন। নার্স বলল, 'স্যার, ঘুমাবার আগে উনি আমাকে বলেছিলেন আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করতে।'

'কী?'

'উনি চান, আপনি ওঁর কপালে একটা চুম্বন করুন।'

এই বৃদ্ধ বয়সেও শিহরিত হলেন কাপুর। তারপর ধীরে ধীরে মুখ নামিয়ে লেডি কণিকা চ্যাটার্জির প্রসাধনহীন কপালের শুকনো চামড়ায় ঠোঁট রাখলেন। সন্তর্পণে।